কন্যারত্ন



শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৬১

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল, এম এ, এলএল বি
১-১এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীবরদা গুপ্ত

বাঁধাই : ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এজেন্সী
৭২ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা ৯

চার টাকা

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণকমলে—

—নরেশ— [illegible]

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের চিরাচরিত অনেক অন্ধ-সংস্কার ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। হিন্দুসমাজের রীতি-নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও স্বার্থসংরক্ষণমূলক সামাজিক প্রথার সত্যিকারের মূলতঃ কোন পরিবর্তন আজও হয় নাই। আমাদের সমাজের বিবাহের রীতি ও পণ-প্রথার কথাই বলি। এই পণ-প্রথায় আজ প্রপীড়িত বহু বাঙ্গালী পরিবার, আর বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এমনই নিষ্পেষিত এক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের করুণ কাহিনী দরদী লেখক শ্রীনরেশচন্দ্রের এই **"কন্যারত্ন"** উপন্যাস। কন্যাদায় সমস্যা আমাদের সমাজে নূতন নয়, তবু এই সমস্যাই হইয়াছে তাঁহার উপন্যাসের ভিত্তি এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া কন্যাকে 'দায়' না হইয়া 'রত্ন' হইবার শুভ ইঙ্গিত করিয়াছেন তিনি এই গ্রন্থে।

বন্ধুবর শ্রীনরেশচন্দ্র লেখক হিসাবে অপরিচিত নন। তাঁহার বহু কবিতা ও নাটকের সহিত আমরা পূর্ব হইতেই পরিচিত। বেতার-নাট্য পরিচালক সুসাহিত্যিক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় তাঁহার বহু কাব্য-রচনা আবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাঁহারই পরিচালনায় কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে নরেশচন্দ্রের বিবিধ নাট্য-রচনা অভিনীত হইয়াছে। রেকর্ড-জগতেও শ্রীনরেশচন্দ্র সুপরিচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার এই প্রথমতম উপন্যাস পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর শ্রীপরেশচন্দ্র মৈত্র, শ্রদ্ধেয় শ্রীতেজেশ বড়াল ও শ্রীনিতাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে।

রথযাত্রা
১৩৬১

প্রকাশক

১

বি-এ পাশ করিবার পরেও কুন্তলের বিবাহ উদ্যোগ দশবার হইল, দশবারই ভাঙ্গিয়া গেল। নগদ দু-হাজারী হইতে আরম্ভ করিয়া দশ-হাজারী মন্‌সবদারগণ কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া আসিলেন, মিষ্টিমুখ করিলেন, মেয়ের পায়ের আঙ্গুল হইতে চুলের ডগা পর্যন্ত দেখিলেন, কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের ভরসা মহেন্দ্রবাবু কাহাকেও দিতে পারিলেন না। অতএব তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন।

মেয়েকে সাজাইয়া গোছাইয়া দর্শনীয় করিয়া বারবার বিভিন্ন বরপক্ষের সম্মুখে আনিতে মহেন্দ্রবাবুর কুণ্ঠা হয় নাই। অযথা পয়সাই খরচ হইতে লাগিল, কিন্তু মেয়েকে পাত্রস্থ করিবার শুভলগ্ন তাঁহার ভাগ্যে আসিল না। সারদাদেবী চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন, মেয়ের বিবাহ হইবে না। পাড়া-পড়শীর কাছে বলিতেও তাঁহার বাকী রহিল না, মেয়ের কপালে বিবাহ লেখা নাই,—কুন্তলের বিবাহ হইবে না। পাড়ার কেহ কেহ সারদাদেবীর কথায় সায় দিয়া বলে, তুমি হয়ত' ঠিকই বলেছ দিদি, ওই বি-এ পাশ করিয়েই মাটি ক'রেছ, কথায় বলে কুড়ি পেরুলেই বুড়ী—শাস্ত্রের কথা। আবার কেহ কেহ বলে, না না, তুমি ভেব'না দিদি, কুন্তল তোমার বি-এ পাশ মেয়ে, ওর আবার বিয়ের ভাবনা? কুন্তল পাড়ার সেরা মেয়ে, হীরের টুক্‌রো মেয়ে,—বিদ্যায়, শিক্ষায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় এমন মেয়ে দেখা যায় না। মেয়ে এমন দেখা না গেলেও এমন মেয়ের বরের যে দেখা মিলিল না, তাহা কঠিন সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মহেন্দ্রবাবু বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছেন। সওদাগরী অফিসের বড়বাবু না হইলেও ভাল চাকুরীই করিতেন মহেন্দ্রবাবু। তাই প্রথম কন্যা কুন্তলের স্কুল

ও কলেজের শিক্ষা দিতে কোনপ্রকার কার্পণ্যই করেন নাই। কিন্তু এমন অবস্থা তাঁহার ছিল না যাহাতে মেয়ের বিবাহে দশ হাজার টাকা খরচ করিতে পারেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার মহেন্দ্রবাবুর।

অদ্ভুত বাংলাদেশের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, হতভাগ্য বাংলাদেশের এই মধ্যবিত্তেরা। ইহারাই সকলকে জাগায়, ইহারাই সংগ্রাম করে, ইহারাই বাঁচায়, আবার ইহারাই মরে। বাংলার প্রাণ-সঞ্জীবন এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কিন্তু আঘাতে আঘাতে, অভাবে, অত্যাচারে, তাহার মেরুদণ্ড আজ বুঝি আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পঙ্গু মুমূর্ষু সে আজ। তাহার মাথার উপর খড়্গ ঝুলিতেছে। শুনিতে পাই যেন তাহার অন্তিম—অসহায় ক্রন্দন। যূপকাষ্ঠের বেলপাতা তাহার শেষ আশ্রয় হইয়াছে। কিন্তু আত্মাভিমানের অহংকারে মহাকালীর হাতের ওই খড়্গ ত' কাড়িয়া লওয়া যায় না। * * * কুন্তল তাহা বুঝিত, তাই নিজের চেষ্টাতেই সে নিজেকে অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারিণী করিয়াছিল। কলেজে বা পাড়াতে কোন কৃষ্টি-অনুষ্ঠানেই কুন্তলকে বাদ দেওয়া চলিত না। কুন্তলের জনপ্রিয়তা মহেন্দ্রবাবুর গর্বের কারণ ছিল। তবু কিছুদিন হইল মেয়ের বিবাহ লইয়া তিনি বিশেষ পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। মনোমত ঘর বর জুটিতেছিল না। ঘর জোটে ত' বর জোটে না, বর জোটে ত' ঘর জোটে না—তাহার উপর আছে আবার নগদ সেলামী। সব কিছু লইয়াই তাঁহার মন-মেজাজ ভাল ছিল না। দশ-দশটি বরপক্ষের আগমন হইয়াছে, কিন্তু কাহারও সহিত একটা রফা হয় নাই। এই কথাই মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব মহলে বলাবলি করিতেন মহেন্দ্রবাবু।

অফিস ফেরত মহেন্দ্রবাবু সেদিন সারদাদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার অফিসের এক বন্ধু কুন্তলের বিয়ের জন্য একটি পাত্রের খোঁজ দিয়েছেন। আগামী কাল সকালে কুন্তলকে দেখতে আসবেন। ছেলেটি খুবই ভাল, নিজেদের ব্যবসা আছে—অবস্থাও বেশ ভাল। তবে কি না আই-এ ফেল, এই যা!

সারদাদেবী কহিলেন, আ-ই-য়ে, ফে—ল্?

মহেন্দ্রবাবু উত্তরে বলিলেন, কি করা যাবে বল। নগদ চাহিদার দিকটাও.ত ভাব্‌তে হবে। যাক্, কুন্তলকে কথাটা ব'লে রাখ, কাল সকালে কোথাও যেন না বেরিয়ে যায়। কি যন্ত্রণাই না হ'য়েছে এই মেয়ের বিয়ে। এই বলিয়া তিনি জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সারদাদেবী স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। কুন্তলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া সব কথাই বলিলেন। কুন্তল কোন কিছুরই জবাব দিল না। শুধু মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিল। সারদাদেবী মনে একটু ভরসা পাইয়া বলিলেন, ছেলেটি ভাল, অবস্থা খুব ভাল, নিজেদের ব্যবসা আছে, নাই বা হ'ল এম-এ, বি-এ পাশ,—এই বলিয়া আবার তিনি কুন্তলের মুখের দিকে চাহিলেন। কারণ তিনি জানিতেন এই শো-কেসের মহলা কুন্তল মনে মনে পছন্দ করে না। সারদাদেবীর কথা শেষ হইবার পর কুন্তল কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল। সারদাদেবী ভাবিলেন, কুন্তল সব বুঝিয়াই এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ধারণা যে ভুল হইয়াছে কুন্তলের কথা শুনিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। কুন্তল তাহার মাতাকে বলিল, আমি ত' কচি খুকীটি নই মা। এখনও যদি এমন ক'রেই আমাকে বিয়ে দিতে হয় তোমাদের, আট বছরে গৌরীদান ক'রলেই ত' পারতে। তাতে তোমাদের পুণ্যও হ'ত, আমিও বাঁচতাম। বি-এ পাশের কি মূল্য আছে আমার? এমন ক'রে বারবার আর কত অপমান ক'রবে আমাকে তোমরা।

সারদাদেবী একটু অপ্রতিভ হইয়াই কহিলেন, আমাদের কি আর অসাধ মা, মেয়ে কাছে রাখতে? কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেওয়া মা-বাপের কর্তব্য। তা'ছাড়া আত্মীয়স্বজন আছে, পাড়ার দশজন আছে, শত্রু-মিত্রও আছে,—সত্যি-মিথ্যে কত কথা আমাদের কানে আসে, তাই উনি একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

কুন্তল মায়ের কথায় অস্বস্তি বোধ করিল। সে মাকে জিজ্ঞাসা

ক'রলি, সত্যি-মিথ্যে কথাগুলো কি ? তোমরা কি তোমাদের মেয়েকে বিশ্বাস কর না ?

সারদাদেবী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তোকে বিশ্বাস না ক'রলে আমাকেই যে আমি অবিশ্বাস ক'রব। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা নয়। সমাজের যা রীতি, মান্‌তে হবে বৈ কি মা। উনি মেয়েদের স্বাধীন মত পছন্দ করেন, তবু সমাজের দশজনের কথাও ত' অমান্য করা সহজ নয় মা।

কুন্তল এবারে প্রায় রাগিয়াই কহিল, দশজনের কথা অমান্য ক'রতে পারবে না, তাই বলে একটা আই-এ ফেল ছেলের সামনে মেয়েকে সাজিয়ে দাঁড় করাতে তোমাদের লজ্জা ক'রবে না ? শুধু পয়সা আছে —এই ত ? তুমি বাবাকে বল, আমি আর কারও সামনে যাব না —না, কিছুতেই না।

শান্তকণ্ঠে সারদাদেবী কহিলেন, উনি যে কথা দিয়ে এসেছেন, আমি কি এখন আর তাঁকে কিছু ব'লতে পারি ?

তুমি না ব'লতে পার আমিই ব'লব বাবাকে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই কুন্তল দেখিল তাহার বাবা ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া সারদাদেবী, মেয়ের কথা শুনেছ,—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সবই বলিলেন। মা ও মেয়ের কথা কাটাকাটি শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু এই ঘরে আসিয়াছেন। আসিয়া স্ত্রীর মুখে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি কুন্তলের উপরে বেশ একটু বিরক্ত হইলেন। আজ অফিসে ম্যানেজারের সহিত অহেতুক কথা কাটাকাটিতে তিক্ততায়-ভরা মন নিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। সেই তিক্ত মনের অবস্থায় কুন্তলের এই নির্লজ্জতা তাঁহার ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইল। আগামী কাল সকালের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সারদাদেবীও স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

কুন্তল তাহার বাবার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। কিন্তু এই আত্ম-অমর্যাদার অসহনীয় পঙ্কিলতায় নিজেকে কি করিয়া খাপ্‌ খাওয়াইয়া

লইবে তাহাও চিন্তা করিতে পারিল না। নির্জন ঘরে বসিয়া বসিয়া শুধু এই কথাই তাহার মনে হইতেছিল, কি হাস্যকর এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের জীবন ; কি করুণ এই বিত্তহীন পিতামাতার অবস্থা মেয়ে যখন বড় হইয়া ওঠে! মেয়েদের বিবাহ দিতে হইবে। বারবার কন্যা 'গ্রাহকের' সম্মুখে ধরিতে হইবে, যদি কেহ দয়া করিয়া পছন্দ করেন। পছন্দ করিলেও হইবে না, পছন্দ হইলে সেই পছন্দের আবার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে।. এমনই সামগ্রী এই বিবাহযোগ্যা মেয়ে। এম-এ, বি-এ, পাশ করিলেও অধিকাংশ স্থলেই এই সনাতন নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পঁচিশ বছরের এম-এ পাশ মেয়েকেও মাথায় সিঁদুর ও টিকলি পরাইয়া, নববধূ সাজাইয়া যে কোন পাত্রের হাতে তুলিয়া দিতে কাহারও ক্ষোভের কারণ ঘটে না।—ক্ষোভের কারণ ঘটে তখন, যখন মেয়ে ঐ অর্থহীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে। মাতা-পিতার সে আর এক অসহায় অবস্থা। মেয়ে বিবাহ করিতে চাহে না কেন,—এ প্রশ্নের আর সমাধান নাই। অস্ফুট অপবাদের অসত্য আচরণ সময় বিশেষে এমন কি গৃহস্থকে গৃহত্যাগের সংকল্পও জোগাইয়া দেয়, অথবা মেয়ে আত্মঘাতী হইলেও সমাজে মুখ দেখাইবার রাস্তা পরিষ্কার থাকে,— এমন কথা প্রকাশ করিতেও দেখা যায়।

কুন্তল আরও ভাবিতে লাগিল, মেয়েদের পড়াশুনা, তাহাদের স্বাধীন চিন্তার আজিও দেশে কতটুকু মূল্য? বিবাহ আসরে শাড়ী গহনার মত মেয়েদের 'গ্রাজুয়েশান' আর একটি অতিরিক্ত উপঢৌকন হইয়াছে মাত্র। বন্ধুমহলে বরের অহেতুক গর্ব প্রকাশ—স্ত্রী এম-এ অথবা বি-এ পাশ। বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত' আবার কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, 'আরে দূর দূর এম-এ, বি-এ পাশ মেয়ে বিয়ে কত্তে আছে? জোর ম্যাট্রিক, তার বেশী আর নয়—এমন কত কি! তবু আছে আমাদের সাতপাকের মোহ, তবু আছে সিঁদুরের আসক্তি। অথচ এই সাতপাকের মিথ্যা আয়োজন যাহাদের কাছে প্রয়োজনহীন হইয়াছে, সমাজে অহল্যা দ্রৌপদীর সুউচ্চ স্থান যে

তাঁহারা চিরকালের মত হারাইল, তাহাতে কি সন্দেহের অবকাশ মাত্র আছে? সীতাকে বনেও লইয়া যাইব আবার প্রয়োজন মত সপ্তগণ্ডী দিয়া কুটিরেও আটক করিয়া রাখিব, এ এক চমৎকার ব্যবস্থা! এই নিদারুণ মিথ্যাকে কেন যে সে এতদিন মানিয়া লইল, এই কথাই কুন্তল ভাবিয়া পাইল না। হৃত হইবার অপবাদ যদি অগ্নিপরীক্ষায় শেষ হয়, সেই অগ্নিপরীক্ষায় তবুও জীবনকে উপলব্ধি করা যায়। কি মূল্য আছে এই পণ্যদ্রব্যের পুণ্য অর্জনের মাদকতায়?—হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল কুন্তলের মাথায়! সে মনে মনে এই কথাই চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিতেছিল,—বিবাহের লটারী খেলায় দু'টাকার রেঞ্জার্স টিকিট না কিনে একেবারে ডারবী টিকিট কিনে দেখাই ত' ভাল। সহসা কুন্তলের দৃষ্টি পড়িল ঘরের দেয়ালে কারপেটে বাঁধান সতী-ধর্মের 'সারমন্'গুলির উপর। 'পতি পরমগুরু', 'পতি ছাড়া রমণীর গতি নাহি আর, পূজিতে এসেছি ভবে চরণ তাঁহার', 'সাবিত্রী সমান হও' ইত্যাদি। কুন্তল হাসিল বড় দুঃখে।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে কুন্তল কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সারদাদেবী ঘরে ঢুকিয়া কুন্তলকে ডাকিয়া জাগাইলেন। কুন্তল বিছানায় উঠিয়া বসিল। সারদাদেবী তাহাকে বলিলেন, চল্, খাবি চল্। কাল খুব সকালেই ওঁরা দেখতে আস্‌বেন। ও বাড়ীর নেপাল ঠাকুরপো আর ছোট বৌকে ব'লে এলাম। ওঠ্। সারাদিন খেটেখুটে আসেন, ওঁর কথা সবই ত' বুঝতে পারিস মা। বাংলাদেশের মেয়ের মা-বাপের যা অবস্থা, যদি কোন দিন 'মা' হ'স্ বুঝতে পারবি। এই বলিয়া সারদাদেবী আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

কুন্তল প্রসন্নচিত্তেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। খুবই স্বাভাবিক মনে হইতেছিল তাহাকে দেখিয়া। কিছুক্ষণ পূর্বের বিরক্তি ও অস্বস্তির কোন ছাপই নাই মুখে। সারদাদেবী একটু যেন ভরসা পাইলেন। তাই আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, চল্—মিণ্টু, উৎপলা তোর জন্য ব'সে আছে। তাহার হাতখানি ধরিয়া একটু পরে বলিলেন, তবুও এখন অনেক হ'য়েছে, মেয়েকে বয়স্থা ক'রে আমরা ঘরে রাখতে পাচ্ছি,

আর আমাদের সময় ত' দেখেছি, বার থেকে তেরতে পা দিয়েছি কি কত কথা।—চোখে কি কিছু দেখতে পাস না লা, সোমত্ত মেয়ে ঘরে, তোরা রাত্রে ঘুমোস্ কি ক'রে, এমন কত কি কথা মাকে শুনতে হ'য়েছে,—এই বলিয়া তিনি মেয়ের মুখের দিকে পুনরায় তাকাইলেন। কুন্তল খুব শান্তকণ্ঠে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মা, এই যে কারপেটে বাঁধান কথাগুলো, এসব মনে মনে তোমরা কি সত্যই মান?

উত্তরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সারদাদেবী কহিলেন, মানি না! এইগুলিই ত' আমাদের বেঁচে থাকার মন্ত্র।

মৃদু হাসিয়া কুন্তল কহিল, বেঁচে থাকার যে মন্ত্র এর মধ্যে আছে তা তোমরা জান না। তোমাদের মেরে ফেলে এই কথার কাপড়ে তোমাদের ঢেকে রাখা হ'য়েছে। বিয়ের আগে কারপেটে এই সব কথা বুনতে তাই তোমাদের বাধেনি। যাক্, চল খেয়ে আসি।

সারদাদেবী প্রফুল্লচিত্তে মেয়েকে লইয়া খাইতে আসিলেন। ছোট বোন উৎপলা ঘুমে ঢুলিতেছিল। ছোট ভাই মিণ্টু তখনও খায় নাই, দিদির হাতে না খাইলে তাহার খাওয়া হয় না। কুন্তল তাহাকে সঙ্গে লইয়াই নির্বিকারচিত্তে খাইতে বসিল। দিদির সঙ্গে খাইতে বসিয়া মিণ্টু মাষ্টার খুব খুশী। দুই ভাইবোনে খাইয়া উপরের ঘরে আসিল। মিণ্টুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কুন্তল তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

মিণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবা তোকে বকেছে দিদি?

কুন্তল উত্তর করিল, না, তুই ঘুমো মিণ্টু।

কেন বাবা তোকে বক্‌বে,—এই বলিয়া সে হঠাৎ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং দিদির মুখের দিকে চাহিতেই কাঁদিয়া ফেলিল। কুন্তল দুই হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল, নিজেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মিণ্টু ও উৎপলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে কুন্তল বাহিরে আসিল। রেলিংএ দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, সারদাদেবী মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কি সব কথা কহিতেছেন।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লে দিও। বাংলাদেশ এখনও ত' বিলেত হ'য়ে যায়নি। তাই রাগ ক'রেছিলাম।

সারদাদেবী উত্তর করিলেন, তা মেয়ে এখন বড় হ'য়েছে, আর স্বাধীন ভাবে চলাফেরা ক'রতে তুমিই ওকে দিয়েছ, নিজের ভাল-মন্দ ওরা বুঝতে শিখেছে, অত সব বলা তোমারও ভাল হয়নি।

মহেন্দ্রবাবু কথাটি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সারদাদেবীর কথায় তাঁহার দীপ্ত পৌরুষ ক্ষুব্ধ হইল। হাতের সিগারেটে একটি জোরে টান দিয়া তিনি রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কি বল্লে, ভাল হয়নি? কিন্তু দেশের শাস্ত্রগুলি ত' সব উল্‌টে যায়নি। বি-এ, এম-এ পাশ ক'রে স্বাধীন হ'লে সেগুলি কি মানতে হবে না? যে দেশের যে রীতি। আমাকে দশজন নিয়ে বাস করতে হয়, সব দিকেই মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে ত—না কি? স্বাধীন,—স্বাধীন,—ক'টা মেয়ে স্বাধীন হ'য়েছে ব'লতে পার? কয়েকটা কলেজে পড়া মেয়ে দেখেই সারা বাংলাদেশকে বিচার ক'রো না। আর কলেজে পড়লেই বা কি, পাশ করলেই বা কি?

সারদাদেবী কহিলেন, কিন্তু নিজের মেয়েকে অখুশী রেখে, দশ জনকে খুশী করার মধ্যেও কি কোন যুক্তি আছে?

মহেন্দ্রবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, তুমি থাম, তুমি এসব বুঝবে না। মেয়েছেলের বুদ্ধি নিয়ে আমাকে কাজ ক'রতে হবে না কি? স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

তুমি অত রাগ ক'রছ কেন, কি হ'য়েছে তোমার,—কহিলেন সারদাদেবী।

স্ত্রীর কথায় মহেন্দ্রবাবু প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, রাগ্‌ছি কি আর সাধে? মা ও মেয়ে মিলে আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না। মেয়ে অবাধ্য হবে, মুখের উপরে কথা ব'লবে?

মা কি ক'রলে, আর মেয়েই বা কি ক'রল? থাম, অত চীৎকার ক'রতে হবে না তোমাকে।

—কেন, তোমাদের ভয় ক'রতে হবে না কি?

—ছি! ছি!

—ছি! ছি! লজ্জা আমারই হওয়া উচিত নয়? আমি কোথায় রাত্রে ঘুমোতে পারিনে ওর বিয়ের চিন্তায়, আর ও মুখের উপরে ব'লে দিল,—আমি কারো সামনে যেতে পারব না। কেন, নিবারণের সেজো মেয়ে রমলা, সেও ত' বি-এ পাশ। বিয়ে না দিয়ে পারল মেয়ের? বি-এ পাশ মেয়ে ব'লে কি সাতপাক ঘুরতে হয়নি তাকে? সমাজকে ত' উপেক্ষা করা চলে না। শহরের বা বাংলার বাইরের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কথা ছেড়ে দাও।

সারদাদেবী কহিলেন, কিন্তু বড়লোকের ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিতে নিবারণবাবুর যে অবস্থা হ'য়েছে, তাও ত' জান। জামাইকে চার হাজার টাকা নগদ, মেয়েকে ত্রিশ ভরি সোনা দিয়েছেন নিবারণবাবু। বাড়ী বন্ধক রেখে সাত হাজার টাকা কর্জ করতে হ'য়েছে তাঁকে, তবে ত' মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছেন।

মহেন্দ্রবাবু উত্তরে বলিলেন, নিবারণের ত' আর পৈতৃক জমিদারী নেই, কর্জ ছাড়া উপায় কি। কিন্তু গলার কাঁটাত' নেমেছে।

গলার কাঁটা—কথাটি শুনিয়া কুন্তল শিহরিয়া উঠিল। সে রেলিংএ দাঁড়াইয়া বাবার কথা স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছিল। সে জানিত রমলার বিবাহ দিতে নিবারণবাবুকে সাত হাজার টাকা কর্জ করিতে হইয়াছে। সে আরও শুনিয়াছে বড় লোকের বাড়ীতে রমলার বিবাহ হইলেও রমলার বাবাকে তাঁহারা আত্মীয়তার পদ-মর্যাদায় ভূষিত করেন নাই। ভালই হইল—টাকা গেল, মেয়ে গেল, আত্মীয়তাও হইল না! অথচ মেয়েকে বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহ দিয়াছি—এ গর্ব প্রকাশের সীমা নাই। যেমন দুর্বল এই মেয়ের পিতারা, তেমনই নির্লজ্জ এই ছেলেরা আর তাহাদের কর্তৃপক্ষ। অবশ্য সমাজের দশজনের ইহা দেখার কথা নয়। সাত হাজার টাকা কর্জ করিয়া সর্বসান্ত হইয়া সাত বছর একটি গৃহস্থ পেট পুরিয়া দু'বেলা খাইতে পাইল কি না—তাহা কাহারও দেখিবার বিষয় নয়। দেখিবার বিষয়

হইতেছে, বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতদের ভুরি ভোজের কোথাও এতটুকু ত্রুটি হইল কিনা। একথা কে কাহাকে বলিবে, আর কে কাহার কথা শুনিবে। রাহাজানি করিয়া ব্যাঙ্কের টাকা লইয়া উধাও হইলে যদি পাপ হয়,—এমন করিয়া একটি সংসারকে পথে বসাইলে ডাকাতি ও রাহাজানির কোন্ পুণ্য অর্জিত হয় ?

অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া কুন্তল শুধু এই কথাটিই বারবার চিন্তা করিতে লাগিল। দূরের আকাশে একটি তারা ছুটিয়া—কোন অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

২

অনেকক্ষণ ভোর হইয়া গিয়াছে। পাড়ায় টহলদারী গান শুনাইয়া বৈরাগীরা কখন চলিয়া গিয়াছে। কুন্তল এখনও উঠিতেছে না কেন ভাবিয়া সারদাদেবী তাহার ঘরে আসিলেন। আসিয়া কুন্তলকে দেখিতে পাইলেন না, পাইলেন একখানা চিঠি। চিঠিতে বিশেষ কিছুই লেখা নাই। যাহা আছে তাহাতে কুন্তলের যুক্তি থাকিলেও লোকে যে তাহাকে গৃহত্যাগিনী আখ্যা দিতে কুণ্ঠা করিবে না একথা সারদাদেবী বুঝিলেন।

মাথায় হঠাৎ বজ্র পড়িলে লোকে যেমন শক্ত হইয়া যায়, সারদাদেবী কুন্তলের চিঠি পড়িয়া তেমনই অনড় হইয়া গেলেন। সারাটা সংসার মুহূর্তে যেন তাঁহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। কুন্তল চলিয়া গিয়াছে বাড়ী ছাড়িয়া, পিতা-মাতা ছাড়িয়া, সহায় সম্পদহীন হইয়া। নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু মেয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে কাঁদিবার উপায় ত' নাই। কত জনে কত কথা বলিবে, কত জনে কত কথা ভাবিবে, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেই মেয়ের বাড়ী ছাড়ার কারণ অনুসন্ধিৎসুদের বাহির করিতে এতটুকু

সময় লাগিবে না। অস্ফুটস্বরে তাঁহার মুখ দিয়া বড় দুঃখে বাহির হইয়া আসিল—পোড়ারমুখী, তুই এ কি করলি?

কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি স্বামীর ঘরে উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু সবে মাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিতেই স্ত্রীকে ঐ ভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া—অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হ'য়েছে, কাঁদছ কেন?

সারদাদেবী স্বামীর কোলের উপরে চিঠিখানি রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, এই নাও, আপদ চুকেছে।

মহেন্দ্রবাবু সারদাদেবীর মুখের দিকে তাকাইতেই বুঝিয়াছিলেন একটা অঘটন কিছু ঘটিয়াছে কিন্তু তাহা যে কুন্তলের গৃহত্যাগ একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আমি পুলিশে খবর দেবো,—মহেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সারদাদেবী তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন বটে কিন্তু নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না এই নিদারুণ বিপদে কি তাঁহাদের করণীয়। এদিকে বেলা আটটায় কুন্তলকে দেখিতে আসিবে। মহেন্দ্রবাবু হতাশায় চোখে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি পুনরায় বিছানায় দুই হাতে চোখ মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। প্রভাত সূর্যের আলো তখন ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠিক গতকাল এমন সময়ে কুন্তল 'চা' লইয়া আসিয়া পিতাকে ডাকিয়া জাগাইয়াছিল। গোয়ালা দুধ দিয়া গিয়াছে। উনানের কুণ্ডলী-পাকান ধোঁয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বিরক্ত করিতেও ছাড়ে নাই। কুন্তলের 'চা' এর আসরের ছোট বড চা-পিপাসুরা আসিয়া জুটিতে সুরু করিয়াছে—কোথাও এতটুকু কিছুরও ব্যতিক্রম হইতেছে না। কিন্তু এ কি হইল? মহেন্দ্রবাবু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কুন্তল আমার এমন সর্বনাশ ক'রল। এইজন্যেই কি তাকে আমি এত ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছি? এমনি ক'রেই কি সে তার শোধ নিল? না হয় বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে শক্ত কথাগুলো, কিন্তু সত্যিই আমি কি পাষাণ, সত্যিই কি আমার দয়ামায়া নেই? আমি ত' তার বাবা।

সারদাদেবী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বুকের মধ্যে কে যেন মোচ্ড়াইয়া সব কিছু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন,—সেবার 'টায়ফায়েডে' রাক্ষুসী কেন মরিয়া গেল না। মহেন্দ্রবাবুকে কতদিন মেয়ের অসুখে অফিস কামাই করিতে হইয়াছিল। এতদিন কত কি করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে হইয়াছে, সে কি তাহা এতটুকুও মনে করিল না? নিজের স্বাতন্ত্র্য কি এতই বড় হইয়া উঠিল যে বাড়ী-ঘর, মাতা-পিতা, ছোট ভাইবোন, সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। ছোট ভাই মিণ্টু দিদি না খাওয়াইয়া দিলে কাহারও হাতে খায় না, ছোট বোন উৎপলা দিদি বলিতে অজ্ঞান—সবই কি তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল? কুন্তলকে লইয়া সব দিক দিয়াই মাতা-পিতা গর্ব অনুভব করিতেন। কিন্তু কোথা হইতে কি ঘটিল যাহাতে মুহূর্তে সব কিছুই কলঙ্কিত হইয়া গেল! বাহিরে নিজের মুখ দেখাইবার পর্যন্ত উপায় রহিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ এমন রূপ পরিগ্রহ করিল কি করিয়া? মহেন্দ্রবাবু উঠিয়া বসিলেন। হঠাৎ সারদাদেবীর পাশে হতভম্ব উৎপলা আর মিণ্টুকে দেখিতে পাইয়া উচ্চরোলে কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন,—ওরে মিণ্টু, আমি তোর দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি—আমিই তাড়িয়ে দিয়েছি।

সারদাদেবী, মিণ্টু ও উৎপলাকে লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে দ্রুত ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

এমন সময়ে বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মহেন্দ্রবাবু অতি কষ্টে নীচে নামিয়া আসিলেন। দরজা খুলিলে—নমস্কার করিয়া একটি লোক মহেন্দ্রবাবুর হাতে একখানা চিঠি দিয়া কহিল, আমি শ্যামনগর থেকে এসেছি। যামিনীবাবু এই পত্র দিয়েছেন।

এই যামিনীবাবুরই আজ মেয়ে দেখিবার কথা ছিল। মহেন্দ্রবাবু পত্রখানি পড়িলেন। পত্রে লেখা আছে,—ছেলে বি-এ পাশ মেয়ে

বিয়ে ক'রতে নারাজ, সে কারণে মেয়ে দেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ত্রুটি মার্জনা ক'রবেন। নিবেদন ইতি—।

পত্র পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা। নমস্কার জানাইল লোকটি, মহেন্দ্রবাবুও দুই হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার জানাইলেন। মুহূর্তে সব কিছু যেন ভণ্ডুল হইয়া গেল।

সাময়িক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্রবাবু উপরে উঠিয়া আসিলেন।—'দেখিতে যাইব' এবং 'যাইব না'—শুধু দুইটি কথা!

কিন্তু এই 'না' বলিবার সময়টুকুর মধ্যে তাঁহার যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল—সে ক্ষতির দায়িত্ব কাহার? আমরা বলিব দায়িত্ব আর যাহারই হউক না কেন বর পক্ষের ত' নয়। বরপক্ষের ইচ্ছাই এখানে 'সুপ্রিম কোর্ট'! সব কিছুই তাঁহাদের দয়ার উপরে নির্ভর করে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মেয়ে দেখিতে চাহিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে দেখিতে চাহিয়াও না দেখিতে পারেন। দেখিতে চাহিয়াছিলাম—দেখিলাম না, ইহাতে ভদ্রতার নীতি রক্ষিত হউক আর নাই হউক, মেয়ের বাবার বলিবার কিছু নাই। অথচ শ্যামনগরের যামিনীবাবু যদি 'দেখিতে যাইব' এই কথাটি না বলিতেন, হয়তো তাহা হইলে মহেন্দ্রবাবুকে আজ এই বিপদে পড়িতে হইত না। ইহার বিচার করিবে কে?

* * * *

কিন্তু বিচার হইল অন্যরূপ। পাশের বাড়ীর নেপালবাবুর স্ত্রী আসিয়া ব্যাপারটি জানিলেন। স্বামীকে তিনি বাসায় যাইয়া সব কিছুই কহিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাছে এসব কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিলেন। নেপালের মুখে সামনের বাসার সতীশবাবু ব্যাপারটা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীর কাছে কথাটা চাপা দিতেই বলিয়া দিলেন। সতীশবাবুর স্ত্রী পাড়ার-গেজেট ক্ষান্তপিসির নিকট চুপি চুপি বলিলেন কথাটি, তবে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াও দিলেন, কাহারও কাছে যেন গেজেট-পিসি কিছু না বলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য—চাপা সকলেই দিতেছে অথচ জানিতে কাহারও বাকী রহিল না।

"কেন, মহেন্দ্রবাবু না মেয়েকে বি-এ পাশ করিয়েছেন? ধিঙ্গি মেয়ে ঘরে রাখলে এমনই হয়! তখনই ত' ব'লেছিলাম, মহেন্দ্র, মেয়েকে অত স্বাধীন ক'র না।"—এমন কত কথা কত জনে আড়ালে বলাবলি করিতেছে আবার সম্মুখে আসিয়া নিষ্ঠুর সহানুভূতি দেখাইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িতেছে না, অথচ 'চাপা' দিবার ব্রত ঠিকই পালিত হইতেছে। অতএব· মহেন্দ্রবাবু বেচারাকে লইয়া কে কি বলিতেছে বা মন্তব্য করিতেছে—সে প্রশ্ন এইখানেই চাপা পড়িয়া থাক্।

কুন্তল চিঠিতে তাহার খোঁজ না করিতে লিখিয়া গিয়াছে। তবু মহেন্দ্রবাবু সারাদিন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি করিয়াছেন। মেয়ের সন্ধান তিনি পান নাই। গৃহে না ফিরিবার মন লইয়া যে পথে পা বাড়াইয়াছে, তাহার খোঁজ সহজে মিলিবে না—একথা মহেন্দ্রবাবু বুঝিলেন। কিন্তু সারদাদেবীর মন বলে,—কুন্তল একদিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

মিণ্টু তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মা, দিদি কোথায়? বাবা দিদিকে বকেছে তাই দিদি চলে গেছে, না?

সারদাদেবী কোন কথা বলেন না। তবু ছাড়ে না মিণ্টু, মাকে আবার জিজ্ঞাসা করে, কেন দিদি চলে গেল মা—কে আমাকে ভাত খাইয়ে দেবে?

মিণ্টুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সারদাদেবী বলেন, কুন্তল দিল্লীতে গিয়াছে তাহার মাসির বাড়ীতে। সারদাদেবীর ছোট বোন অবশ্য দিল্লীতে থাকিতেন। সারদাদেবী মিণ্টুকে আরও বলিলেন, তাহার দিদি তাহার জন্য কত সুন্দর সুন্দর খেলনা লইয়া ফিরিয়া আসিবে। মিণ্টু হয়তো বিশ্বাস করিয়াছিল মায়ের কথা, তবু শিশুর কাতর মন থাকিয়া থাকিয়া দিদির জন্য কেন যেন কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

সারদাদেবীর কথা ঠিকই হইত যদি মাঝপথে কুন্তলের মন বদলাইয়া না যাইত। সে দিল্লী যাইবে বলিয়াই মনস্থ করিয়াছিল।

তাই বাড়ী হইতে রওনা দিয়া প্রথমতঃ লোকাল ট্রেনে বর্ধমান এবং বর্ধমান হইতে দিল্লী মেলে একটি ফিমেল-কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া বসিল। আপাততঃ সে মোগলসরাই হইয়া কাশী যাইবে। কাশীতে তাহার এক বন্ধু থাকে—তাহার ওখানেই প্রথমে উঠিবে। কাশীতে কয়েকদিন থাকিয়া পরে দিল্লী যাইবে। দিল্লীতে ওর মাসিমা থাকেন।

ট্রেনে উঠিয়া দিল্লী যাইবার মন আর থাকিল না। কিন্তু কোথায়ই বা যাইবে? যাই হোক আপাততঃ মোগলসরাই পর্যন্ত যখন টিকিট হইয়াছে—কাশীতে আগে যাই তাহার পর যাহা ভাগ্যে আছে হইবে,—চুপ করিয়া এই কথাই কুন্তল ভাবিতে লাগিল।

ট্রেন চলিয়াছে। ট্রেনের কামরায় বহু স্ত্রীলোক—সাত হইতে সত্তর বৎসর পর্যন্ত; বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়সী, যুবতী,—বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী। কুন্তল তাহার মাঝারি গোছের সুটকেস্‌টি বাঙ্কে রাখিয়া জানালার ধারে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। সূচিভেদ্য অন্ধকার সম্মুখে, তাহার মধ্য দিয়া ট্রেন চলিয়াছে কোন্ নিরুদ্দেশের যাত্রায়, কোন্ অজানায়! আকাশের তারা হাতছানি দিয়া ডাকে—বুঝি বলে, ভয় কি অজানায়—"আমরা ত' আছি অজানা পথের দীপবর্তিকা"। মাঝে মাঝে ছোট বড় ষ্টেশন্ পিছনে পড়িয়া থাকিতেছে—দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিপি,—আর কয়লা তোলা ক্রেন, কালো প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বহুদূরে আগুনের ভল্‌কা উঠিতেছে কারখানার চিম্‌নি দিয়া, মনে হয় যেন মাথায় 'আগুন' লইয়া ব্রহ্মদৈত্য নাচিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে মালগাড়ী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে—দূরে ধ্রুবতারা বুঝি ভয়ে চোখ মুদিয়া ফেলে। দেখা গেল সামনে অনেক আলো—ট্রেন আসানসোলে আসিয়া থামিল।

মিনিট দশেক পরে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজিল। আমেরিকান ইঞ্জিন চালেও যেমন, চলেও তেমন, কণ্ঠস্বরও তদ্রূপ বাজখাঁই। দুই একবার হ্রেষাধ্বনি করিয়া ছোট কদমে ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময়ে সাতাশ আঠাশ বছরের একটি যুবক ডান হাতে একটি জলের পাত্র লইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটি কামরার

হ্যাণ্ডেল ধরিয়া অতি কষ্টে চলন্ত ট্রেনে উঠিল। ট্রেনের শেষ অংশ তখনও প্লাটফরম্ ছাড়ায় নাই। হ্যাণ্ডেলটি ঘুরাইয়া ছেলেটি যখন কামরার মধ্যে ঢুকিল, একাধিক নারীকণ্ঠ তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। "ইয়ে ফিমেল কম্পার্ট হ্যায়", "ই-টস্ ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট, কান্‌ট্ ইউ-সি ?" "তুম্‌কো সরম্ নহী-আতা ?" "তুম ডাকু হ্যায়, উতরো"—এই বলিয়া একটি মহিলা তাহার দিকে উঠিয়া আসিলেন। অনেকে এক দৃষ্টে যুবকটির দিকে তাকাইয়া আছে, কেহ কোন কথা কহিতেছে না। মহিলাটি কোমরে হাত দিয়া ছেলেটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং চোখ মুখ পাকাইয়া বেশ জোরে বলিলেন, "অভি তুম্‌কো উতারনে হোগা"। কণ্ঠস্বরে প্রচুর ঝাঁঝ। অনেকগুলি বেসুরা পর্দার সংমিশ্রণের মধু-কণ্ঠ, আমেরিকান ইঞ্জিনের হ্রেষাধ্বনিকেও বুঝি হার মানায়। ছেলেটি তাহা বুঝিতে পারিল, একবার তাহার দিকে তাকাইয়াও লইল, তবু হাসিতে পারিল না—কারণ বিপদ আসন্ন। সে জলের পাত্রটি এতক্ষণ হাতে করিয়াই ছিল। পাত্রটি নীচেয় রাখিয়া জোড় হস্তে মহিলাটিকে যাহা হিন্দিতে কহিল তাহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—বহিন, মাপ কর। অন্য কামরায় আমার মা-বাবা আছেন। তাঁহাদের জন্য আসানসোলে জল লইতে নামিয়াছিলাম কিন্তু ট্রেন ছাড়িয়া দেওয়ায় দৌড়াইয়া এই কামরায় উঠিয়া পড়িয়াছি, বুঝিতে পারি নাই এটা জানানা কামরা। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিয়াছিল, —তাঁহারা তাহার মা-বহিনের সমান, দয়া করিয়া কিছু মনে না করিলে সে ধানবাদ নামিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে স্ত্রীলোকটির দিকে উত্তরের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার কাকুতি মিনতি সকলই ব্যর্থ হইল। কয়েকজন মহিলা তাহাকে কামরার বাহিরে না পাঠাইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন, ছেলেটি জলের পাত্রটি কামরার মধ্যে রাখিয়া, নিজে বাহিরে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া—ধানবাদ পর্যন্ত যাইবে। অপরিচিত নারীরাজ্য—উপায় নাই, শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের কথাতেই ছেলেটিকে রাজী হইতে হইল। মা-বহিনের দল অর্ধ-

জয়ের তৃপ্তিতে বীরাঙ্গনার মত নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন। "বাত্ শুনেগা নহি—হুঁ" বলিয়া পূর্বের সেই মহিলা নিজের জায়গায় বসিয়া দেখেন ছেলেটি তখনও বাহিরে যায় নি। অমনি তিনি তাঁহার বীণানিন্দিতকণ্ঠে আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"যাও বাহার নিক্‌লো।"

ছেলেটি অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নাই। অগত্যা নিঃশব্দে জলের পাত্রটি কামরার মধ্যে রাখিয়া হ্যাণ্ডেলটি ঘুরাইয়া দরজা খুলিবে, এমন সময়ে কুন্তল দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলিল,—দাঁড়ান, বাইরে যেতে হবে না আপনাকে। কুন্তলের উপর কামরার সকলের দৃষ্টি পড়িল। কুন্তল উঠিয়া ছেলেটিকে সরাইয়া, দরজা হেলান দিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি যে বাঙ্গালী তাহা কুন্তল পূর্বেই বুঝিয়াছিল। এতক্ষণ সে চুপ করিয়াই ছিল কিন্তু এই নিদারুণ প্রমীলা-রাজ্যের 'রায়' শুনিয়া কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিল না। কাহারও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া কুন্তল ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিতে লাগিল,—ছি ছি, আপনারা না মায়ের জাত বলে গর্ব করেন? আপনাদেরই মত এক মায়ের ছেলে এই ভদ্রলোক, বিপদে পড়ে ভুলে এই কামরায় উঠে পড়েছেন, আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে তাঁর সব কথা ব'লেছেন, তবু একটি মাত্র ষ্টেশনের জন্য তাঁকে এই কামরার কোণে একটু দাঁড়িয়ে থাকতে দিতেও আপনারা নারাজ?—এই দ্রুতগামী ট্রেণে কামরার বাইরে যেতে ব'লতেও আপনাদের এতটুকু লজ্জা হ'ল না? আপনাদের ঘরে কি ছেলে, ভাই নেই? আশ্চর্য!

সেই ডাকসই মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন,—উহ অগর্ ডাকু হো তো—ফির্?

কুন্তল উত্তরে কহিল,—ডাকু হ'লে কেউ এইভাবে বাইরে যেতে চায়? তার আকৃতি কি এই?—এই বলিয়া সে ছেলেটির দিকে চাহিল।

ছেলেটিও কুন্তলের মুখের দিকে চাহিয়া মিনতি জানাইয়া বলিল, —না না, ওঁদের যখন অসুবিধা হচ্ছে, আমার বাইরে—

কুন্তল কহিয়া উঠিল,—না, আপনাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। দেখি এ কামরায় কার এমন সাধ্য আপনাকে বাইরে যেতে বলে। আপনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন। যদি কেউ চেন টানেন —যদি 'গার্ড' কিংবা 'চেকার' আসে, আমিই সব বলব।

ছেলেটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। ধানবাদে ট্রেন থামিলে কুন্তলই দরজাটি খুলিয়া দিল। ছেলেটি নামিতে যাইবে এমন সময় কুন্তল কহিল,—দিন্, জলের পাত্রটি আমার কাছে,—নামুন আপনি।

জলের পাত্রটি কুন্তলের হাতে দিয়া ছেলেটি নামিয়া দাঁড়াইল— কুন্তল ট্রেন হইতে জলের পাত্রটি আগাইয়া ধরিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ছেলেটি চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ যেন একটা দমকা বাতাস আসিয়া কামরার সার্‌সীগুলি নাড়া দিয়া গেল।

৩

ট্রেন ধানবাদ ছাড়িয়া দিয়াছে। আসানসোল হইতে ধানবাদ পর্যন্ত যে উত্তেজনায় কামরাটি সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল তাহার উপশম ঘটিয়াছে। যাত্রীরা আবার সকলেই নিজ নিজ ব্যাপার লইয়া কথোপকথন সুরু করিয়াছে, আপন আপন ভাষায়। ঘরের কথা, ছেলেমেয়ের কথা, কাহার কোথায় যাওয়া হইবে, স্বামী কোথায় কি কাজ করেন, ইত্যাদি। আবার কাহার ভাগে কতটুকু জায়গা হইয়াছে ইহা লইয়াও দুইজনে বচসা সুরু করিয়াছে। কেহ বা ঘুমের আবেশে অন্যের গায়ে ঠোক্কর মারিতেছে। কেহ কেহ কোলের ছেলে বা মেয়েকে অবাধে দুধ খাওয়াইতেছে—মহিলা-রাজ্যে মহিলাদের লজ্জার কিছু নাই।

কুন্তল তাহার জায়গাটিতে চুপ করিয়াই বসিয়াছিল। কেহই তাহার সহিত কথা বলে নাই। সারাদিন ঝড়ের নেশায় কাটিয়াছে। কোন কিছু ভাবিবার, কোন কিছু চিন্তা করিবার অবসর কুন্তলের ছিল না। আসানসোল হইতে ধানবাদ পর্যন্ত সেই গতিবেগ ভিন্ন

দিকে প্রবাহিত হইয়াছে মাত্র। অনেকক্ষণ ট্রেন ধানবাদ ছাড়িয়া আসিয়াছে, কুন্তল বসিয়া বসিয়া ছেলেটির কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ছেলেটি এইবারে নিশ্চয়ই তাহাদের কামরায় উঠিতে পারিয়াছে, তাহার মা বাবা জল খাইতে পারিয়াছেন। ছেলেটির মা বাবার কথা মনে হইতেই নিজের মা বাবার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। গত রাত্রেও সে মায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইয়াছে। আজ হয়তো মা বাবা কেহই খাইতে বসিবেন না। আর ছোট ভাই মিণ্টু,—সে যে দিদির হাতে ছাড়া খায় না। দিদি খায় নাই বলিয়া গতরাত্রে নিজেও না খাইয়া বসিয়াছিল। 'দিদি, বাবা তোকে ব'কেছে?—এই কথা মনে পড়িতেই চোখ উপ্‌ছাইয়া তাহার জল আসিল। দুই হাত দিয়া সে চোখ ঢাকিল। এমন সময় কে যেন ডাকিয়া তাহার চমক্ ভাঙ্গাইলেন।

—তুমি কোথায় যাবে মা?

কুন্তল চোখ মুছিয়া দেখিল হিন্দুস্থানী কায়দায় কাপড় পরা একজন প্রৌঢ়া মহিলা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া। কুন্তল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমায় বল্‌ছেন,—আপনি বাঙ্গালী?

স্নেহ-কণ্ঠে উত্তর আসিল, হ্যাঁ মা, আমি বাঙ্গালী। ঐ কোণটাতে আমি বসেছি। এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম। ছেলেটিকে সত্যই তুমি বাঁচিয়েছ। বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া সত্যিকার এত দরদ আর কার আছে? আমার কাপড় অ-বাঙ্গালীর মত পরা দেখে বুঝি মনে ক'রেছ আমি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে নই। তা একরকম অ-বাঙ্গালীই হ'য়ে পড়েছি। এস আমার কাছে বস্‌বে। এতগুলি মেয়ের বিরুদ্ধে তুমি একা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি ঠিক তোমার মত ক'রে দাঁড়ান যায়, অন্যায় এদের মতই চুপ করে যায়। তার উদ্ধত ফণা গুটিয়ে সে গর্তে মুখ লুকোয়। অন্যায় বুঝেও যে আমরা নিজের স্বার্থে কিছু বল্‌তে চাইনে, বল্‌তে পারিও নে,—সেই ত' আমাদের দুর্বলতা। না হ'লে দেখ না আমিও ত' কিছু বল্‌তে

পারতাম। বসে বসে তোমার কথাগুলি শুন্‌ছিলাম, আর লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

ভদ্র মহিলার অনুরোধে কুন্তল তাঁহার স্বল্প-পরিসর বিছানায় গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিয়া কুন্তল বুঝিতে পারিল, সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে তাঁহার মিল নাই। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, কিন্তু চোখের দীপ্তি যেন সারা মুখখানিকে অনবদ্য ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিয়াছে। অচটুল মনের স্থির বহিঃপ্রকাশ তাহাকে যেন আরও মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কাঁচাপাকা অলকগুচ্ছ কপালে ভীড় করিয়া আছে, শ্বেতশুভ্র সূক্ষ্ম পাড়ওয়ালা শাড়ী পরণে—হিন্দুস্থানীদের মত ডানদিক দিয়া ঘুরাইয়া পরা,—দেখিলে শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া ওঠে।

কুন্তল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাঙ্গালী মেয়েদের মত কাপড় পরেন না কেন?

মহিলাটি উত্তর করিলেন, বাঙ্গালী 'মা' হবার সৌভাগ্য যে আমার হয়নি মা।

কুন্তল উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, কাপড় যেমন করেই না পরি, বাঙ্গালী মায়ের মন ত' আমার বদ্‌লে যায়নি মা। সে যাক্‌গে, তোমার কথা শুনি এবার।

কুন্তল এ কথার কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাইরে হ্যাণ্ডেল ধ'রে যেতে যেতে ছেলেটা যদি হাত ফস্‌কে পড়ে যেত?

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে তিনি বিস্মিত হইলেন না। বরং বলিলেন,—ছেলেটি খুব ভদ্র।

—অথচ দেখুন, এরা সবাই মিলে কি দুর্ব্যবহারই না করলে, বলিল কুন্তল।

ভদ্রমহিলা সহজাত শান্তকণ্ঠে কুন্তলের কথার উত্তরে বলিলেন, সকলেই সব জিনিষ কি ভালভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে মা? লজ্জা এবং বিপদের হাত হ'তে তুমিই তাকে রক্ষা ক'রেছ।

দুইজন অপরিচিতার মধ্যে আর একজন অপরিচিতের আবির্ভাব—কুন্তল যেন একটু লজ্জা পাইল। সে তাড়াতাড়ি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন মা?

মহিলা কহিলেন,—কাশীতে।

কাশী? আমিও ত' কাশী যাব, বলিল কুন্তল।

ট্রেন তখন পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটিয়াছে।

৪

কুন্তল কাশী আসিয়াছে। যে বন্ধুর বাড়ী কুন্তল উঠিবে বলিয়া কাশী আসিয়াছিল তাঁহারা সম্প্রতি কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কুন্তলকে অগত্যা ট্রেনের মহিলাটির গৃহেই স্থান করিয়া লইতে হইল। তিনিও তাহাকে তাঁহার ওখানে উঠিবার জন্য পূর্বেই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন।

কয়েকদিন হইয়া গেল। আজকাল করিয়া তিনি কুন্তলের চলিয়া যাইবার দিনটি ক্রমেই পিছাইয়া দিতেছিলেন। কেন যেন কুন্তলকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। এই কয়দিন ধরিয়া কুন্তলের সহিত তাঁহার অনেক কথা হইয়াছে। কুন্তল বলিয়াছে তাহার ত্রি-সংসারে কেহই নাই। বি-এ পাশ করিবার কিছুদিন পরেই মাতা-পিতা হারাইয়াছে। দিল্লীতে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা হইবে এই ভরসায় দিল্লী যাইবে ইচ্ছা। পথে কাশী নামিয়া বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। বন্ধুরা ত' অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

কুন্তলের কথা শুনিয়া মহিলাটি তাহাকে কাশীতেই থাকিতে বলেন। তাঁহাদের বাসায় অন্য লোকজন ছিল না, মহিলা আর তাঁহার স্বামী। স্বামীকে বলিয়া তিনি তাহার চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। কারণ, তিনি যাঁহার গৃহিনী হইয়া আছেন, তিনি অ-বাঙ্গালী হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। কুন্তলের অসহায় অবস্থার কথা, সম্প্রতি মাতা-পিতা হারাইয়া চাকুরীর খোঁজে পথে বাহির হইয়াছে শুনিয়া উঁহারা দুই জনেই কুন্তলকে আর কোথাও

যাইতে দিলেন না। পুত্রকন্যাহীন এই বিচিত্র দম্পতির গৃহে কন্যার মতই রহিবার অধিকার কুন্তল আজ পাইল।

কুন্তলকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কাশী-দম্পতির লাভ হইয়াছিল কি ক্ষতি হইয়াছিল, হিসাবী লোকদের তাহা বিচার্য হইলেও, অধ্যাপক-গৃহিনীর মন যে মাতৃরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই বোঝা গেল। তাঁহার ব্যবহারে কুন্তল যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনিও কুন্তলকে কম আকর্ষণীয় মনে করেন নাই। বাস্তব পক্ষে কুন্তলকে তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তাই বন্ধুকে না পাইয়া কুন্তল যখন এখানে আসিল, তখনই কেন যেন তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন —মেয়েটি বেশ, কোথায় যাইবে কে জানে,—তবু কয়েকদিন নিজের কাছে রাখিয়া দিব। কয়েকদিন কাটিল, আবার কয়েকদিন থাকিবার কথা বলিলেন। এমন করিয়া কুন্তলকে আর যাইতেই দিলেন না। কুন্তলও এই পরিবারের একজন হইয়া গেল।

কুন্তল মহিলাকে বড়মা বলিয়া ডাকে। অধ্যাপককে ডাকে মেসোমশাই। পাড়ায় কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মহিলা বলেন তাঁহার বোনের মেয়ে। একদিন দু'দিন করিয়া মাস কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম কুন্তল নিজেকে এই নূতন পরিবেশে বিশেষ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। বাড়ীতে কি হইতেছে, মার অবস্থা কি হইয়াছে, বাবাকে কত লোকের কত কথাই না শুনিতে হইতেছে, উৎপলা, মিণ্টু —ওরা দিদির কথা মনে করিয়া কতই না কাঁদিয়াছে,—এই সব চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিত। অধ্যাপক-গৃহিনী ইহা লক্ষ্য করিতেন এবং আপন স্নেহে ভালবাসায় কুন্তলকে বেশীক্ষণ বিমনা থাকিতে দিতেন না। ঘর ছাড়িয়া আসিয়া তাই ঘর পাইতেও তাহার বেশী সময় লাগিল না।

কিন্তু বাংলা দেশে মেয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুন্তল গৃহত্যাগিনী। বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপনে যে মেয়ে ঘর ছাড়িয়াছে তাহাকে সাধু ভাষায় গৃহত্যাগিনী বলিলেই অসাধু অর্থের সবখানিই বলা হয়। বলিতেই কি

কেহ ছাড়িয়াছে,—বিশেষতঃ [illegible]র মেয়েরা ঘোট্ পাকাইয়াছে বেশী করিয়া, তিলকে তাল করিয়া—ছি ছি, অমন বি-এ পাশের মুখে আগুন, জাত-ধর্ম আর কিছু রইল না গা, মা-বাপের মুখে চুন-কালি দিয়ে শেষে নাকি বেরিয়ে গেল,—এমন কত নির্লজ্জ কটূক্তি যে তাঁহারা মুখ দিয়া বাহির করিলেন,—শুনিলেও কানে আঙ্গুল দিতে হয়। কিন্তু মেয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং সতী-ধর্ম বহির্গত কোন অন্যায় করিয়া গৃহ ছাড়িয়াছে, একথা ছাড়া অন্য কথা কেনই বা আমরা চিন্তা করিতে শিখিব না? নিজের ভাগ্য অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সে যদি সমাজের নির্মম ভগ্ন-রথ-চক্রে নিজেকে নিষ্পেষিত হইতে না দেয়, তাহাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তৃপ্তি বোধ করিবার নীচতার নেশা কেন এত প্রবল হইয়া উঠিবে?—এই কথা সারদাদেবী স্বামী মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করিয়াছিলেন। সকলে যাহা বলে—সে যে সত্য নয়—তিনি মা—তিনি ত' তাহা জানিতেন। তাই লোকের নিকৃষ্টতম উক্তিতে প্রথম প্রথম বিচলিত হইলেও পরে আর ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

বাংলাদেশে এমন কত মেয়ে আছে, কত বধূ আছে—যাহারা মনে মনে জানে সংসারের কত সত্য-মিথ্যার ইতিহাস, কিন্তু সারদাদেবীর মতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।

* * * *

অধ্যাপক শ্রীরাধামোহন মিশ্র কাশীতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, অনেকেই তাঁহাকে জানেন। অধ্যাপক-গৃহিনী অনুরূপাদেবীও বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী মহলে বিশেষ পরিচিতা। সকলেই তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন; কন্যা-স্বরূপা কুমারী সাবিত্রীও তাই অল্পদিনের মধ্যে সুধী-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া পড়িল। কুন্তলের কথাই বলিতেছি। কুন্তল এখানে সাবিত্রী নামেই পরিচিত। তাহার কুন্তল নাম এখানে কেহই জানে না, এমন কি অনুরূপাদেবীও না। নাম গোপন রাখার কি প্রয়োজন তাহা কুন্তলই জানে।

অনেকে কুন্তলকে অনুরূপার কন্যা বলিয়াই মনে করেন। তাহাতে অনুরূপা এবং শ্রীরাধামোহন বরং খুশীই হন। অনেকে অনেক সময় কুন্তলকে মিস্ মিশ্র বলিয়াও সম্বোধন করেন। এমন করিয়াই ধীরে ধীরে কুন্তলকে লইয়া অনুরূপাদেবীর নূতন সংসার গড়িয়া উঠিল।

কুন্তল যে এই পরিবারের মেয়ে নয়, সে কথা আজ আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করি! যাহাদের সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কথা কখনও কি তাহার মনে পড়ে? কিন্তু নিজের ভাগ্যকে সামনে না রাখিয়া তাহার ত' উপায় ছিল না। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া গৃহের কথা তাই জোর করিয়াই সে ভুলিয়াছে। কুন্তলকে দেখিলে কে বুঝিতে পারিবে কি করুণ তাহার অতীতের কাহিনী! সব কিছু ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, স্বভাব-সহজ চাঞ্চল্যে সে এই নূতন গৃহখানিকে আনন্দ-মুখর করিয়া তুলিয়াছে। কুন্তল এ বাড়ীতে আজ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় রহিলেন মা-বাবা, কোথায় রহিল ভাই-বোন! হয়ত' কখনও মনে পড়ে না।

কুন্তলের ব্যবহারিক সৌন্দর্যে শ্রীরাধামোহন, অনুরূপাদেবী উভয়েই বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বহু স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে কুন্তল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নৃত্যে, গানে, আবৃত্তিতে বাঙ্গালী মহলে কুন্তলের প্রশংসা ধরে না। সেদিন এক আবৃত্তি সভায় কুন্তল রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' আবৃত্তি করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কাশীর প্রবাসী বাঙ্গালী মহল এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীরাধামোহন ও অনুরূপাদেবী এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন।

আবৃত্তি সভার বিষয় সূচী শেষ হইলে উঁহারা তিন জনেই বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সান্ধ্য 'চা' এর আসর বাহিরের ঘরেই বসিল। শ্রীরাধামোহন, অনুরূপাদেবী, কুন্তল— সকলের মনই যেন খুশীতে ভরিয়া আছে। কুন্তলের আবৃত্তি অনবদ্য হইয়াছে।—এই কথাই বলিতে বলিতে শ্রীরাধামোহন একখানা চেয়ার টানিয়া লইলেন। পাশেই বসিলেন অনুরূপাদেবী। অনতিকালের

মধ্যেই চা এর [illegible] কিছুই [illegible] কুন্তল এখন 'চা' তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত।

ঘরখানি উত্তমরূপে সাজান দেখিয়া শ্রীরাধামোহন বলিলেন,—ঘরখানা এমন সাজিয়েছে কে? আমার সাবিত্রী মা বুঝি?

অনুরূপাদেবী উত্তর করিলেন, মেয়ের আমার কেমন কাজের পরিপাটি দেখ।

মনোরম কুন্তলের গৃহসজ্জা। আকাশ রংএর পর্দা জানালায়। ঘরের এক কোণে রেডিওটি। অপর প্রান্তে একটি অরগ্যান। দরজায় বড় পর্দা ঝুলিতেছে। গালিচার উপরে সুন্দর সোফা, সুন্দর করিয়া সাজান। এক পার্শ্বে ছোট্ট গোল টেবিল, তাহার চারিধারে রঙ্গীন বেতের চেয়ার। দেওয়ালে কয়েকখানি মনোরম দেশী বিদেশী ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি। স্তিমিত আলোকে ঘরখানি স্নিগ্ধ। এই অপূর্ব পটভূমিকায় কুন্তলও অসামান্য শ্রীমণ্ডিত। ফিকে বেগুনী রংএর শাড়ী পরণে, অবনমিত খোপায় হাসনুহানার গুচ্ছ, কানে দু'টি সোনার নাগকেশর, গলায় সরু মুক্তোর মালা। সব কিছু মিলিয়া ঘরখানি যেন এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

অনুরূপাদেবী প্রথম কথা কহিলেন। তিনি শ্রীরাধামোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, সাবিত্রীর আবৃত্তি তোমার কতখানি ভাল লেগেছে?

অবশ্য প্রশ্নটি ঠিক এই ধরণের হইবে অনুরূপাদেবীও তাহা চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমন অনেক সময় হয়,—মন যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চায়—মুখের কথায় তাহা ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তবু প্রশ্ন যে রূপ লইল, তাহার উত্তর ভাল বা মন্দ বলিয়া শেষ করিয়া দেওয়া শ্রীরাধামোহনের পক্ষে সহজ হইল না।

চায়ের কাপটি হাতে লইয়া হাসিয়া তিনি কহিলেন, তোমার যতখানি ভাল লেগেছে তার চেয়ে বেশী ব'লে তোমাকে ছোট কত্তে চাই না, আবার তার চেয়ে কম ব'লেও নিজের বোধশক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ ক'রে তোমাকে কষ্ট দিতেও ইচ্ছে নেই।

শুনিয়া অনুরূপাদেবী খুশী হইলেন। [illegible] মৃদু মুখের হাসিতে প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, মেয়ের সামনে তোমাকে প্রশংসা ক'রতে লজ্জা হয়, তবু তোমার সহজ ও সুন্দর মনের কাছে জয় পরাজয়ের কোন দুর্বলতাই আমার নেই।

অপূর্ব দীপ্তি অনুরূপাদেবীর চোখে মুখে দেখিতে পাইলেন শ্রীরাধামোহন। শ্রদ্ধায় তিনি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই কুন্তলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, জান মা সাবিত্রী, তোমার বড়মাকে রবীন্দ্রনাথের 'সবলার' মধ্যে আমি খুঁজে পাই। "নারীকে আপন শক্তি জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার?" আমার ত' মনে হয় এই কবিতার প্রত্যেকটি লাইনের মানে তোমার জীবনে রূপ নিয়েছে,—এই বলিয়া তিনি অনুরূপার দিকে আবার তাকাইলেন।

অনুরূপা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তাই না কি?

সারা ঘরখানি যেন উদার মাধুর্যের উষ্ণতায় ভরিয়া গিয়াছে, শ্রীরাধামোহন তাহা উপলব্ধি করিলেন। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। নীরব মুহূর্তগুলি যেন সকলের মনেই মনের খবর পৌঁছাইয়া দিতেছিল।

শ্রীরাধামোহন হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অনুরূপাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমার মেয়েকে ব'লেছ তোমার কথা?

কি?—বলিয়া অনুরূপাদেবী স্বামীর দিকে তাকাইলেন।

কেন, বলনি তুমি সাবিত্রীকে, বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে হ'য়েও কেমন করে অ-বাঙ্গালী ঘরের ঘরণী হ'লে?—বলিলেন শ্রীরাধামোহন।

অনুরূপাদেবী স্বামীর দিকে প্রফুল্ল আঁখি দু'টি উঠাইয়া অপলকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ আবার নীরবে কাটিল। পরে অনুরূপা কহিলেন, জীবনের পরম ও চরম সত্যকে মেয়ের কাছে গোপন রাখার লজ্জা আমাকে বেশী পীড়া দেবে তা হয়ত' তুমি জান। সত্য গোপন করার মত এত-বড় অপরাধ সংসারে নেই।

এই কথা শুনিয়া কুন্তলের মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে হইয়া

গেল। সে ত' কত কিছুই গোপন করিয়াছে। নিজের নাম পর্যন্ত সে ভাড়াইয়া চলিয়াছে। নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া সে তাহার বড়মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি কথা বড়মা ?

তোমাকে পাওয়ার আনন্দে সে কথা আমি ব'লতে অবসর পাইনি মা, বলিলেন অনুরূপা।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীরাধামোহনের দিকে চাহিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনুরূপা। শ্রীরাধামোহনের হাত দুইটি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, না না, সাবিত্রীর বড়মা হ'য়ে আর কয়েকটি দিন নির্বিবাদে আমাকে থাকতে দাও, তারপর সব কথা আমি ওকে ব'লব, সব কথা ব'লব,—বলিতে বলিতে তিনি ড্রয়িংরুম ছাড়িয়া ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন। এক মুহূর্তে কেমন যেন অসংলগ্ন হইয়া গেল স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সমস্ত পরিবেশ। শ্রীরাধামোহন নীরবে উঠিয়া গেলেন বাহিরের বারান্দায়। কুন্তল তখন নির্জন ঘরে একা একা বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—কি সে নির্মম সত্য যাহা প্রকাশ করিতে অনুরূপার মনে এত বেদনা !

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রে যখন সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন, দেখিয়া কে বলিবে কিছুক্ষণ আগেই তাহাদের মধ্যে একটা ঘুর্ণী হাওয়া বহিয়া গিয়াছিল। ঘুর্ণী—হাওয়া বাতাসে যেমন জট পাকায় আবার আবর্জনা দূরও করে, অনুরূপার সহজ বহিঃপ্রকাশ এই কথাই প্রমাণ করিয়া দিল।

আহার করিতে করিতে অনুরূপা কুন্তলকে বলিলেন, জান মা সাবিত্রী, তোমার মেসোমশাইকে বাংলা শেখাতে আমাকে কতদিন মাষ্টারী ক'রতে হ'য়েছে। তুমি কি ধরতে পারবে উনি বাঙ্গালী নন্ ?

শ্রীরাধামোহনও হাসিয়া বলিলেন, আর দেখ মা, তোমার মাসিমাকে হিন্দি আর ইংরেজী শেখাতে আমাকেই কি কম মাষ্টারী ক'রতে হ'য়েছে ? দেখে কে বলবে উনি অ-বাঙ্গালী নন !

অনুরূপার চোখে হাসি উপছাইয়া পড়িতেছিল। তিনি তাঁহার

স্বামীর দিকে মৃদু কটাক্ষে তাঁহার [illegible] শ্রদ্ধা যেন ঢালিয়া দিলেন। হাসিয়া পুনরায় বলিলেন,—তবে আমাকে তুমি ইংরেজী শিখিয়ে মেমসাহেব ক'রতে পারনি।

মেমসাহেব হবার ইচ্ছে তোমার ছিল না, তাই হওনি। না হ'লে তোমরা কি না পার? তোমাদের শক্তিকে আমি কখনও অস্বীকার করি না। তোমরা যে মায়ের জাত।

—সে কথা তুমি ব'লো না। আমাদের কি শক্তি আছে বলত'? বাঙ্গালী মায়েদের আছে শুধু চোখের জল,—আর কিছুই নেই। কিছুই আমরা পারি না। আজ সাবিত্রী এসে ঠিক আমাকে যেন বাঙ্গালী 'মা' করে তুলেছে। পশ্চিমের গরম হাওয়ায় মনটাও গিয়েছিল শুকিয়ে। বাংলা দেশকেই একরকম গিয়েছিলাম ভুলে। কাপড় পর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়েদের মত পরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখ ত', মেয়েটা কোথা থেকে এল বাংলা মাটির সব শ্যাম-সম্ভার নিয়ে,—বলিতে বলিতে অনুরূপার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; শ্রীরাধামোহনের দিকে একটু চাহিয়াই খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কি কথা হইতে কি কথায় আসিয়া পড়িলেন অনুরূপা। কেন তাঁহার রুদ্ধ অশ্রু-নির্ঝর মুখর হইয়া উঠিল কে তাহার উত্তর খুঁজিয়া পাইবে? বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, সাবিত্রীকে দেখ্‌লেই আমার মনে হয় সেই ফেলে-আসা গ্রামের পাণ্ডুর মুখখানি;—মনে হয় এখনও বুঝি অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে আছে আমার জন্য। ছোট্ট নদী, দুই পাশে পায়ে চলার পথ, নদীর মতই গেছে এঁকেবেঁকে। বাড়ীর সামনে হিজল গাছের ডালে বাবুই পাখীর বাসা। জামরুল্ গাছে থোলো থোলো জামরুল— কাল বৈশাখীর ঝড়ে গাছের তলা শাদা ক'রে রেখেছে। ছোট্ট জেলের ডিঙ্গি নদীর বুকে, আকাশে চড়ুই পাখীর মত ঢেউএর তালে তালে নেচে নেচে চলেছে। এসেছে বর্ষাকাল, দুই তীর থৈ থৈ ক'রে উঠেছে নতুন বর্ষার জলে। মহকুমার পেটা ঘড়িটা মনে হ'য়েছে কত

কাছে। ভিন্‌দেশের ধানকাটা ঘোগরা ভাটিয়াল্ গান গাইতে গাইতে ভাটির স্রোতে তাদের নৌকো গিয়েছে ভাসিয়ে। বেদের মেয়েরা তাদের ঘর-সংসার-ভরা ছোট্ট ছাউনী দেওয়া নৌকোয় কাঁচের চুড়ি নিয়ে ঘাটে ঘাটে বিক্রী করে—বলে, মাঠান, বেদে গিয়েছিল কোল্‌কাতার মুর্গীহাটার বাজারে—নতুন সোনার-জলের কাঁচের চুড়ি আনা ক'রেছে—তোমার মেয়ের হাতে খুব ভাল মানাবে। বেদিনীর ছোট্ট ছেলেটা, ভয় নেই এতটুকু—ঝুপ্ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কাট্‌তে সুরু করে। অদূরে সিদ্ধেশ্বরীর মঠে পূজার ঘণ্টা বেজে ওঠে। বর্ষার গৈরিক জলে কত যে মাতামাতি—মনে হয়, এই মনিকর্ণিকার ঘাটের গঙ্গাস্নানও বুঝি সেই পুণ্য দিতে পারে না, যা সেই ছোট্ট নবগঙ্গায় স্নান করে লাভ ক'রতাম। আমার কি মনে হয় জান? আচ্ছা তুমিই বল না, তুমি ত' পণ্ডিতলোক,—সেই অনাবিল মনের অবগাহন পাপ-পঙ্কিল মনের গঙ্গাস্নান হ'তে পবিত্র কি না?

শ্রীরাধামোহন বুঝিলেন অনুরূপার মন হঠাৎ জীবনের অনেক ফেলে-আসা স্মৃতি-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেন আষাঢ়ের জলভরা মেঘের অবর্ষণের আকাশ; স্তব্ধ বেদনায় স্বস্তি পাইতেছে না। অনুকূল হাওয়ার এতটুকু স্পর্শ পাইলেই বুঝি অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িবে। তাই তিনি অনুরূপাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—একটা স্কুলের চাকুরীর খোঁজ পেয়েছি, তোমাদের যদি মত থাকে, সাবিত্রী চাকুরীটা ক'রতে পারে।

আহারান্তে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। স্কুলের চাকুরী হইলেও মাইনে যখন ভাল, তখন তাহা না গ্রহণ করিবার কোন যুক্তি থাকে না। সাবিত্রী স্কুলেই কাজ লইবে ঠিক হইল।

* * * *

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। মর্ণিং ক্লাস কুন্তলের। সন্ধ্যার দিকে কুন্তল তাহার বড়মার সঙ্গে প্রায়ই বেড়াইতে যাইত। আজও তাঁহারা বাহির হইয়াছেন। অনুরূপা বলিলেন, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিয়া ফিরিবেন। যথাসময়ে তাঁহারা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

কাশীতে কুন্তলের উপস্থিতির পূর্বে আমরা অনুরূপাকে অনেকদিনই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি, সঙ্গে শ্রীরাধামোহন। শ্রীরাধামোহনের যেমন ছিল সর্বকার্যে নিষ্ঠা, তেমন তাঁহার মনও ছিল প্রশান্ত ঔদার্যে পূর্ণ। কোন কিছুর সংকীর্ণতা তাঁহার মনে দাগ কাটিতে পারিত না। অনুরূপাদেবী ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী। আত্মপ্রত্যয়ে দুইজনেই এত সমৃদ্ধ ছিলেন যে পরস্পারের বিশ্বাসের মধ্যে এতটুকু ফাঁক নাই।

কুন্তল কিছুদিন এখানে থাকিয়া বিশেষভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিত না, পারিবারিক জীবনে এমন অনাবিল ভালবাসা কেমন করিয়া সম্ভব?—দেখিয়াছে ত' তাহার মা-বাবাকে, দেখিয়াছে ত' আত্মীয়-স্বজনকে, পাড়ার পরিচিত অনেক স্বামী-স্ত্রীকে। কিন্তু তাহার মনে হইত এমনটি সে বুঝি আর কোথাও দেখে নাই।

* * * *

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। কুন্তল কাশীতে সাবিত্রী নামেই পরিচিত। কখনও কখনও আমরা যদি কুন্তল বলিয়া ফেলি তাহাতে দোষের কিছুই নাই। অনুরূপাদেবীকেও যদি অনুরূপা বলিয়া থাকি বা বলি তাহাতেও তাঁহার সম্ভ্রমের হানি হইবে না।

* * * *

আরতি দেখিয়া ফিরিতেছিলেন অনুরূপা, সঙ্গে আছে সাবিত্রী। উঁহারা প্রায় বাসার কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। পথের বাঁকটি ঘুরিতেই একটি ছোট্ট মেয়ে দশ এগার বছর বয়স হইবে—'মা' 'মা' বলিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। অনুরূপাকে 'মা' মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু মেয়েটি যখন দেখিল, তিনি তাহার 'মা' নন, তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। মেয়েটি যে বাঙ্গালী তাহা তাহার 'মা' ডাক শুনিয়াই বোঝা যায়। অনুরূপা তাহাকে, সে কোথায় থাকে, কোথায় গিয়াছিল, রাস্তায় একা কেন, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা

বলিল তাহাতে জানা গেল,—সে তাহার মায়ের সহিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছিল। ভীড়ের মধ্যে মাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথ ভুলিয়া এই পথে আসিয়া পড়িয়াছে। রেল লাইনের ধারে তাহাদের বাসা। ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলে সে বাসায় যাইতে পারে, এমন কথাও সে বলিল।

সাবিত্রী অনুরূপাকে বলিল, আমি মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে আসি বড়মা—তুমি বরং বাসায় ফিরে যাও।

কিছুদিন হইল সাবিত্রী অনুরূপাকে আর 'আপনি' বলে না, 'তুমি'ই বলে। মাকে আপনি বলা অনুরূপা পছন্দ করিতেন না। অনুরূপা খুশী হন্ বলিয়াই সাবিত্রী তাঁহাকে 'তুমি' বলে।

অনুরূপা বলিলেন, চল্, না হয় দু'জনেই যাই।

সাবিত্রী বলিল, বাসায় মেসোমশাই চিন্তিত হবেন, আমি একে পৌঁছে দিয়ে এক্ষুনি চলে আসব।

আচ্ছা,—বেশী দেরী ক'রো না যেন।

অনুরূপা বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। সাবিত্রীও মেয়েটিকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা দিল। ষ্টেশনের পথ সাবিত্রীর চেনা। পথ বেশীও হইবে না। তাই তাহারা হাঁটিয়াই চলিল। যাইতে যাইতে সাবিত্রী মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করিল।

মেয়েটি উত্তরে বলিল, আমার নাম রাজু—দাদা বলে 'রাজহংসী'।

'রাজহংসী', বাঃ সুন্দর নাম ত, কহিল সাবিত্রী।

মেয়েটি দেখিতে যেমন ফর্সা—সুন্দরও বটে। সাবিত্রী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার দাদা এমন নাম রাখলেন কেন? 'রাজহংসী',—বেশ নাম।

দাদা আমাকে খুব ভালবাসে কি না তাই। আমাদের নদীতে দাদার সঙ্গে খুব সাঁতার কাটতাম। আমায় ছোট্ট দেখলে কি হবে, এমন ডুব সাঁতার দিতাম—দাদা তাই নাম রাখলো 'রাজহংসী'।

মেয়েটি পট্ পট্ করিয়া কথাগুলি বলিয়া চলিল। সাবিত্রীর

ভালও লাগিতেছিল। সে মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গীতে, মৃদু হাসিয়া বলিল, তোমার দাদা কিন্তু বেশ নামটি দিয়েছেন।

বা—রে, দাদা কম লোক নাকি, দাদা যে পদ্য লেখে। কতজনের বিয়ের উপহার লিখে দেয়। ক'লকাতার অনেক কাগজে দাদার নাম ছাপা হয়। সকলে বলে দাদা কবি, এই বলিয়া সাবিত্রার মুখের দিকে চাহিল মেয়েটি।

সাবিত্রীকে বুঝি মেয়েটির ভাল লাগিয়াছিল। সে নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিল।

সাবিত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দাদার নাম কি?

সোমনাথ চক্রবর্তী;—উত্তর করিল মেয়েটি।

কলিকাতার কোন কোন মাসিক পত্রিকায় ঐ নামে রচিত কবিতা ও ছোটগল্প সাবিত্রী পড়িয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিক মহলে রাজহংসার দাদার নাম আছে—সাবিত্রীর তাহা মনে পড়িল। সাবিত্রী একটু চুপ করিতেই মেয়েটি আবার কথা সুরু করিল। অনেকটা যেন সাবিত্রীর ছোট বোন উৎপলার মত। মেয়েটি, সাবিত্রীর নাম, কাশীতে কোথায় বাসা, বাসায় কে কে আছেন,—জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী উত্তরে বলিয়াছে, সে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে—কলিকাতায় তাহাদের বাড়ী,—বাড়ীতে ভাইবোন আছে। তাহাদের নামও বলিয়াছে।

এমন ছোটখাটো কথায়-বার্তায় উহারা বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুন্তল শুনিতে পাইল বাসার ভিতর হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, তাকে কেন নিয়ে গেলে,—এখন যদি না পাওয়া যায়?

নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, পোড়ারমুখী কোথায় যে গেল ভীড়ের মধ্যে। ও মন্দিরেই আছে। চল্ আমিও তোর সঙ্গে যাই।

বাহিরের দরজার কড়া নাড়িয়া রাজু চীৎকার করিয়া বলিল, মা দরজা খোল—আমি এসেছি।

দরজা খুলিয়া উহারা বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন রাজু। মেয়েকে দেখিয়া মহামায়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সোমনাথ ধমক দিয়া বলিল, কোথায় গিয়েছিলিরে হতভাগী ?

কাঁদ কাঁদ সুরে রাজু কহিল, মা হারিয়ে গেল। কুন্তলদি'র সঙ্গে তাই পথ চিনে এলাম।

কুন্তলদি'—সে আবার কে,—কহিল সোমনাথ।

পিছনে ফিরিয়া রাজু দেখিল কোন্ অবসরে সাবিত্রী চলিয়া গিয়াছে।

৫

কুন্তল এমন করিয়া চলিয়া যাইবে রাজু তাহা বুঝিতে পারে নাই। কুন্তল ভাবিয়া লইয়াছিল—রাজু যখন নিজেদের বাসাতে আসিয়াই পড়িয়াছে তাহার আর অপেক্ষা করিয়া কি লাভ ? অপেক্ষা করিলে হয়ত' তাহাদের বাসার সকলের সঙ্গে পরিচয় হইবে। তখন প্রসঙ্গক্রমে—কোথায় থাকা হয়, কি করা হয়, মা-বাবা আছেন ত', এমন কত কি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। একে তাহার চলিয়াছে অজ্ঞাতবাস, তাহাতে কোন্ কথার ফাঁকে কি বাহির হইয়া যাইবে, এই সমস্ত ভাবিয়াই সে অপেক্ষা করিতে চাহে নাই। অবশ্য ইহা ভাল হইল কি মন্দ হইল, এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। তবু কেন যেন সে শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিল না।

রাজু বাসায় আসিয়া কুন্তলের প্রসঙ্গ উঠাইল। রাজু বলিল, কুন্তলদি' বলিয়াছে, রাজুকে নাকি তাহার ছোট বোনের মত দেখিতে। আর কুন্তলদি'র চেহারা,—কি সুন্দর, আর কেমন মিষ্টি তাহার কথা ; চলিয়া গেলেন—তাই দেখাইতে পারিল না।

সোমনাথ তাহার মাকে বলিল, ভদ্রমহিলা এমন ক'রে চলে গেলেন ? আমাদের একটু কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবসর দিলেন না। এটা তাঁর অন্যায়।

মহামায়া বলিলেন, ও কথা বলিস্‌নে বাবা, তিনি যে দয়া ক'রে রাজুকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন, এই যথেষ্ট। তাঁকে উদ্দেশেই

কৃতজ্ঞতা জানাই। আয় তোরা—খাবি চল্‌,—এই বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রাজু বলিল,—জান দাদা, কুন্তলদি' আমাদের পাশের বাড়ীর লক্ষ্মীমাসির মত। বেশ কিন্তু দেখ্‌তে। তুমি যে কবিতা লেখ তাও ব'লে দিয়েছি।

—বেশ করেছ—দুষ্টু মেয়ে কোথাকার—

সোমনাথ আর কিছু বলিবার আগেই মহামায়া খাইতে ডাকিলেন। তাহারা খাইতে গেল।

এইখানে রাজহংসীদের কিছু পরিচয় দিতে চাই। রাজুদের বাসায় চারটি প্রাণী। রাজুর বাবা—তিনি অন্ধ, রাজুর মা, দাদা ও রাজু। রাজুর দাদা সোমনাথ এম-এ পাশ, কোন বিদেশী ফার্মে চাকুরী করে। এই ফার্মের শাখা আছে ভারতের সর্বত্র। চাকুরী মোটামুটি ভালই। পূর্বে তাহাদের বাড়ী ছিল যশোহর জেলায়। বাবা, মা, রাজু দেশেই থাকিতেন। কিছুদিন আগে সোমনাথ কাশীতে বদলী হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আর দূর বাংলা দেশে রাখা সঙ্গত নয় ভাবিয়া—সোমনাথ তাঁহাদের কাশীতে লইয়া আসিয়াছে।

কাশীতে তাহারা সম্প্রতিই আসিয়াছে। বাঙ্গালী মহলে খুব পরিচিত হয় নাই, ষ্টেশনের পাশাপাশি কয়েকটা পরিবারের সঙ্গে তাহাদের জানাশুনা হইয়াছে মাত্র।

খাইতে বসিয়া রাজু তাহার দাদাকে আবার বলিল, জান দাদা, কুন্তলদি' কি সুন্দর দেখ্‌তে—চ'লে গেল তাই।—

—নিশ্চয় কুৎসিৎ দেখতে, না হ'লে কেউ এমন ক'রে চলে যায় নাকি ?—হাসিয়া উত্তর করিল সোমনাথ।

—ইস্‌, কেমন চাঁপা ফুলের মত রং।

—চাঁপা ফুল ? দূর্‌ দূর্‌—কালপেঁচার মত।

—মোটেই না—তোমার বৌ হবে কালপেঁচার মত।

কি বল্লিরে পোড়ারমুখী,—আমার বৌ হবে কালপেঁচা ? এই বলিয়া রাজুর মাথায় একটি ঠোক্কর মারিল সোমনাথ।

—আমার লাগেও নি,—বলিল রাজু।

মা বলিলেন,—চুপ করত' রাজু—মার খাবি কিন্তু। সোমের আদরে মেয়েটা মাথায় উঠেছে। চুপ ক'রে খেয়ে নে।

রাজুকে সোমনাথ সত্যই ভালবাসিত খুব। রাজুর শত আব্দার সহ্য করিত, যাহা তাহার মাও সহ্য করিতেন না। রাজুকে 'রাজহংসী' নাম দিয়াছে সোমনাথ। 'রাজহংসী' সোমনাথের আদরের নাম; কখনও 'রাজু', কখনও বা 'রাজহংসী'—বলিয়া ডাকে। সোমনাথ রাজুর কথায় বুঝিল, কুন্তল নামে যে ভদ্রমহিলা রাজুকে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে রাজুর খুব ভাল লাগিয়াছে। তাই তাঁহার প্রশংসায় সে এমন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেন যে তিনি এমন করিয়া কাহারও সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না।

* * *

রাজুর সঙ্গে কথায় কথায় কুন্তলের মন অতীত স্মৃতিভারে যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন তাহার ছোটবোন উৎপলা তাহার সহিত কথা কহিয়া গেল। নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সে তাহার পূর্বনাম 'কুন্তল' বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। পথে আসিতে আসিতে ভাবিল, একটু দেরী করিয়া আসিলেও হইত। না হয় আলাপ পরিচয় হইতই,—তাহাতেই বা এমন কি ক্ষতির কারণ ছিল। কেনই বা এইভাবে চলিয়া আসিলাম? বেশ মেয়েটি, চমৎকার নাম—'রাজহংসী'। রাজুকে দেখিয়া উৎপলার কথা তাহার বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যে গৃহ ছাড়িয়াছে, সে কাহারও স্নেহ-স্পর্শ যে আর পাইবে না, তাহা চিন্তা করিতেও তাহার বেশী সময় লাগে নাই। তাই মনটা তাহার রাজুকে লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে যখন বাসায় ফিরিল তখন বেশ একটু রাত্রি হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিতেই শ্রীরাধামোহন বলিলেন, এই যে, এস মা সাবিত্রী —তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা ক'রছি।

কুন্তল দেখিল, তাহার বড়মা, শ্রীরাধামোহন এবং আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছেন। সে বসিল না। সোজা ভিতরে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল এখনি আসিতেছে।

কুন্তল ভিতরে গেলে ঝি সুভদ্রা তাড়াতাড়ি তাহার সামনে আসিয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে এখন কি দেবে দিদিমণি ?

কেনরে,—জিজ্ঞাসা করিল কুন্তল।

সুভদ্রার মুখে শুনিল, বাহিরের ভদ্রলোকটি কুন্তলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। কুন্তল কোন কথার উত্তর করিল না। অল্পক্ষণ পরেই শাড়ীটা বদলাইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

কুন্তলকে দেখিয়া অনুরূপা কহিলেন, মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে কষ্ট হয়নি ত' ?

—না, রেল লাইনের পাশেই ওদের বাসা। জান বড়মা, মেয়েটির নাম কিন্তু অদ্ভুত,—'রাজহংসী'।

শ্রীরাধামোহন বলিলেন, সাবিত্রী, এবারে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই। এ আমার বন্ধুর ছেলে—অশোক, আর সাবিত্রীর পরিচয়—তুমি ত' আগেই পেয়েছ বাবা, বলিয়া তিনি অশোকের দিকে চাহিলেন।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার জানাইল।

শ্রীরাধামোহন বলিতে লাগিলেন, অশোক সম্প্রতি বিদেশী খেতাব নিয়ে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। লাক্নৌ-এ ওরা থাকে। অশোক তোমার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন ক'রেছে। আমি অশোককে আমাদের মতামত পূর্বেই জানিয়েছি। আমার মনে হয় এ বিষয়ে এখন তোমাদের আলোচনা করা ভাল। বিয়ের দায়িত্বও তোমরা বোঝ ; আমাদের বলার কিছু নেই।

অশোক বলিল, আমি যখন ভিয়েনাতে, এক জার্মান ভদ্রলোকের বাড়ীতে "পেয়িং গেষ্ট" ছিলাম। আপনার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে যেন আমি তাঁরই সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক এমনই উদার এবং অমায়িক ছিলেন তিনি।

কথাপ্রসঙ্গে ভিয়েনা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কথা হইল, যেখানে যেখানে অশোক গিয়াছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অনুরূপা ও শ্রীরাধামোহন ভিতরে গেলেন।

অশোক বিলাত ফেরত ডাক্তার। দেখিতে বেশ। সুন্দর ঋজু চেহারা—সুট্‌পরা। চেহারার মধ্যে এমন একটা সৌম্যরূপ আছে যাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চাকর দুই কাপ চা দিয়া গেল। অনুরূপা জানিতেন কুন্তল সন্ধ্যায় 'চা' খায় নি।

অশোককে চায়ের কাপটি আগাইয়া দিয়া কুন্তল কহিল, আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন অশোকবাবু।

—নিশ্চয়ই নয়, বলুন। দেখুন আমিও এসব বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলাপ ক'রতে চাই। আপনি নিঃসংকোচে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন, কহিল অশোক।

আপনি আমাকে বিয়ে ক'রতে চান কেন ?—প্রশ্ন করিল কুন্তল।

অশোক খুব খুশী হইয়া উত্তর করিল, আপনার প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। আপনি যে স্কুলে কাজ করেন ওটা আমাদেরই স্কুল—মানে আমার বাবা ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের সেক্রেটারীর কাছে আপনার কথা আমি শুনেছি। 'স্কুলেব প্রাইজ ডিস্‌ট্রিবিউসানের' দিন আপনাকে প্রথম দেখি, আপনিও হয়ত' আমাকে দেখে থাকতে পারেন। তবে আপনি যা ব্যস্ত ছিলেন! মুগ্ধ হ'লাম আপনার কর্ম-প্রযোজনার তৎপরতা দেখে। তারপর আমি লাক্‌নৌ চ'লে যাই। আপনার কথা সময়ে সময়ে মনে হ'য়েছে। জানলাম আপনি রাধামোহনবাবুর কন্যাস্থানীয়া। ওঁর সঙ্গে আমাদের পূর্ব পরিচয় আছে। বাবা বেঁচে নেই তাই প্রস্তাব আমাকেই ক'রতে হ'য়েছে। আমি ওঁকে আগে চিঠিও দিয়েছিলাম।

কুন্তল এতক্ষণ ধরিয়া অশোকের কথা শুনিতেছিল। অশোকের দিকে মুখ তুলিতেই অশোক আবার বলিতে লাগিল, আমার প্রস্তাব

যেমন আকস্মিক, আপনার প্রশ্নও তেমন স্বাভাবিক। অবশ্য বলতে পারেন ভাল লাগলেই বিয়ের প্রস্তাব ক'রে বসতে হবে—এমন কি কথা। সেটা অবশ্য কথা নয়, ভেবে-চিন্তেই প্রস্তাব ক'রেছি। তবে আপনার 'অস্বীকার' আমাকে ক্ষুণ্ণ করবে না তাও আপনি জানবেন।

বিবাহের কথা কুন্তল চিন্তা করে নাই। অশোকের প্রস্তাবে সে কি উত্তর দিবে তাহা সে তৎক্ষণাৎ-ই ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। একটু পরে সে অশোককে বলিল, আপনার উত্তরে আমি অখুশী হইনি অশোকবাবু বরং মনে মনে আনন্দই পেলাম। একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় বলিল, এমন একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ত' হ'ল। তবে আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপার আকস্মিকই বটে। আমার প্রশ্নটাই হয়ত' স্বাভাবিক নয়। তবু কয়েক দিন সময় না দিলে আমি আপনার প্রস্তাবের সঠিক উত্তর দিতে পারব না অশোকবাবু।

বেশ তাই দেবেন,—উত্তর করিল অশোক। আচ্ছা আজ রাত হ'য়ে গেল, উঠি কেমন? কাকাবাবু আমার ঠিকানা জানেন—বিরক্ত নিশ্চয়ই ক'রেছি, ক্ষমা ক'রবেন। নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানাইল কুন্তল। বাহিরের দরজা পর্যন্ত অশোককে আগাইয়া দিয়া কুন্তল ঘরে ফিরিয়া আসিল। অশোকের এই প্রস্তাব তাহার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিল কি না বলা সহজ না হইলেও, এই অভিনব প্রস্তাবে সে যে চিন্তিত হইল তাহা তাহাকে দেখিলেই অনুমান করা যায়। সম্মুখের আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল কুন্তল। কপালের উপরে হাত দিয়া চোখ বুজিয়া সে যাহা চিন্তা করিতেছিল তাহা যে অশোকের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা নিঃসন্দেহ।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরাধামোহন ঘরে ঢুকিলেন। কুন্তলকে একা ঘরে দেখিয়া বুঝিলেন অশোক চলিয়া গিয়াছে। কুন্তল তখনও চোখ বুজিয়াই আছে। শ্রীরাধামোহন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সাবিত্রী,—ডাকিলেন শ্রীরাধামোহন।

থতমত খাইয়া কুন্তল উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীরাধামোহন বলিলেন, ব'স ব'স।

কুন্তল বসিল। নিজেও বসিলেন শ্রীরাধামোহন।

শ্রীরাধামোহন বলিতে লাগিলেন, অশোক আমার বন্ধুর ছেলে। আমাকে কাকাবাবু বলে। যে স্কুলে তুমি কাজ কর, ওটা ওর বাবার জন্যই হ'য়েছিল। তোমাদেরই স্কুলের ব্যাপারে মাঝে মাঝে ওকে আসতে হয় কাশীতে। তোমার কর্ম-নৈপুণ্য ওর ভাল লেগেছে। ওর বাবা ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব,—ব্যারিষ্টার ছিলেন তিনি। ও নিজেও বিলেত ফেরত, সাহেব না হ'লেও সাহেবীপনা ওদের মজ্জাগত। নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজে ক'রতে লজ্জার কিছু আছে তা ওরা মনে করে না।

উনি সে কথা বলেছেন, কহিল কুন্তল।

শ্রীরাধামোহন আবার বলিলেন, তবে এ কথাও ঠিক, বিয়ের ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই। লজ্জা দিয়ে ব্যাপারটাকে উপভোগ ক'রে তুলতে আমরা একেবারেই নির্লজ্জ। জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এই বিয়ে। বিয়ের প্রয়োজন সংসারে অস্বীকার করা শ্রেয় নয়, তবে তাকে যেমন তেমন করে গ্রহণ করার মধ্যেও কোন যুক্তি নেই। অশোকের সঙ্গে কথা ব'লে, তাকে বুঝে, তুমিই তোমার কর্তব্য স্থির ক'রবে এই আমি চেয়েছি।—অশোক কি ব'লে গেল ?

কুন্তল উত্তর করিল, বিয়েব প্রস্তাবই ক'রে গেলেন। এত ভদ্র আচরণ খুব কম চোখে পড়ে। আমি এই প্রস্তাবের কোন উত্তর হঠাৎ দিতে চাইনি। সে একটু থামিয়া বলিল, তবে বিয়ে এখন থাক মেসোমশাই। এই নিয়ে অগ্রসর হ'তেও আমার মন চাইছে না।

—বেশ অশোককে তাই জানিয়ে দেব। কিন্তু অশোককে কেমন লাগল তোমার ?

—খুব ভাল। বেশ সোজা কথা বলেন। যতটুকু কথা বলার প্রয়োজন তার এতটুকু যেন বাড়াবাড়ি নেই। উত্তর পেয়েও মোটেই দেরী ক'রলেন না। কথাবার্তায় কোথাও যেন বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্যের অভাব নেই।

এমন সময়ে অনুরূপা ঘরে প্রবেশ করিলেন। অশোক চ'লে গেছে,—অনুরূপা শ্রীরাধামোহনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

—হ্যাঁ চলে গেছে।

—কিছু বলে গেল ?

—না, সাবিত্রী ব'লছে, বিয়ের প্রস্তাবে ওর মন এখন সায় দেয় না।

—তা' হ'লে ?

—অশোককে সে কথা আমি জানিয়ে দেব।

অনুরূপা এবারে হাসিয়া বলিলেন, বিয়ের ঘটক হ'লে তুমি, বিয়ে যদি না জমাতে পার ঘটক বিদায় পাবে না যে।

শ্রীরাধামোহন হাসিয়াই উত্তর করিলেন, ঘটকালি জীবনে একটাই ক'রেছি—তাতে যে মহার্ঘ বিদায় পেয়েছি, ভাণ্ডার আমার তাতেই ভরে আছে।

অনুরূপা বুঝিলেন শ্রীরাধামোহনের রহস্যের তাৎপর্য। মুহূর্তে তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু পরে তিনি কহিলেন, চল, রান্না হ'য়ে গেছে। অশোককে আগে বলা হয়নি। ভেবেছিলাম অশোকও এখানে খাবে। সে কিছু না বলেই চলে গেল,—ভাল লাগছে না। ওর মুখে বিদেশের গল্প শুনতে বেশ লাগে আমার।

কুন্তল বুঝিল অশোক এ বাসায় বিশেষ পরিচিত। হয়ত' পরে আবার আসিতেও পারেন।

তিনজনেই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

* * * *

আহারের পর কুন্তল নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিল, এই বিবাহের ব্যাপারই ত' একদিন তাহাকে ঘর-ছাড়া করিয়াছে। কত-জনের সামনে নিজেকে দাঁড় করাইতে হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, "মেয়ের বয়স একটু বেশী, যাক্‌গে—কত খরচ ক'রবেন ঠিক ক'রেছেন" ; কেহ বলিয়াছেন, "ও গান্‌টান্ দিয়ে কি হবে মশাই, মেয়েদের রান্নাবান্নাই হ'ল আসল কাজ,"—ইত্যাদি। তাহার উপর ছিল

দেনা পাওনার টাগ-অফ-ওয়ার। মেয়ে দেখান'র সুরু হইতে ঐ যে অর্থব্যয়ের পালা আরম্ভ হইল—তাহার বুঝি সমাপ্তি নাই।

কিন্তু অশোকবাবুর প্রস্তাব? বিবাহ হউক আর নাই হউক,—মেয়েদের মনকে যে এতখানি মর্যাদা দিতে পারা যায়—অশোকবাবুর প্রস্তাবে কুন্তল এই প্রথম দেখিল। অশোককে কুন্তলের ভালই লাগিয়াছে। সংস্কার-বিহীন জীবনের বলিষ্ঠতা, অশোকের চারিত্রিক সৌন্দর্য, ইহা সকলকেই মুগ্ধ করে,—কুন্তল তাহা অশোকের কথার মধ্য দিয়াই লক্ষ্য করিয়াছে। এমন সংযত কথা ইতিপূর্বে শ্রীরাধামোহন ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মুখে কুন্তল শুনিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তবু কেন যেন বিবাহের প্রস্তাবে কুন্তলের মন সায় দিল না। মনে হইল এ যেন সেই অশোক-স্তম্ভ,—ইহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ান যায়—কিন্তু দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না!

বিবাহের কথা মনে হইতেই কুন্তলের বাড়ীর সব কথাই মনে পড়িল। মা, বাবা, ভাইবোনেরা সকলেই ত' আছে,—কিন্তু কেহই যেন আজ তাহার কাছে সত্য হইয়া নাই। মনে পড়িল, পিতার কন্যাদায়-গ্রস্ত বেদনা-কাতর মুখখানি, মনে পড়িল মায়ের অশ্রুপূর্ণ করুণ নয়ন দুইটি, মনে পড়িল ভাইবোনদের অফুরন্ত ভালবাসা। একে একে সব কিছুই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। কেমন করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কেমন করিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল, তাহাও মনে পড়িল। ট্রেনের কথা মনে হইতেই—'তুম্ ডাকু হ্যায়',—এই কথা যেন তাহার কানে বাজিয়া উঠিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্বু-গ্রীবা স্থূলাঙ্গী সেনাপতির কথা মনে করিয়া কুন্তল একা একাই হাসিয়া ফেলিল। জলের পাত্রটি নামাইয়া দিয়াছিল কুন্তল,—পাত্রটি লইয়া নমস্কার করিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল,—আজও মনে আছে সব।

অশোকবাবুর আগমন ও তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব—সব মিলিয়া আজ কুন্তলকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কুন্তল আবার ভাবিল,—দূর

ছাই—কেনই বা এই সব চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিবে। সে সামনের টেবিল হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা টানিয়া লইল। দুই একটা পাতা উলটাইতেই একটি কবিতা চোখে পড়িল—

"—আঁকাবাঁকা ঐ চলিয়াছে পথ,
তোমাতে আমাতে দেখা।
জীবনের পাতা ভরিয়া উঠেছে
ভাষাহীন শত লেখা॥"

কবিতাটির দুই লাইন পড়িতেই উপরে চাহিয়া দেখিল—কবিতাটির নাম "জানাজানি",—লিখেছেন—শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী। "সোমনাথ"—নামটি কোথায় যেন শুনিয়াছে,—মনে পড়িল রাজহংসীর কথা,—মনে মনে লজ্জিতও হইল,—ভাবিল আর একদিন না হয় রাজহংসীদের বাসায় যাইব।

*　　*　　*　　*

অশোকের সঙ্গে কুন্তলের বিবাহ-প্রস্তাবে অনুরূপা কেন যেন সায় দিতে পারেন নাই। কুন্তলের বিবাহ না করিবার ইচ্ছা প্রকাশে তাই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু কথা তাহা নহে। কুন্তল তাঁহার মন মাতৃরস সঞ্চারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে,—সেই রসস্রোতে কেহ বাধার সৃষ্টি করে,—ঠিক এই মুহূর্তেই অনুরূপা তাহা মনে মনে বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। বিবাহ হইলে কুন্তল চলিয়া যাইবে, এই অনাগত অস্বস্তি তাঁহাকে পাইয়া বসিল। এই ত' মাত্র কয়েক মাস হইয়াছে কুন্তল তাঁহার কাছে আসিয়াছে। এখনি তাহাকে বিদায় দিতে হইবে,—এই কথা অনুরূপা চিন্তা করিতেও পারেন না।

হায়রে মানুষের মন! কুন্তল তাঁহার কে? তবু এমন করিয়া অনুরূপার মন কাঁদিয়া উঠিল কেন?—অনাগত বিচ্ছেদের কল্পনায়? কুন্তল পরের মেয়ে—তাহা ত' অনুরূপা জানিতেন। সে যদি এখনই চলিয়া যায়, তবু তাহাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তথাপি কেন এমন করিয়া কুন্তলকে তিনি ভালবাসিলেন! কোনদিন জিজ্ঞাসাও

করেন নাই, কুন্তল কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে। যতটুকু বলিবার কুন্তলই বলিয়াছে। কিসের অভাব কুন্তল এমন করিয়া তাঁহার পূর্ণ করিয়া দিল? অনুরূপা নিজে খুব বিচক্ষণা। অ-বাঙ্গালী শ্রীরাধামোহন মিশ্রকে তিনি স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তবু কুন্তলকে হয়ত' ত্যাগ করিতে হইতে পারে, এইটুকু বেদনা সহ্য করিতে তাঁহার মন রাজী হইল না কেন? এমনই মানুষের ভালবাসা—কোন মুহূর্তে, কেমন করিয়া কে আসিয়া মনে স্থান করিয়া লয়,—কিছুই কি তাহা জানা যায়? কে এই রহস্যের যাদুদণ্ড হাতে লইয়া বসিয়া আছে, তাহা কে বলিবে?

অনুরূপার চোখে ঘুম আসিল না। বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন তিনি। কত কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া কুন্তলের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কুন্তলের চোখেও ঘুম নাই। অনুরূপা ঘরে ঢুকিতেই কুন্তল বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং বলিল, তুমি এখনও ঘুমোওনি বড়মা।

ঘুম আস্‌ছে না,—কেন রে এমন হ'ল,—বলিতে বলিতে তিনি কুন্তলের পাশে আসিয়া বসিলেন। কুন্তলকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ে কি সত্যিই তুই করতে চাস্ না মা?

কুন্তল কহিল,—বিয়ে এখন থাক বড়মা। আচ্ছা, মেসোমশাই কিছু মনে করেন নি ত?

—না, তোর মেসোমশাইকে আমি ত' জানি। আস্তাকুঁড়ের লোক ছিলাম আমি,—আমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রতে তাঁর বাধে নি। তোকে কোন কিছুই আমার বলা হয়নি। ব'লতে ইচ্ছে করে না,—পাছে ঘৃণায় তুই মুখ ফিরিয়ে নিস্, পাছে তুই চলে যাস্,—রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিলেন অনুরূপা।

বড়মা,—বলিয়া অনুরূপার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল কুন্তল।

অনুরূপা বলিলেন, আজ আমার চমক ভাঙ্গলো মা। তুইত' এখানে থাকতে আসিস্ নি। আজ হোক, কাল হোক, ধরে ত'

রাখতে পারব না তোকে। এমন হয়ত' কত অশোক আস্‌বে—তোকে কেড়ে নিয়ে যেতে আমার কাছ থেকে। তোকে ত' যেতে দিতেই হবে মা,—বলিতে বলিতে অনুরূপার গণ্ড বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

কুন্তল আঁচল দিয়া অনুরূপার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না বড়মা।

কুন্তলের মাথার উপরে নিজের হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে অনুরূপা কহিলেন, তোর কাছে আমার জীবনের কোন কিছুই আমি গোপন রাখব না—তোকে সব শুন্‌তে হবে,—শুনে যদি 'মা' বলে ডাকতে চাস্‌, ডাকিস—না-হ'লে—

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না বড়মা। তুমিই আমার মা—আমার—মা, এই বলিয়া কুন্তল অনুরূপার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনুরূপা কুন্তলকে স্নেহ-চুম্বন করিলেন, বলিলেন, তবু তোকে শুন্‌তে হবে—না বলে কেন যেন আমি শান্তি পাচ্ছি না।—এই বলিয়া দৃঢ় শান্তকণ্ঠে কুন্তলের নিকট তাঁহার করুণ-কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

সে অনেক দিনের কথা। যশোর জেলায়, মাগুরা মহকুমার কাছে এক গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ী। বাবার অবস্থা ছিল খুব ভাল। ডাকসাইটে নাম। এক কথায় চিনত সমস্ত জেলার লোকে। আমরা ছিলাম তিন বোন। ছোট্ট নদীর ধারে বাড়ী। নদীর নাম 'নবগঙ্গা'। কত লোক আসত' বাড়ীতে। ওপার থেকে যতুকাকা আসতেন বাবার বন্ধু, তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আসত' তাঁর একমাত্র ছেলে মহিম। মহিম আমার সমবয়সী। কিছু বড় হবে বা। দশ এগার বছর হবে হয়ত' আমার বয়স। দাবা খেলতেন বাবা আর যতুকাকা। মহিমকে নিয়ে আমরা ক'রতাম খেলা। আমাদের বাড়ীর সামনে ফলের বাগান,—কত রকমের ফল। গোলাপ-জাম গাছে উঠে জাম পাড়ত' মহিম, আমি জাম কুড়িয়ে আঁচল ফেল্‌তাম ভরে। নেমে আসত' মহিম দু'টো বড় বড় গোলাপ-জামের ফুল হাতে,—বলত' কানে পরলে বেশ মানাবে। হাত পেতে নিতাম সেই ফুল।

মহিমকে 'মহিম' বলেই ডাকতাম। কতদিন মহিমদের বাড়ীতে গিয়ে কত সময়ই না কাটিয়েছি। স্নান ক'রবার সময় কতদিন নদী সাঁতরে পার হ'য়ে আস্‌ত মহিম আমাদের বাড়ীতে। এমন কত কি। মহিমকে ভাল লাগত'—তারপর এমন অবস্থা হ'ল মহিমকে একবার না দেখতে পেলে মনটা যেন ছট্‌ফট্‌ ক'রত। মনে হ'ত কখন আসবে মহিম, কখন দু'টো কথা ব'লব। বাড়ীতে কোন ভাল জিনিব রান্না হ'লেই মহিমকে না দিয়ে খেতে ইচ্ছে ক'রত না।· ছোট বোন মাধুরী এসে খবর দিত, দিদি, মহিমদা' ওপারে দাঁড়িয়ে আছে,—দেখবি? ছুটে যেতাম নদীর ধারে,—দেখে আসতাম মহিমকে।

এমন ক'রে কখন বিয়ের বয়স হ'য়ে গেছে কে জানে। বড়দির আর আমার এক সঙ্গে বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। তখন সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছি। বিয়ের দিন কেন যেন কান্না আস্‌তে লাগল—কাঁদলামও। কত খুঁজলাম মহিমকে যদি একবার দেখতে পাই। মাধুরীকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মহিম আসেনি রে?

মাধুরী বল্লে, না।

বিয়ে হ'য়ে গেল। সবাই ব'ল্লে বেশ বর, বয়স একটু বেশী—তা পুরুষের আবার বয়স কি? শ্বশুরবাড়ী গেলাম, স্বামীর ঘর—তাও ক'রলাম, কিন্তু কান্না আমার থামল না। বছর তিনেক বাদে বিধবা হ'য়ে একদিন বাপের বাড়ী ফিরে এলাম!

বাপের বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম কিছুইত' আমি হারাইনি। এক অপরিচিত প্রৌঢ়ের দেওয়া যে সিঁদুরটুকু মাথায় প'রে নববধূ সেজেছিলাম, সেই সিঁদুরটুকু মাত্র মুছে ফেলে চলে এসেছি। বর্ষার নদী তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে;—সতের বছরের আমি।

থান কাপড় অবশ্য প'রতাম না। হাতে ছিল দু'গাছা সোনার চুড়ি। মনে ভাবতাম কি আমার ছিল, আর কি আমার নেই। ভাবলাম যাঁকে স্বামী ব'লে মাথায় রাখতে চেয়েছিলাম, তাঁকে যেদিন হারিয়েছি বিধবা ত' সেই দিনই হ'য়েছি। এই লোক দেখান বিধবার সাজ আজ ত' আমার নতুন নয়। মনে মনে আবার ভাবি,—তাইবা কেন,

কিসে আমি বিধবা—কোন দুঃখে যাব বিধবা হ'তে! মহিম র'য়েছে বেঁচে,—সবই ত' আমার আছে। মহিম কলেজে পড়ে—কত তার সুখ্যাতি করে সকলে। মহিম থাকে ক'লকাতা,—মনে হ'ত কবে দেখব তাকে। মনটা এমন করে পড়ে থাকত মহিমের জন্য। কিন্তু বামুনের ঘরের বিধবা, অনেক বিধি নিষেধও মেনে চলতে হ'ত।

শ্বশুরবাড়ী জন্মের মত নমস্কার করে সেদিন ছেড়ে চলে এলাম। কয়েকদিন পরেই মাধুরীকে দিয়ে মহিমের খোঁজ নিয়েছিলাম। মহিম পূজোর ছুটিতে ক'লকাতা থেকে বাড়ী আসবে শুনলাম। এখনও এক মাস বাকী। দেখতে দেখতে কেটে গেল একমাস। পাড়ার মেয়েরা দুঃখ ক'রে বলে,—এমন সোনার কমল দেবতার পূজোয় লাগল না। এমন কত কথাই না তারা অবাধে বলে যেত।

তারপর একদিন শুনলাম মহিম বাড়ী এসেছে। এল আমাদের বাড়ীতে। মহিম আসছে দেখে, মনটা যেন কিসের আনন্দে ভরে উঠল। বাসন মাজতে যাচ্ছিলাম, হাত থেকে ঝন্ ঝন্ ক'রে বাসন-গুলো গেল পড়ে। মহিম সামনে এসে দাঁড়াল, কি সুন্দর চেহারা,—কি ক'রব, কি ব'লব, কিছুই বুঝতে পারলাম না। দৌড়ে ঘরে চলে এলাম—সারা অঙ্গে বুঝি বিদ্যুৎ-হিল্লোল খেলে গেল। সবাই ভাবল—আমি বিধবা হ'য়েছি সেই বেদনায় আমি এমন ক'রলাম, কিন্তু সে ত' সত্য নয়। জীবনে এত আনন্দ বুঝি আর কোনদিন হয়নি আমার!

দু' বছর পরে মাধুরীর সঙ্গে মহিমের বিয়ে হয়। কেটে গেল আর এক বছর। মনের কথা কাউকে বলিনি—কেউ শুনতেও চায়নি। তারপর এল এক দুর্যোগ। মাধুরী এল আমাদের বাড়ীতে, সন্তানের জননী হবে সে। পুত্র সন্তান হ'ল মাধুরীর, কিন্তু মাধুরীকে বাঁচান গেল না। ছোটছেলের ভার পড়ল তাই আমার ওপরে। ছেলেকে যত্ন-আত্তি ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে, মাধুরী বুঝি 'মা' হ'য়েই বাসা বাঁধল আমার মনে। ইতিমধ্যে যদুকাকা মারা গেলেন। মহিম হ'ল তাঁর জমিদারীর মালিক। মাধুরীর ছেলে আমাকে 'মা' বলে, মহিমকে বলে 'বাবা'। কেন যেন ভাল লাগত আমার। ছেলের

নাম রাখা হ'য়েছে শঙ্কর। শঙ্কর বেশ বড় হ'য়েছে—হাতে খড়ি দিলেন আমার বাবা। মহিম একদিন এসে ব'ল্লে বাবাকে,—শঙ্করকে এখন নিয়ে যেতে চাই আমার কাছে। বাবা 'না' ক'রলেন না—যাঁর ছেলে তাঁর কাছে থাকাই ভাল। কিন্তু শঙ্কর কিছুতেই যেতে চায় না। তারপর ঠিক হ'ল, শঙ্কর যখন আমাকে ছেড়ে যেতেই চায়না—তখন অমিই বরং কিছুদিন মহিমের বাড়ী গিয়ে থাকব। শঙ্কর তার বাবার বাধ্য হ'লে পরে আমি চলে আসব।

শঙ্করকে নিয়ে এলাম মহিমের সংসারে। সংসারে লোক খুব বেশী নয়। মহিমের এক পিসি আর মহিম। পিসির ছিল খুব দাপট্। শঙ্করকে সামনে রেখে দেখতে লাগলাম মহিমের সংসার। দিন কাটতে লাগল। এ যেন এক মধুর পরিবেশ। কত কিছু যেন সেই পরিবেশের আবেশে গেলাম ভুলে। ভুলে গেলাম আমি বিধবা, ভুলে গেলাম মাধুরীকে, ভুলে গেলাম আমি এ বাড়ীর কেউ নয়। জীবনের বড় পাওয়া আমার সার্থক হ'য়েছে। আনন্দ আমার ধরে না।

কিন্তু মানুষের চোখ এড়ায় না। তারা যতটুকু দেখে তার দশগুণ করে আলোচনা। আলোচনা তীব্রতর হ'তে লাগল।—এ ত' ভাল কথা নয় পিসি, মহিমের বিয়ে দাও। বামুনের ঘরের বিধবা, মুখ দেখাবে কি করে যদি অনাছিষ্টি কিছু হয়। আর তোকেও বলি,—শঙ্করের মা,—হুঁ, দেহের ভারে যেন মাটিতে পা পড়ে না—ভাবে যেন ডগমগ,—ঘেন্নাপিত্তিও কি নেই গা,—এমন কত উক্তিই না কানে আসে। আমি ভাবি, কেন আমি শঙ্করের মা হ'য়ে থাকতে পারব না? লোকের আমি কি ক'রেছি? আমার অন্তরের সত্য, না লোকের উক্তি—কোনটা আজ বড় হ'য়ে উঠবে?

সেদিন খেয়ে এসে রাত্রে এই কথাই ভাবছিলাম। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে ঘরে। শাদা শাদা মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছিল আকাশের চাঁদ—তাই তার আলো আঁধারের খেলা। মহিমকে ডেকে

পাঠিয়েছিলাম সব কথা ব'লব বলে। মহিম এল। সবই ব'ল্লাম খুলে। মহিম সবই শুনল,—শুনল আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি ব'লতে ব'লতে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চোখে আমার জল, দৃষ্টি আমার আকাশের ঐ কলঙ্কী চাঁদের ওপর। মহিম আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন বুঝতে পারিনি। মহিম রুদ্ধ-কণ্ঠে ব'ল্লে, রমা, আজ শঙ্কর তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। তুমি ত' জান, লোকে যা বলে তা সত্য নয়, শুধু সত্য—তুমি ভালবাস আমাকে, শঙ্করকে,—আমাদের ফেলে তুমি চলে যাবে রমা ?

বাধা দিয়ে কি যেন ব'লতে চেয়েছিলাম—ব'লতে পারলাম না। মহিমের পিসিমা ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন আমরা দু'জনে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে।

রুক্ষ কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন,—দেখছি—ছেলেটার মাথা না খেয়ে আর তুমি ছাড়বে না ? এপার ওপার যে ঢি ঢি পড়ে গেল।

মহিম পিসিমার সামনে গিয়ে ব'ল্লে, কি ঢি ঢি পড়ে গেল পিসি ?

পিসিমা রেগে ব'ল্লেন,—তুই চুপ্ কর্ মহিম,—আমার দাদার সংসারে—এই কেলেঙ্কারী আমি হ'তে দেব না। ঐ ভাল মানুষের মেয়ের কাল থেকে আর এ বাড়ীতে জায়গা হবে না।

মহিম শান্তভাবেই ব'ল্লে, বেশ হবে না—এখন এস ত' তুমি আমার সঙ্গে—শঙ্কর ঘুমোচ্ছে।

রাগে দুঃখে মহিম পিসিমাকে নিয়ে ঘর হ'তে বের হ'য়ে গেল। পিসিমার হাতে ছিল সিন্দুকের চাবি—বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন তিনি। পিসিমাকে অমান্য করা খুব সহজ ছিল না।

আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। একটু পরেই নিজের কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেললাম। দেখলাম শঙ্কর ঘুমোচ্ছে। বুঝতে আর বাকী রইল না, আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যকে স্বীকার করার অক্ষমতার অপবাদ মাথায় নিয়ে আমাকে এ বাড়ী ছাড়তেই হবে। আর কোন দ্বিধা রইল না মনে—রইল না কোন সংকোচ। নিজের ভাগ্যকে নিয়ে কাউকে বিড়ম্বিত ক'রব না,—না বাবাকে, না মহিমকে।

নিঝুম রাত্রি—শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে ডুবে। কোথায় কেউ আর বোধ হয় জেগে নেই। মাথার চুলগুলি গোড়া থেকে কেটে ফেল্লাম। মহিমের কাপড় জামা এই ঘরেই থাকত,—পরে নিলাম। শঙ্করকে শেষ চুম্বন ক'রে—বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ রইল সামনে—পথ ফেলে এলাম পিছনে। পথের কথা থাক।

তারপর এসে পড়লাম কাশীতে। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখি, আর পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে পুণ্যস্নান করি। কিন্তু ভুলতে পারিনে শঙ্করকে। মন্দিরের আরতি বাদ্য, গঙ্গাঘাটের বেদমন্ত্র—সব ছাপিয়ে কানে যেন আসে শঙ্করের 'মা' ডাক্। পথে হ'ল এক দুর্ঘটনা। সেই দুর্ঘটনায় পরিচয় হ'ল মিঃ মিশ্রের সঙ্গে। মিঃ মিশ্র আশ্রয় দিলেন। নবীন অধ্যাপকের গৃহের ভার নিতে হ'ল গৃহিনীর মর্যাদায়।—সে আজ অনেক দিনের কথা।

মিঃ মিশ্রকে বিয়ে করায় যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, সে আমার 'মা' হবার ইচ্ছার অপরাধ। কতজনে হয় ত' কত কথা ব'লবে। কিন্তু এ প্রশ্ন আমার রইবে বিধাতার কাছে,—মেয়েদের 'মা' হ'বার ইচ্ছা কেন হবে অপরাধ? আর যে অনুশাসন এ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে তার কি কোন অপরাধই নেই?

কিন্তু 'মা' বলতে ত' কেউ এল না। এতদিন পরে তুই বুঝি তাদের রূপ ধরে এসেছিস্। এর পরেও তুই কি আমাকে 'বড়মা' বলে ডাকতে পারবি সাবিত্রী?

'বড়মা',—বলিয়া কুন্তল অনুরূপার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এত দুঃখ সহ্য ক'রেছ মা। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, না—কোথাও না। আজ বুঝতে পারছি, কি বেদনা সহ্য ক'রে আছ তুমি শঙ্করকে ছেড়ে।

সাবিত্রীকে বুকের মধ্যে ধরিয়া অনুরূপা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িল।

৬

অশোক আর আসে নাই। আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই। সাবিত্রীর মতামত সে জানিয়াছে। অশোক ইহাতে কোন দুঃখ করিল না। এমন অনেক সময় আসে যখন কোন কারণে একজনকে ভাল লাগিয়া যায়। মন তাহার সান্নিধ্য কামনা করে। সুযোগ সুবিধা থাকিলে সান্নিধ্য ঘটেও, তবে অশোকের ভাগ্যে সে সান্নিধ্য জুটিল না।

অশোকের প্রকৃতি ভিন্ন। যাহা সত্য বলিয়া মনে করে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা তাহার নাই। আবার সব ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে অযথা মনকে ভারাক্রান্ত করিয়াও তোলে না। তাই সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে একদিন লাক্‌নৌ-এর গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

সাবিত্রী যে স্কুলে কাজ করিত সে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অশোকের বাবা। পিতার মৃত্যুর পর স্কুলের দায়িত্ব অশোক নিজের উপরে রাখে নাই। স্থানীয় একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করিয়া স্কুলের সমস্ত কিছু ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত করিয়াছে। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ অশোককে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। সেই কারণে সম্প্রতি সে কাশী আসিয়াছিল। উৎসব উপলক্ষেই সে সাবিত্রীকে দেখিতে পায়, পরে বিবাহের প্রস্তাবও উত্থাপন করে। কাশীতে থাকাকালীন স্কুলের সেক্রেটারী শিক্ষয়িত্রীদের মাহিনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অশোকের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করেন। অশোক স্কুলের আর্থিক উন্নতিকল্পে মোটা টাকার একটি 'ডোনেশান' দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। একথা সাবিত্রী সেদিন স্কুলে যাইয়াই শুনিতে পাইল। মাগ্‌গীভাতা সমেত তাহাদের যে মাহিনা বাড়িবে একথাও অজানা রহিল না। সে আরও শুনিল, অশোক প্রতিমাসে দশটি করিরা দুস্থ ছাত্রীর বেতন বহন করিবে।

সেক্রেটারী অশোকের কত প্রশংসা করিলেন। 'লাইক ফাদার লাইক সন',—বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধাও প্রকাশ করিলেন।

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী শ্রীরাধামোহন ও অনুরূপা-দেবীকে একথা জানাইল। তাঁহারা খুবই খুশী হইলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীরাধামোহন কহিলেন, জান মা সাবিত্রী, ওরা অমনিই। ওদের পরিবারের বিশেষ ধর্ম নিঃস্বার্থ হ'য়ে পরের উপকার করা। ওর বাবা ছিলেন আমার বন্ধু। আমার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা অশোকের বাবার জন্যই হ'য়েছিল। প্রত্যাশাহীন অকৃপণ ওদের দানের হস্ত। অশোকও পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথে চলার ব্রতই গ্রহণ ক'রেছে।

সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধচিত্তে শ্রীরাধামোহনের কথা পরম আগ্রহে শুনিতে লাগিল।

কিছুদিন কাটিল। সাবিত্রীর স্কুল, অধ্যাপক শ্রীরাধামোহনের বিশ্ববিদ্যালয়, আর অনুরূপাদেবীর সংসার,—চলিয়াছে সাবলীল জীবন-প্রবাহে, কোথাও এতটুকু ছেদ নাই।

শ্রীরাধামোহন এই সময়টাতে কিছুদিন অবসর পাইতেন। প্রতি বৎসরই এই ছুটিতে অন্যত্র ঘুরিয়া আসিতেন। সাবিত্রীরও কয়েকদিন ছুটি ছিল, এই সঙ্গে আরও কয়েকদিন ছুটি বাড়াইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

বহুদিন ধরিয়াই আগ্রায় যাইবার ইচ্ছা ছিল অনুরূপার। প্রথম প্রথম দু'এক বছর অন্তরই আগ্রায় যাইতেন, সঙ্গে যাইতেন শ্রীরাধা-মোহন। তাজমহল দেখিবার নেশা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। জীবনের তীর্থক্ষেত্র ছিল তাঁহার কাছে মমতাজের সমাধি। কয়েক বছর আর যাওয়া হইয়া ওঠে নাই। তাই সাবিত্রীকে লইয়া এবারে তাঁহারা আগ্রায় যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন।

অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁহারা আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিলেন। আগ্রার কোন এক হোটেলে বাসস্থান ঠিক করা হইল।

এখানে আসিয়া প্রতিবারের মতই তাজমহল, মুঘলকেল্লা, যমুনা-

ব্রীজ, প্রভৃতি এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হইয়াছে। আগ্রাকে কেন্দ্র করিয়া এমন কি মথুরা, বৃন্দাবন, সেকান্দ্রা, ফতেপুরশিক্রী দেখাও বাদ পড়ে নাই। সাবিত্রী সঙ্গে থাকায় অনুরূপার আগ্রা সফর এবারে অন্যান্যবার হইতে ব্যাপক হইয়াছে। আগ্রাতে শীত তখনও পড়ে নাই, তবে গরমও যে আছে একথাও বলা চলে না। কাশীতে ফিরিবার সময় আগতপ্রায়।

সেদিন শ্রীরাধামোহন ও অনুরূপা এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বন্ধু দিল্লীতে শিক্ষা-বিভাগের একজন পদস্থ ব্যক্তি, আগ্রাতে কয়েকদিন বেড়াইতে আসিয়াছেন।

অপরাহ্ন। সাবিত্রী একা হোটেলে। ভাল লাগিল না তাহার। ঘর বন্ধ করিয়া হোটেলের চাকরকে বলিয়া সে আর একবার একাই 'তাজমহল' দেখিতে একখানা টাঙ্গায় উঠিয়া বসিল।

সাবিত্রী যখন তাজমহলে পৌঁছিল তখন সূর্য ডুবিয়া যায় নাই। শীতের প্রারম্ভ,—বেলাও খুব ছিল না। 'তাজমহলের' চত্বরে উঠিয়া আবার সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'তাজমহল' দেখিতে লাগিল। বড় গম্বুজের নীচে সুন্দর কারুকার্য করা মমতাজ ও সম্রাট সাজাহানের কবরের অনুকৃতি। সত্যিকারের কবর নীচে, পূর্বদিকে নীচে যাইবার পথ। গেল সাবিত্রী সেই কবর-গহ্বরে। ধূপগন্ধে আমোদিত,—অপূর্বতায় ভরিয়া উঠিয়াছে সম্রাট সম্রাজ্ঞীর শেষ আশ্রয়। উপরে উঠিয়া আসিল সাবিত্রী। যমুনার দিকে যাইয়া দাঁড়াইল। চোখে পড়িল যমুনার ওপারের দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি। সাজাহান যমুনার ওপারে তাঁহার নিজের মর্মর সমাধি-সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাবিত্রী ভাবিতে লাগিল,—বেশ ত' হইত তাহা হইলে। এপারে মমতাজ, ওপারে সাজাহান, মাঝখানে অনন্ত-বিরহ-যমুনা নিঃশব্দ স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। হয় ত' ওপারের সেই সমাধি-সৌধের পশ্চিমদিকের দক্ষিণ-মিনারে উঠিয়া আসিতেন সম্রাট, কেল্লার মতি মস্‌জেদ্‌ হইতে ভাসিয়া আসিত ভোরের 'আজান',—তাহার প্রশান্ত আহ্বানে, তাজমহলের পশ্চিমের উত্তর-মিনারে শ্বেতশুভ্র বাসে বুঝি উঠিয়া আসিতেন

মমতাজ। দু'জনে দাঁড়াইতেন মুখোমুখি। পূবের আকাশে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিত শুকতারা। নক্ষত্র আলোকে নামিয়া আসিতেন তাঁহারা,—দাঁড়াইতেন নদীর এপারে আর ওপারে, যমুনার নীলজল যেখানে ছুঁইয়া আছে শ্যামল তটরেখা। সম্রাট তাঁহার প্রেমের বাণী চুম্বন-স্পর্শে বুঝি পাঠাইয়া দিতেন ওপার হইতে এপারে। যমুনার অন্তহীন তরঙ্গমালায় ভাসিয়া আসিতে চাইত সেই চির-বিরহীর বাণী। মমতাজ হাত বাড়াইতেন আকুল আগ্রহে,—কিন্তু হায়—বিরহ-যমুনার সেই অসীম আকাশে 'বাণীর বলাকা' উড়িয়া চলিয়া যাইত। অনন্ত শূন্য বুঝি ধ্বনিয়া উঠিত তাহাদের পাখার স্পন্দনে, হেথা নয়,—'হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'।

নিস্তব্ধ সায়াহ্নে নিস্তরঙ্গ যমুনা পুলিনে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী যেন মমতাজের এই শাশ্বত ক্রন্দন শুনিতে পাইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে তবু এ ক্রন্দন-স্রোতের যেন বিরাম নাই।

সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একমনে এই কল্পলোকে বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে 'কুন্তলদি' বলিয়া একটি ছোট্ট মেয়ে পিছন হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কে রে?

আমাকে চিনতে পারলে না কুন্তলদি, আমি রাজু, রাজহংসী, আমি দাদার সঙ্গে এসেছি। ঐ যে দাদা ওখানে বসে আছে,—এই বলিয়া মুহূর্তে সাবিত্রীকে ছাড়িয়া তাহার দাদার কাছে দৌড়াইয়া গেল এবং দাদার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সাবিত্রীর কাছে লইয়া আসিল।

সাবিত্রী চিনিল রাজুকে, রাজুর দাদাকেও চেনা চেনা মনে হইল। তাহাকে নমস্কারও করিল। মনে পড়িল রাজুকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার দিনটার কথা। লজ্জিত হইল সে। সেদিনের নিজের আচরণের সংকোচ সাবিত্রীকে যেন পাইয়া বসিল। তাই রাজুর সঙ্গে সংক্ষেপে দু' একটি কথা কহিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিবার পথে রওনা হইল। রাজুর মনে হইল, কুন্তলদি হয়ত' তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল সাবিত্রী যেদিকে চলিয়া গেল সেই দিকে।

সোমনাথ সাবিত্রীর এই অদ্ভুত আচরণে ক্ষুণ্ণ হইল এবং রাজুকে এক ধমক দিয়া বলিল, কোথাকার কে, তাকে তুই কুন্তলদি' বলে জড়িয়ে ধরলি ? চিনল তোকে ? আর কে তোর ওই কুন্তলদি' ?

রাজু দাদার কথায় অপ্রতিভ হইল সন্দেহ নাই, বলিল, কিন্তু অবিকল কুন্তলদি'র মত দেখতে।

খুব হয়েছে, এখন চল্ ত' বাসায়। রাত হ'য়ে আসছে। মেয়েটা কি অভদ্র,—এই বলিয়া সে রাজুকে লইয়া বাসার দিকে রওনা দিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে হইতেছিল, মেয়েটিকে কোথায় যেন সেও দেখিয়াছে।

হোটেলে ফিরিয়া আসিল সাবিত্রী। তখনও শ্রীরাধামোহন ও অনুরূপা ফিরিয়া আসেন নাই। একা একা ঘরে বসিয়া সে রাজুর কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে রাজুর সঙ্গে রাজুর দাদার কথাটাও মনে পড়িল,—সোমনাথ নামটি তাহার মনে আছে। এই ছেলেটিকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে, পরিচিত মুখ বলিয়া মনে হইতেছিল সাবিত্রীর। কিন্তু কোথায় দেখিল ?

এমন সময়ে শ্রীরাধামোহন ও অনুরূপা ফিরিয়া আসিলেন। সান্ধ্য 'চা'এর আয়োজন হইল। সকলে বসিলেন। পাশের কামরার মোহনলালবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরাধামোহন বলিলেন, আসুন মোহনলালবাবু, আপনার ঘর তালা বন্ধ ছিল তাই সাবিত্রীকে ডাকতে পাঠাই নি।

মোহনলাল উত্তরে বলিলেন, একটু বাহিরে গিয়েছিলাম, তা 'চা' এর আসরের নেশা আমারও কম নেই। এই বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিলেন মোহনলাল। 'নেভার লেট দ্যান বিফোর', বলিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিলেন।

সাবিত্রী মোহনলালের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া চা ঢালিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে চা পানে প্রবৃত্ত হইলেন।

হোটেলে আসিবার অল্পদিন পরেই সাবিত্রীদের কামরার পাশের কামরায় মোহনলাল আসেন। ক্রমে তাঁহার সহিত সাবিত্রীদের

সৌহার্দ গড়িয়া ওঠে। অবিবাহিত যাযাবর জীবন মোহনলালের। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক আলোচনা এবং তাহা লইয়া সুস্থ তর্ক করিতে মোহনলাল ভালবাসেন। হোটেলে তাঁহার তর্কের শ্রোতারাও জুটিয়া যায়। শ্রোতারা যে মাঝে মাঝে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হন এমন নয়। বিশেষতঃ সাবিত্রী মোহনলালের একজন বড় রকমের সমজ্‌দার।

কত রকমের আলোচনা চলে। রাশিয়া ভাল কি আমেরিকা ভাল, কাহার কত ডজন অ্যাটম বোমা আছে কি নাই, হাইড্রোজেন বোমাকে নাকি ছাড়াইয়া যাইবে নাইট্রোজেন বোমা; স্তালিনের মৃত্যুর পর জর্জি মেলেনকোভ কি আইক সাহেবের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন, মাউ-সে-তুংএর নয়া চীনকে বিশ্ব-রাষ্ট্র সভায় স্থান দেওয়া হয় না কেন, কোরিয়ার যুদ্ধনীতি ও শান্তিপ্রস্তাব, ইরান, ইতালী, মিশর, কাশ্মীর, ভারত, পাকিস্তান সম্বন্ধে কত কি কথায় আসিয়া আলোচনা শেষ হয়। —সেদিনের চা-এর আসরে অনেক কিছুই আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু কোন প্রসঙ্গই তেমন যেন জমাট বাঁধিল না। সাবিত্রী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, তাহা মোহনলালের লক্ষ্য এড়ায় নাই।—বিশেষ কাজ আছে বলিয়া মোহনলাল সেদিনের মত বিদায় লইলেন।

*　　*　　*

রাত্রি একটা। নিস্তব্ধ হোটেলে কেহই আর জাগিয়া নাই। শুধু সাবিত্রীর চোখে আজ ঘুম নাই! কেন ঘুম নাই, সে প্রশ্নের উত্তর সেও হয়ত' জানে না। তবু অঘুম রজনী তাহাকে পোহাইতে হইতেছে। মাঝে মাঝে ট্রেনের নৈশ-বিহার জানাইয়া আমেরিকান ইঞ্জিন বংশীধ্বনি করিতেছিল। সাবিত্রীর মনে পড়িল, 'আসানসোল-ধানবাদ কাহিনী'। মনে হইল মমতাজের প্রেম কি তাজমহলে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ট্রেনের সেই ছেলেটি—রাজুর দাদা সোমনাথ। সোম নাথ,—বেশ নামটি, আচ্ছা যদি সোমনাথ নাম না হইয়া 'বটুক ভৈরব' হইত,—সাবিত্রী হাসিল নিজেই। আবার মনে

হইল,—যেন রাজহংসী উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ডানায় ভর দিয়া চলিয়াছে সাবিত্রী আর সোমনাথ,—কোন্ স্বপ্ন-লোকের আলোক-তীর্থে! কুন্তল পড়িয়া রহিল, সাবিত্রী উড়িয়া গেল। সে যেন এক সবুজ পাহাড়ের দেশ। এখানে নির্ঝরিণীর নূপুর-নিক্কন ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়, পাখীরা করে মিতালী; মৃগকন্যারা কত ভালবাসে; নব-বসন্তের কুসুম বিলাসে মঞ্জুরিত হয় মন-মালঞ্চ। অলকাপুরীর কোন আকর্ষণে তাহার মন আজ ব্যাকুল হইয়া উঠিল!

পরদিন সকালে যথারীতি ঘুম হইতে উঠিয়াছে সাবিত্রী। চা-এর পর্ব শেষ হইল। কেন যেন আজ তাহার একা থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। উন্মনা সাবিত্রীকে দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বৃন্দাবনের চোরের কথা আমরা জানি, কিন্তু আগ্রার চোর যে এমন করিয়া ডাকাতি করিয়া বসিবে তা আমরা ভাবি নাই। আর ভাবিলেই বা কি করিতে পারিতাম? ভাবিয়া কিছু করিবার উপায় নাই বলিয়াই ত' সাবিত্রীকে আজিও বৈকালে যদি নিঃসঙ্গ তাজমহলের উপরে যমুনার কলধ্বনি শুনিতে দেখিতে পাই, আশ্চর্য হইব না। আজ যমুনা কি উজান বহিল? কিন্তু যাহার বাঁশী শুনিয়া সে নীল যমুনা-পুলিনে ছুটিয়া আসিল তিনি কি সত্যই নিকুঞ্জে আসিয়াছেন? কিন্তু হায়,—যাঁহার জন্য কালিন্দী উজান বহিয়া মরিল, হাজার হাজার ঢেউ উঠিয়া বুকখানা তোলপাড় করিয়া দিল, তাহার দেখা মিলিল না। ঘরে জটিলা-কুটিলার ভয় ছিল না—এই যা রক্ষা।

সাবিত্রী মনে মনে লজ্জা পাইল। ভাবিল, ছি—এ আমি কি করিলাম! গতকালের সমস্ত ঘটনা মুহূর্তে তাহাকে ক্ষুণ্ন করিয়া তুলিল। রাজহংসী কত না পরিচিত মনে করিয়াই অমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও বলে নাই। কেন এমন হইল? —কিসের জন্য, কাহার জন্য?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রী বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। পথের বাঁকে মোড় ঘুরিতেই তাহার মনে হইল কে যেন তাহার পিছনে আসিতেছে। সাবিত্রীর মন যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এই পদশব্দ

বুঝি অজ্ঞাতে তাহার অন্তর-পথ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। সাবিত্রী গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর করিল। পদশব্দ খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া নিজের কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে পিছন ফিরিয়া তাকাইল।

আরে সাবিত্রী দেবী .য,—বলিয়া উঠিলেন মোহনলাল।

আপনি এদিকে,—জিজ্ঞাসা করিল সাবিত্রী।

মোহনলাল বলিলেন, এক বন্ধুর খোঁজে। অনেকদিন পরে রাস্তায় সেদিন দেখা। বাসায় যেতে বলেছিল, কিন্তু আজ দেখা হ'ল না।

—আমি গিয়েছিলাম তাজমহলে।

—আপনি ত' হোটেলে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—আমিও ত' যাচ্ছি—চলুন।

পথে মোহনলাল অনর্গল কথা কহিতে কহিতে হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সাবিত্রী তাহা শুনিয়াছে, হয়ত' শুনে নাই। মোহনলাল বুঝিতে পারেন নাই, সাবিত্রী মোটেই কথা কহিতেছে না কেন। নিজের কথা-তরঙ্গে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন নিরুদ্দেশের সোনার তরীতে। বিমুগ্ধা কস্তুরী-মৃগ পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিলে তাহার সন্ধান তিনি পাইবেন কি করিয়া !

হোটেলে ফিরিবার একটু পরেই মোহনলালের ডাক পড়িল—সাবিত্রীদের কামরায় চা-এর আসরে। সন্ধ্যার পর এই আসরটি প্রতিদিনই বসিত।

মোহনলাল অনুরূপাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, জানেন মাসিমা, আপনি যেমন গম্ভীর তেমনি গম্ভীর আপনার মেয়েটি। পথে একসঙ্গেই এলাম আমরা, কিন্তু সাবিত্রী দেবী একেবারে 'স্পিকটি নট'।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, এমন অপবাদ আমার শত্রুও দিতে পারবে না মোহনলালদা'। আপনি যত কথা বলেন অত কথার উত্তর কোথায় খুঁজে পাই বলুন ত' ? সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

শুধু অনুরূপা চুপ করিয়াছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাকে বড়মা বলিয়া

ডাকে, মোহনলাল ডাকিলেন আজ মাসিমা। তাঁহার সুপ্ত-চেতনায় মোহনলালের মুখের মতই আর একটি মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল,—সেও ডাকিত কখনও মা, কখনও মাসিমা, আবার কখন বা বড়মা। সেও হয়ত' এত বড়টিই হইয়াছে এতদিনে।

নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া স্নেহ-দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন অনুরূপা, সাবিত্রী ঠিক কথাই বলেছে বাবা। তুমি যত কথা বল বা জান তার উত্তর খুঁজে সাধারণ লোকে পাবে না। তুমি 'মাসিমা' ব'ল্লে, তাই তোমাকে আজ 'তুমি' ব'ল্লাম বাবা।

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বলিলেন, আমি ত' আপনার ছেলের মত। আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন বৈ কি। সত্যি মাসিমা, আপনাদের মত এমন সুন্দর পরিবার আমার চোখে পড়েনি। আপনারা কত যে ভাল,—কত যে ভাল লাগে আপনাদের সকলকে।

শ্রীরাধামোহন উত্তরে বলিলেন, আপনাকেও কি আমাদের কম ভাল লাগল, মোহনলালবাবু। আপনি ভাল বলেই সব আপনার ভাল লাগে। ভাল মানুষের স্বভাবই যে তাই। অনুরূপার মুখে ত আপনার প্রশংসা ধরে না।

মোহনলাল বিনীত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, ভবঘুরে বাচাল লোক, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ক'রে ফেলেছি।

অনুরূপা স্মিতহাস্যে মোহনলালের কথার উত্তর দিলেন, সে কি কম কথা বাবা, মানুষকে ভালবাসতে ক'জনা পারে?

মোহনলাল নম্রকণ্ঠে কহিলেন, মানুষকে ভালবাসার স্পর্ধা আমার নেই মাসিমা। এ যে কঠিন সাধনা। আর তা'ছাড়া সাম্প্রতিক ধ্বংসধর্মী যুগে, মানুষকে ভালবাসার সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দায়। ভুলেই গেছি আমরা, মানুষের পর্যায় কি? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন, আশ্রম, মঠ, মজুর, সংঘ, সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রচার ও প্রভাব সত্যিকারের মানুষকে রেখেছে ঢেকে।

অনুরূপা মুগ্ধ চিত্তে শুনিতেছিলেন মোহনলালের কথা। তিনি মোহনলালের দিকে স্নেহ-দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি

ঠিক কথাই ব'লেছ বাবা, মানুষের পর্য্যায় কি তা আমরা ভুলে গেছি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য কি জানেন মাসিমা, বলিলেন মোহনলাল, যাদের ঘরে আগুন লেগেছে তাদের কাছে আগুনের কথা ব'ল্লেও তারা বিশ্বাস করে না।

সাবিত্রী এবারে কথা বলিল, যা সহস্র সহস্র লোকে বিশ্বাস করে, তাকে সহজে অবিশ্বাসই বা কেমন ক'রে করা যায় বলুন?

মোহনলাল উত্তরে বলিলেন, দাদা যখন বলেছ এবার থেকে 'তুমি',—তাই বলছি তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন ক'রেছ বোন। তবে একথা ঠিক জেন, যা বহুলোকে বিশ্বাস করে, তাই চরম সত্য নয়। সূর্য ওঠে না, কিন্তু লোকে ব'লত সূর্য ওঠে, আর ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর চারিদিকে। বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রে দিয়েছে সূর্যোদয় হয় না, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। লোকে পূর্বে মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস ক'রত। এখন নিশ্চয়ই করে না। তেমন মানুষের সত্য-বিশ্বাসে মনো-বিজ্ঞানের প্রয়োজন। এই আমি সত্য বলে মনে করি।

সাবিত্রী কহিল, আপনার সত্যটা কি খুলে বলুন।

মোহনলাল হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার সত্য আর তোমার সত্য বলে ত' কিছু প্রভেদ নেই। সত্য সকলের কাছেই এক। এর উত্তর কথা দিয়ে বোঝান যায় না। সামান্য একটা উদাহরণ দেই,—যেমন ধর, বহুলোক মাতুলী ধারণ করেন, উপকার পাবেন ভেবে। বহু অর্থ এই পথে ব্যয় হয়। কিন্তু একটু চিন্তা ক'রলেই বুঝতে পারবে মাতুলী যাঁরা কেনেন তাঁদের চেয়ে, যাঁরা বিক্রী করে উপকার হয় তাদের বেশী। ধাতুর গুণে হয়ত' কখনও কারও ফল দর্শায়,—কিন্তু মাতুলী যে বিক্রী করে তার 'ব্যাঙ্ক ব্যালান্স' যায় বেড়ে।

সাবিত্রীও হাসিয়া বলিল, এ আপনার ধারণা মাত্র।

মোহনলাল বলিলেন, ধারণা নয়, বিশ্বাস। সত্যকে আত্ম-বিশ্বাসেই জানতে পারা যায়। আমার কি মনে হয় জান,—বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে অন্যায় জন্মগ্রহণ করে। কৃপণ মনের দুয়ারে 'মানুষের'

প্রবেশ নিষেধ,—একথা আমরাই লিখে রাখি। কথা প্রসঙ্গে অন্য কথায় এসে পড়েছি তবু জেনো সত্য মানুষের নিজস্ব সম্পদ। সত্য প্রচারের বস্তু নয়, আত্ম-নিরূপণের বস্তু। তাকিয়ে দেখ একবার নতুন চীনের দিকে।

সাবিত্রী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ত' নতুন চীনে গিয়েছেন? কি দেখে এলেন?

অনুরূপা বলিলেন, বলবে বাবা চীনের কথা।

কেন ব'লব না মাসিমা, বলিলেন মোহনলাল,—অদ্ভুত এই নতুন চীন। নিদ্রিত চীন তার জগদ্দল পাথর ভেঙ্গে সত্যিই জেগেছে আজ। দিকে দিকে তার প্রাণ-স্পন্দন। মানুষের প্রতি মানুষের দরদ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা,—দেখতে পেলাম এই চীনে। দেখলাম মানুষ যেন এক নতুন পদার্থে গড়া। সুন্দরের দেবতার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ, এর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে রূপ লাভ ক'রেছে। তারা আজ প্রাচীর ভেঙ্গেছে যে। প্রাচীন চীন তাই আজ নবীন যৌবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

মোহনলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। একটু পরে আবার নিজেই বলিতে সুরু করিলেন, মানুষকে ভালবাসার কথা ব'লছিলেন মাসিমা, ভালবাসা এ সংসারে বড় কঠিন। দেশে সামাজিক জীবনের যে ধরাবাঁধা নিয়ম· সে আমাদের বিগত পিতৃপুরুষদের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিই চরম সৃষ্টি নয় তা তাঁরা জানতেন। আমরা গেলাম সেটা ভুলে। তার আজকের রূপের মধ্যে তাই কোন সত্যের চরিতার্থতা নেই, আছে ব্যর্থতার নিদারুণ অভিশাপ। প্রথম দিনের সত্য সে আজ হারিয়েছে। তাই মানুষকে ভালবাসার গোড়ার কথাই তার মনে নেই। না হ'লে কেন বর্বরের বিচারে মানুষকে প্রাণ দিতে হয়, কেন অযোগ্যতা যোগ্যতাকে করে পরিহাস, কেন নির্মম পাশবিকতা প্রেমকে ক'রে দেয় পঙ্গু? এই স্তূপীকৃত বিশ্ব-পাপ মর্মান্তিক দম্ভে আজ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। আমার হাতে ত' 'দম্ভোলি' নেই—তাই চা-এর আসরে শুধু ব'কেই মরতে হয় এমন ক'রে। তার জন্যে এখনও বুঝি অনেক হাড়ের প্রয়োজন। আচ্ছা আজ উঠি,—

আর কোন কথা না বলিয়া মোহনলাল হঠাৎ নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না, সকলেই নীরব। বজ্র পতনের পরে নিস্তব্ধ ধরণী যেন, ব্যথায় বেদনায় বিবশ স্পন্দনহীন।

মোহনলাল এমন অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াই থাকেন। কিন্তু তাঁহার আজিকার কথায়, এই ভবঘুরে লোকটির অন্তরের একটি ব্যথিতরূপ সাবিত্রীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধায় তাঁহাকে প্রণাম না জানাইয়া পারিল না। মোহনলালের অন্তর যে পুঞ্জীভূত বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার মনের মানুষটি যে সংসারের, সমাজের অনেক কিছুর সঙ্গেই খাপ-খাওয়াইতে পারিতেছে না, তাহা তাঁহার কথার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিলেন।

* * * *

দুইদিন কাটিয়া গেল। প্রবাসের আসর ভাঙ্গিবার পালা আসিল। আজ সন্ধ্যায় মোহনলাল চলিয়া যাইবেন। কোথায় যাইবেন, কেহ জিজ্ঞাসাও করেন নাই, তিনিও বলেন নাই। গাড়ী হোটেলের 'গেটে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাত্রার সময় আগত। সামান্য জিনিষপত্র হোটেলের চাকরেরা গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছে। শ্রীরাধামোহন, অনুরূপা, সাবিত্রী তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইতে গাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছেন।

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে মোহনলাল অনুরূপার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আত্মীয়তার যে স্পর্শ পেয়েছি আপনাদের কাছে, ভুলে যাব না কোনদিন। যদি কোনদিন কাশী যাই, নিশ্চয় মাসিমা, মেসোমশাইকে প্রণাম না জানিয়ে ফিরে আসব না, আর আমার সাবিত্রী বোনটির 'দাদা' সম্বোধন শুনতে বঞ্চিত হব না কিছুতেই। তবে আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব, যদি আমার প্রগল্‌ভতা, অজ্ঞাতে কখনও কাউকে ক্ষুণ্ণ ক'রে থাকে।

সাবিত্রী মোহনলালের কথার উত্তরে বলিল, সে বরং আপনাকেই

অনেক সময়ে বিরক্ত করেছি মোহনলালদা'। কত সময়ে তর্ক ক'রেছি, শুনিনি আপনার কথা, আপনিই ক্ষমা ক'রবেন।

মোহনলাল হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু মাসিমা, সাবিত্রী যদি বিয়ের সময় আমাকে ফাঁকি দেয়, কিছুতেই ওর সে লজ্জা আমার সইবে না,—এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

অনুরূপা বলিলেন,—পার্বতীর বিয়ের নারদ যে আমি তোমাকেই ঠিক ক'রেছি বাবা।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

সাবিত্রী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মোহনলালের হাতঘড়ি বাদ সাধিল। তাহার উপরে নজর পড়ায় মোহনলাল বলিয়া উঠিলেন, সময় হয়ে গেছে ত', আর দেরী করলে গাড়ী পাওয়া যাবে না। অনুরূপা ও শ্রীরাধামোহনকে প্রণাম করিলেন মোহনলাল। সাবিত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় চাহিলেন। নিমেষে পরিবেশ বিষণ্ণতায় ভরিয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিতেই পকেটে হাত পড়ায় একখানা চিঠি মোহনলালের হাতে বাধিল। চিঠিখানি উঠাইয়া সাবিত্রীকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিলেন, আগামী কাল সকালে আমার কাছে আমার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে। কিন্তু আমাকে ত' আজই চলে যেতে হ'চ্ছে। তুমি দিদি, ভদ্রলোক এলে এই চিঠিখানি তাঁকে দিও।

হাত বাড়াইয়া সাবিত্রী চিঠি লইল। গাড়ী ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিল। পথের আলোতে যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত সকলে চাহিয়া রহিলেন। পথের বাঁকে হাত উঁচু করিয়া শেষ বিদায় চাহিল মোহনলাল, সাবিত্রীও হাত উঁচু করিয়া শেষ বিদায় জানাইল। এ যেন কোন অজানা সমুদ্রে আপন জন ডুবিয়া যাইতেছে,—তাহার হাতের শেষ মুঠি দেখা গেল, তারপর আর দেখা গেল না।

ভারাক্রান্ত মনে সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মোহনলাল কোথা হইতে আসিয়াছিলেন আবার কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই

তাহা জানিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই অল্পদিনের পরিচয়—সৌহার্দ, সকলের মনে দাগ কাটিয়া রাখিয়া গেল।

মোহনলাল চলিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রীরাও দু' একদিনের মধ্যেই কাশী ফিরিয়া যাইবে। অথচ হোটেলের এই অংশটুকু কেন যেন মনে হইতেছিল আজই ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই শ্রীরাধামোহন বলিলেন, মোহনলালকে দেখলে যেন মনে হয় ও এক মহাসাগর। কত যে জেনেছে ছেলেটি। যেমন রয়েছে অন্তরে প্রচুর অনুভূতি তেমন আছে তার বহিঃপ্রকাশের সাবলীল সৌন্দর্য। সবার উপরে রয়েছে উদার দরদী মন। দু'দিনে সকলকে কতই না আপনার করে নিয়েছিল।

অনুরূপা কোন কথা কহিলেন না, সাবিত্রীও না।

কিছুক্ষণ পরে অনুরূপা বলিলেন শ্রীরাধামোহনকে, আমরাও ত' পরশু যাচ্ছি কাশী, চল তোমার সেই দিল্লীর বন্ধুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি আজ।

আগামী কাল সকালে যাইবার কথা জানাইলেন শ্রীরাধামোহন।

আবার সকলে চুপ। আজিকার সন্ধ্যার-সেতারের কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বাজাইতে গেলেই বেসুরা লাগিতেছে। সাবিত্রী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। অনুরূপা কেন যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি শ্রীরাধামোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহনলালের ট্রেন ছেড়ে দিল—না ?

৭

পরদিন সকালে 'চা'এর আসরে বসিয়া মোহনলালের কথাই বলিতেছিল সাবিত্রী। গতকালও মোহনলাল তাহাদের সঙ্গে চা-এর আসরে যোগ দিয়াছেন। মোহনলালের কথা কেহই ভুলিতে পারিতেছেন না।

মোহনলাল—ঈশ্বর, ঠাকুর-দেবতা, প্রভৃতি কিছুই মানেন না।

কারণ তাঁহার মতে তাঁহারা কেহ নাই। মানুষই ইচ্ছা করিয়া ইচ্ছাময়ের রূপ দিয়াছে। তিনি বলেন, অদৃশ্য দেবতাকে ভজনা করিয়া মানুষ আত্মশক্তিকে অবমাননা করে। এই কোটী কোটী জীব জীবাণুর সৃষ্টির মূলে কোন চক্রধারী চক্র ঘুরাইতেছেন, একথা মোহনলাল বিশ্বাস করেন না। পদার্থের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীগত রাসায়নিক সংঘাত, বিভিন্ন জীব-সৃষ্টির মূলে কাজ করিয়াছে এবং করিতেছে। তাহাদের আকর্ষণ, বিকর্ষণ, স্থিতি বা লয়ের মূলেও—সেই সংঘাতশক্তি। এমন হয়ত' কত পৃথিবী আছে, আছে কত সূর্য, যাহারা অনন্ত নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করিয়া আছে। এমন সব অবোধ্য কথা মোহনলাল বলেন। জন্মান্তরের স্বর্গ হইতে জীবিতকালের এই মাটির পৃথিবী তাঁহার কাছে প্রিয়। কারণ মানুষ মরিয়া গেলে, এই জীবনের কর্মফল লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন, অনন্ত জীবকূলের সৃষ্টির এবং ধ্বংসের যে রীতি, তাহাতে কোন বিশিষ্ট প্রাণীর জন্ম বা মৃত্যুর হিসাবের খতিয়ান নাই। এই লইয়া সেদিন সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁহার তুমুল তর্ক হইয়াছিল। সাবিত্রী বলিয়াছিল, আপনি ত' ব'লছেন কর্মফল নেই, তবে একজন কেন বড় লোকের ঘরে জন্ম নেয় আর কেনই বা অন্য একজন গরীবের ঘরে জন্ম নেয় ?

মোহনলাল উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে যেমন কাজ করে পরের জন্মে সে তেমনই ফলভোগ করে, এই ত' অনেকে বলেন ? কিন্তু তাঁরা ত' বুঝ্‌তে চান না—জন্মের রীতি সব স্থানেই এক ব'লে জন্ম হয়। বড় লোক গরীব লোকের প্রশ্ন সেখানে নেই। স্তালিন, মুসোলিনী, এঁরা সব বড়লোকের ছেলে ছিলেন না। বড়লোকের ছেলে জন্মাধিকারে অনেক সুযোগ সুবিধা পায়,—গরীবের ছেলে তা পায় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন,—তাঁকে কষ্ট করে বড় হ'তে হ'য়েছিল। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর ভগবানের বাড়ীতে পোষ্টাফিসের মত 'সর্টিং পকেটস্' আছে, চিঠির মত দেহ-মুক্ত-আত্মা ভগবান সেখানে সর্টিং ক'রে রাখেন ? তারপর, কোন্ আত্মা, বাংলাদেশের বড়লোকের ঘরে যাবে, কোন্‌টি যাবে হনুলুলু দ্বীপে

মধ্যবিত্ত পরিবারে, কোন্‌টি যাবে আইসল্যাণ্ডে, কোন্‌টি যাবে উত্তর সাইবেরিয়ায়, কোন্‌টি যাবে গুজরাটে গরীবের ঘরে, কোন্‌টি যাবে মার্কিন রাজ্যে, সবই কি তিনি তাঁর হেড-অফিস থেকে শীলমোহর মেরে পাঠিয়ে দেন ?

এমন কত কি আলোচনা ও তর্ক করিয়া মোহনলাল সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'চা'এর আসরে বসিয়া সেই সব কথাই সকলের মনে পড়িতেছিল।

সাবিত্রী কহিল, মোহনলালদা'কে সত্যই যেন বোঝা যায় না, অথচ এমন সুন্দর মন। কত অল্পদিনের মধ্যে আমাদের যেন নিজের লোক হ'য়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীরাধামোহন সাবিত্রীর কথায় বলিলেন, আকাশের মত উদারতা ওর মনের—তাই সব কিছুই সহজে ও গ্রহণ করতে পারে।

অনুরূপা এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিলেন,—নাও ওঠ। চল, তোমার বন্ধুর ওখানে যেতে হবে যে।

সাবিত্রী লক্ষ্য করিয়াছিল, মোহনলালের প্রসঙ্গ অনুরূপা বেশী বাড়াইতে চাহেন না। ইহাতে হয়ত' শঙ্করের কথাই তাঁহার মনে আসে। তাই গতকাল রাত্রের মত মোহনলালের কথা আজও তিনি চাপা দিয়াই বন্ধুর ওখানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। একটু পরেই অনুরূপাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধামোহন বন্ধুর বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হোটেলে সাবিত্রী একা। ঘরখানি এলোমেলো হইয়া আছে, জিনিষপত্রগুলি সাবিত্রী গোছগাছ করিয়া রাখিল। পরশু চলিয়া যাইতে হইবে।—কিছুক্ষণ জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল কোথায় সে আজ! নির্জন ঘরে কত চিন্তাই না মাথায় ভীড় জমাইতে লাগিল। ভাবিল কোথায় তাহার মা, বাবা, কোথায় তাহার ভাই-বোন, —সবই যেন স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে। আবার হয়ত' এই পরিবারকেও একদিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; যেমন মোহনলাল চলিয়া গেলেন। মোহনলাল সাবিত্রীকে বোনের মত ভালবাসিয়াছিলেন, সাবিত্রী

তাহাকে দাদা বলিত। কিন্তু কোথায় আজ মোহনলাল? হয়ত এমনও হইতে পারে আর কোনদিনই মোহনলালের সঙ্গে দেখা হইবে না। মোহনলালের নামও হয়ত' স্মৃতির ফলকে দাগ কাটিবে না। * * * এমনই ত' হয়। মানুষের চলার গতিই শাশ্বত, পরিচয় ক্ষণিকের। গাছের পুরান পাতা যেমন করিয়া ঝরিয়া যায় আবার আসে নব-কিশলয় দল, তেমনই মানুষের জীবনে, পুরান পরিচয় বিস্মৃতির-ধূলায় ঝরিয়া পড়ে, নবনব পরিচয় কীর্ণ করে তাহার নবীন যাত্রাপথ।* * * নিজের ভাইবোনের জন্য আজ আর মনে তেমন কষ্ট হয় না সাবিত্রীর। কিন্তু মোহনলাল চলিয়া গিয়াছেন,—সে কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

এমন সময়ে হোটেলের একটি চাকর ঘরে ঢুকিয়া সাবিত্রীকে বলিল, একজন বাবু মোহনলালবাবুর ঠিকানা চাইছেন। আপনি কি জানেন তাঁর ঠিকানা?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল, ভদ্রলোক কোথায়, জিজ্ঞাসা করিল।

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মোহনলাল চিঠি দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এক বন্ধুর আসিবার কথা আছে, তিনিই আসিলেন কি, এই ভাবিয়া চাকরটির সঙ্গে সাবিত্রী বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিতেই, আগন্তুক তাহাকে করজোড়ে নমস্কার করিতে যাইতেছিল কিন্তু নমস্কার করা হইল না, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আরে আপনি এখানে!

সাবিত্রীর আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে সংযত করিয়া সে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি মোহনলালবাবুর কাছে এসেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তিনি গতকাল সন্ধ্যায় চলে গেছেন। কোথায় গেছেন ব'লে যান নি।

—কিন্তু আমাকে যে আজ সকালে আস্তে ব'লেছিল।

—ও দাঁড়ান, একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে,—এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। একটু পরেই একখানা চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

—আপনার নাম কি ?—

—সোমনাথ চক্রবর্ত্তী।

—তাহ'লে আপনারই চিঠি। এই নিন্। আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার।

সাবিত্রী পর্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া আসিল। সোমনাথ চলিয়া গেল কিনা তাহা দেখিবার প্রয়োজন মনে করিল না। কি হইল সাবিত্রীর! কিছুতেই সে নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সোমনাথ এখানে এমন করিয়া কি করিয়া আসিল! সে যেন বুঝিতে পারিল, সোমনাথ কিছুতেই চলিয়া যাইতে পারে না, নিশ্চয়ই বাহিরে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কৌতূহল বশে সে আবাব বাহিরে আসিল। দেখিল তাহার অনুমান মিথ্যা নয়।

সাবিত্রী বাহিরে আসিতেই সোমনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, মাপ্ ক'রবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ব'লে যেতে পারি নি। হোটেলের ম্যানেজার ব'ল্লেন, মোহনলালের সব সংবাদই আপনাদের কাছে পাওয়া যাবে। মোহনলাল আমার বিশেষ বন্ধু তাই—

—আপনি কি জান্‌তে চান বলুন, কহিল সাবিত্রী।

—তার আগে আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

—বলুন না।

—আচ্ছা আপনার নাম কি কুন্তল ?

—আমার নাম সাবিত্রী।

—কিন্তু মানুষে মানুষে এমন সাদৃশ্য,—বলিয়া সোমনাথ চুপ করিয়া গেল।

—কেন কি হ'য়েছে,—বলিল সাবিত্রী।

—না—হয়নি এমন কিছুই, তবে প্রথমেই আপনার সঙ্গে আমার

ব্যবহার ভদ্রোচিত হয় নি, আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। কুন্তল নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনাকে ভুল ক'রে ফেলেছিলাম, ক্ষমা ক'রবেন।

—কিন্তু আমারই সঙ্গে এক ভদ্রমহিলার হুবহু মিল? ভারি মজা ত'!

—আপনি অসন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন লক্ষ্য ক'রেছি।

—সত্যি কথা বলতে কি, রাগ যে একটু না হ'য়েছিল তা নয়। তবে মোহনলালদা'র বন্ধু যখন, আশা করি আপনিও মনে ক'রবেন না কিছু।

—আমি কেন মনে ক'রব, আপনি ত' আমাকে অসম্মান করেন নি।

—এমন কিছু সম্মানও দেখাই নি। যাক, মোহনলালদা'র বন্ধু আপনি,—আপনি কিন্তু 'না' করবেন না, একটু 'চা' খেয়ে যাবেন।

—চা?

—হ্যাঁ—আসুন।

—পর্দা সরাইয়া ধরিল সাবিত্রী, সোমনাথ ঘরে প্রবেশ করিল।

বসুন, আমি চা-এর কথা বলে আসি;—এই বলিয়া সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সোমনাথ আকাশ-পাতাল ভাবিতে না ভাবিতেই আবার সাবিত্রী ফিরিয়া আসিল।

আচ্ছা, মোহনলালদা' আপনার কেমন বন্ধু, জিজ্ঞাসা করিয়া সাবিত্রী সোমনাথের সামনেই বসিল।

দু'জনের মাঝখানে একখানা ছোট্ট টিপয়, ছোট হইলে কি হইবে, অনেক দূরত্ব রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে সে।

সাবিত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সোমনাথ বলিল, আমরা একসঙ্গে এম-এ পাশ করি। তারপর আমি এক বিদেশী ফার্মে পেলাম চাকুরী। মোহনলাল কি করে, কোথায় থাকে, কিছুই জানতাম না। হঠাৎ আগ্রায় রাস্তায় দেখা। আমাদের বাসাতেও গিয়েছিল। ব'লেছিল আজ সকালে এই হোটেলে আস্‌তে।

এমন সময়ে চা আসিল। সাবিত্রী নিজ হাতে সোমনাথের সম্মুখে

চা-এর কাপ তুলিয়া ধরিল। 'চা'এর কাপ লইল সোমনাথ। দু'জনেই 'চা' পান করিতে করিতে কথা বলিতে লাগিল।

সাবিত্রী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, মোহনলালদা'র মতিগতি বোঝা ভার। আমরাই কি জান্‌তাম তিনি কালই চলে যাবেন। হঠাৎ চলে গেলেন। আপনার চিঠি, তাও ভুলে গিয়েছিলেন, গাড়ীতে উঠে তাঁর মনে পড়ল। কিন্তু এমন লোক সত্যি দেখা যায় না,—কত যে ভাল।

—বরাবরই ও ভাল, তবে বড্ড খেয়ালী।

—খেয়ালী ব'লেই বোধ হয় ভাল।

—হবে।

কিন্তু একটা কথা, আপনি আমাকে ত' কুন্তল বলে মনে ক'রেছিলেন,—তিনি কে?

আমি তাঁকে বিশেষ চিনি না। আমার ছোট বোন রাজু তাঁকে চেনে। সেদিন তাজমহলে রাজুর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল, আমিও ছিলাম সঙ্গে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বোধ হয় এই মহিলার সঙ্গেই এক 'ট্রেনের' ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে আমার দেখা হ'য়েছিল।

—ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে কেন?

—ভুল করে উঠে পড়েছিলাম।

—ও, ভুল করা তাহ'লে আপনার অভ্যাস আছে। এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া সোমনাথের মুখের দিকে চাহিল সাবিত্রী।

—ভুল ঠিক নয়, বিপদে পড়ে বাধ্য হ'য়েই উঠ্‌তে হ'য়েছিল,—একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল সোমনাথ।

—বিপদ কিসের?

সোমনাথ সংক্ষেপে সে ঘটনা বিবৃত করিল।

শুনিয়া সাবিত্রী বলিল, তাহ'লে ত' ভদ্রমহিলা আপনার প্রভূত উপকার ক'রেছিলেন—না?

—তার জন্য তাঁকে প্রতিদিন ধন্যবাদ দেই।

—প্রতিদিন ?

সেদিন তাজমহলে সন্ধ্যালোকে প্রথমে চিন্‌তে পারিনি কিন্তু তাঁকে ভুলিনি।

বোধ হয় ভুলতে ইচ্ছেও করে না, এই বলিয়া সাবিত্রী মৃদু হাসিল। সোমনাথ তাহা দেখিল না।

সাবিত্রী বসিতে পারিতেছিল না। কথা শেষ করিয়াই জানলার পাশে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। জানলার ফাঁক দিয়া প্রথম শীতের স্নিগ্ধ-রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে সাবিত্রীর মুখের উপরে। মসৃন অবিন্যস্ত কেশরাশ্, সাদা সিল্কের শাড়ী পরণে, কপালে উড়িতেছে চুলগুলি উত্তরীবায়ের প্রথম স্পর্শে। হাত দিয়া সেগুলি পিছনে সরাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল সাবিত্রী।

সোমনাথও এবারে দাঁড়াইল এবং সাবিত্রীকে নমস্কার জানাইয়া বলিল, আপনার আপ্যায়নের কথা ভুলে যাব না, লিখব নিশ্চয়ই মোহনলালকে।

সোমনাথ চলিয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া আসিল সাবিত্রী। কিন্তু এই কথাই সে ভাবিয়া পাইল না, সোমনাথকে এমন করিয়া এই হোটেলে কে লইয়া আসিল! কিসের যেন অব্যক্ত আনন্দে তাহার সারা দেহ-মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া সে কত কিছুরই যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সোমনাথ,—কত কথায় আজ সে তাহাকে বিব্রত করিয়াছে,—তবু ভাল লাগিয়াছে। সোমনাথ—মোহনলালের বন্ধু, ইহা যেন আরও ভাল লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, কেনই বা বলিলাম না আমিই কুন্তল। আবার কি করিয়া দেখা হইবে। আবার হয়ত' আসিতেও পারেন। এমন কত কথাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল।

অদ্ভুত এই রমণীর মন। কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে কখন মনের সব ঐশ্বর্য একজনকে উজাড় করিয়া দেয় তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে না। কোন কিছুই ত' ভাল করিয়া বলা হয় নাই, তবু মন তাহাকেই সেই প্রথম দিন হইতেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে কেন ?

সোমনাথের নম্র-উচ্ছ্বাসহীন ব্যবহার সাবিত্রীকে আরও মুগ্ধ করিল। থাকিয়া থাকিয়া কত কথাই সাবিত্রীর মনে তোলপাড় করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানে নাই, অনুরূপা আসিয়া তাহাকে জাগাইলেন।

৮

সোমনাথ মোহনলালের চিঠি লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। শুধু কি চিঠি লইয়াই আসিল? সাবিত্রীর আপ্যায়ন, আলাপন, হাসি-মাধুর্য,—সব মিলিয়া তাহার মনে সুগভীর রেখাপাত করিল। তবে ট্রেনের সেই মেয়েটি ও রাজুর কুন্তলদির সহিত সাবিত্রী দেবীর এই অদ্ভুত সাদৃশ্য কেমন যেন রহস্যময় হইয়া থাকিল তাহার কাছে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এই মেয়েটিই কুন্তল নয়। ট্রেনে সে তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছিল। তারপর সে যে তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই, একথা সত্য নয়। তাহার ডাইরি খাতায় লেখা এই ঘটনা পড়িয়া মাঝে মাঝে সে যে তৃপ্তিবোধ করে নাই,* এমনও নয়। তাই মন হইতে মূর্তি যে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই প্রকৃত তথ্য। তবু এই রহস্য কি করিয়া উদ্ঘাটন করা যায়, বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল সোমনাথ।

অফিস হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া আসিল সোমনাথ। অফিসের পোষাক ছাড়িয়া সে রাজুকে ডাকিল,—রাজহংসী।

—ডাকলে দাদা?

—শোন্ ত'।

—রাজু সোমনাথের ঘরে আসিল।

—কি দাদা?

—হাঁরে রাজহংসী, আচ্ছা, তাজমহলে যে মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল, তোর কুন্তলদি'ও কি অমনই দেখতে?

কুন্তলদি'ই ত'। আমি ভুলিনি। এই ত' কদিন আগেই না কাশীতে দেখা হ'য়েছিল। কেন,— কি হয়েছে দাদা?

—না, কিছুই হয়নি। তুই যা আমার খাবার নিয়ে আয়। আমি এক্ষুনি বেরুব।

—কোথায় যাবে দাদা ?

—কাজে।

—কি কাজ ?

—অনেক কাজ।

—আমি যাবনা বুঝি ?

—না, তোকে নিয়ে গেলে হবে না।

—কেন ?

—কেন আবার কি।

বেশ, তোমার সঙ্গে আর কথা ব'লব না—আড়ি-আড়ি-আড়ি। এই বলিয়া রাজু চলিয়া গেল।

সোমনাথ চিন্তা করিতেছিল সাবিত্রীর কথা। রাজুর আড়ি তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। সে মনে মনে বলিল, রাজু ভুলে যাবার মেয়ে নয়, ও ঠিক ধ'রেছে। আর আমি, তিন জায়গায় দেখলাম,—ট্রেন, তাজমহল আর হোটেলে। কুন্তল আর সাবিত্রী নিশ্চয়ই এক।

মুখ ভার করিয়া খাবার আর চা রাখিয়া রাজহংসী চলিয়া যাইতেছিল। সোমনাথ এতক্ষণে নিজের পোষাক পরিয়া লইয়াছে। রাজহংসী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে সস্নেহে ডাকিল সোমনাথ,

"রাজহংসী পাখা মেলে আয় উড়ে আয়।
যেন, আকাশের গায়ে শাদা মেঘ ভেসে যায়॥"

রাজহংসীকে যখনই আদর করিতে চাহিত সোমনাথ, এই ছড়াটি সে আবৃত্তি করিত। বহুদিন পরে এই ছড়াটি বলিয়া সোমনাথ রাজুর অভিমান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল।

রাজহংসী শুধু মাত্র দাঁড়াইল। সোমনাথ তাহাকে দুই হাতে পিছন হইতে টানিয়া লইল কাছে, রাগ ক'রেছিস্—অনেক রাগ ?

রাজহংসী চুপ করিয়াই রহিল।

—রাজু।

—বলছি কথা ব'লব না।

—ও—তাই বুঝি।

হ্যাঁ—।

সোমনাথের হাত ছাড়াইয়া ফিরিয়া, জিব্ কাটিয়া রাজু চলিয়া গেল। রাজু যে খুব রাগ করিয়াছে সোমনাথ বুঝিল। খাবার ও চা শেষ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল সোমনাথ।

কি ভাবিয়া সোমনাথ প্রথমে তাজমহলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাজমহলের মিনারগুলিতে সূর্য তখন অস্ত যাই যাই করিতেছে। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও সে সাবিত্রীর সন্ধান পাইল না। যমুনার দিকে যাইয়া দাঁড়াইল। তরঙ্গ-বিহীন যমুনা কোন কথাই কহিয়া দিতে পারিল না। একটু পরেই তাহার মনে হইল তাজমহলে সাবিত্রী আসে নাই। সন্ধ্যা নামিল। তাজমহলে সাবিত্রী-অনুসন্ধান বাতিল করিয়া তাই তাহাকে পথে আসিয়া দাড়াইতে হইল।

বাসায় সে ফিরিল না। যাব কি যাব না করিয়া আস্তে আস্তে সে যে পথে পা বাড়াইল—সে পথ শেষ হইয়াছে হোটেলে, যেখানে সে আজই সকালে আসিয়াছিল। পথ তাহার অজানা ছিল না—তবু কি বলিবে, দেখা হইবে কি না, প্রথমে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবে, তারপরে বাক্যবানে জর্জরিত করিয়া দিবে, এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় চরণ তাহার বেশী সায় দিতেছিল না। ভাবিতে ভাবিতে সে হোটেলে সাবিত্রীদের ঘরের সামনে আসিয়া পড়িল। কিন্তু এ কি? ঘরে মস্ত বড় একটা তালা ঝুলিতেছে। হঠাৎ একটা চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে 'রেডসিগ্ন্যাল' তুলিয়া ধরিলে যেমন হয়, সোমনাথের মনের অবস্থা হইল তেমন। প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া সে ভাবিল, উঁহারা বোধ হয় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, সন্ধ্যা লাগিয়া গিয়াছে, হয়ত' এখনই ফিরিবেন। কিন্তু তাঁহারা এতক্ষণ যে 'টুণ্ডলা'-পার হইতেছেন, সে কথা সোমনাথ কেমন করিয়া জানিবে? ফিরিয়া যাইবে কি অপেক্ষা করিবে, এমন সময়ে সকালের সেই চাকরটার সঙ্গে দেখা। চাকর তাহাকে 'টুণ্ডলার' খোঁজ না দিতে পারিলেও, আজই বিকালের

গাড়ীতে তাঁহারা যে কাশী রওনা দিয়াছেন, সে কথা জানাইল। বিরাট নৈরাশ্য এবং পুঞ্জীভূত অস্বস্তিতে মন তাহার ভরিয়া গেল। অগত্যা বাসায় ফিরিয়া আসিল অশান্ত সোমনাথ।

সাবিত্রীদের আজই অবশ্য চলিয়া যাইবার কথা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন জরুরী কাজে 'তার' করিয়াছেন শ্রীরাধামোহনকে। তাই আজই বৈকালের গাড়ীতে তাঁহাদের কাশী রওনা দিতে হইল। সাবিত্রীর আজ যাইতে খুব যে ইচ্ছা ছিল এমন নয়। তাজমহলের কথা সেও ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল আজও একবার তাজমহলে যাইবে। সোমনাথের পুনরায় তাজমহল পরিব্রজা তাহা হইলে সার্থক হইত সন্দেহ নাই!

মানুষের মনের সঙ্গে মন কথা বলে। তাহার শব্দ-ঝঙ্কার শোনা যায় না, তবু বোঝা যায়, তবু জানা যায়। অনুভূতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তাহার ঢেউ লাগে। টেলিগ্রাফের 'তারে' সেই বেতার-বার্তা একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল।

সোমনাথ বাসায় ফিরিল বটে, কিন্তু মন তাহার কোথায়? বিশেষ বিরক্তির সঙ্গে সে সার্ট খুলিতে গেল, কিন্তু বোতামগুলি ঠিকমত না খোলাতে মাথায় জামাটি আটকাইয়া গেল, টানিয়া জামা খুলিতে, মাথার চুলগুলি হইয়া গেল এলোমেলো, জামাটা বিছানার উপরে ফেলিয়া চিরুণী দিয়া চুল ঠিক করিতে চিরুণীখানা মট্ করিয়া ভাঙ্গিল, ভাঙ্গা চিরুণী জানালা দিয়া জোরে ফেলিয়া দিতে হাত লাগিল জানলার শিকে, 'উঃ', বলিয়া হাত টানিয়া লইতেই টেবিল-ল্যাম্পের তারে লাগিল টান—টেবিল-ল্যাম্প ধরিতে গিয়া 'প্লাগটা' খুলিয়া আসিল, ঘর হইয়া গেল অন্ধকার।

এইবার সোমনাথ নিজেই যেন লজ্জিত হইল। নিজেকে একটু ধাতস্থ করিয়া সে ঘরের অন্য আলোটি জ্বালাইল। পাশেই বিছানা, অন্য কিছু না ভাবিয়া বিছানায় ক্লান্ত দেহ লইয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে রাজুকে ডাকিয়া নিজের কাছে বসাইল সোমনাথ। রাজুর তখনও মুখ ভার।

তুই কেন আমার উপরে রাগ করলি বল ত', দেখ্ আমার জ্বর এসে গেল, এই বলিয়া রাজুর হাতখানা সে নিজের কপালে রাখিল।

—জ্বর? সে কি? এই বলিয়া রাজু তাহার দাদার কপালে হাত দিয়া দেখিল।

—কোথায় জ্বর? না-না, জ্বর হয়নি।

—আমি বলছি, হ'য়েছে।

—বুঝেছি, আড়ি করেছি তাই বুঝি জ্বর? আচ্ছা আড়ি কেটে দিলাম। বল, জ্বর হয়নি।

—না। আচ্ছা হ্যাঁরে রাজু, তুই যাকে কুন্তলদি' বল্‌লি সেদিন, তারই সঙ্গে কাশীতে দেখা হ'য়েছিল না?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ সোমনাথ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। হাত নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, চাকরটা বলেছে কাশী, রাজুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কাশীতে, বাস্।

রাজু সোমনাথের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিয়া উঠিল, কি হ'য়েছে তোমার দাদা? কি ব'লছ?

অ্যাঁ, ও, কিছু না। আচ্ছা রাজু, আবার যদি আমরা কাশীতে বদলী হয়ে যাই।

—তবে যে আগ্রায় এলে?

—বা রে, বদলী ক'রে দিল যে। কাশীতে আমরা বেশ ছিলাম না রে?

এমন সময়ে মহামায়া রাজুকে ডাকিলেন। রাজু চলিয়া গেলে আলো নিভাইয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল সোমনাথ।

পরদিন সকালেই মোহনলালের চিঠি আসিল। সোমনাথ ভাবিয়াছিল সে আজ অফিসে যাইয়া মোহনলালকে চিঠি দিবে।

মোহনলাল লিখিয়াছে,—তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছি বিশেষ কাজে।

সাবিত্রীদেবীর কাছে যে চিঠি রেখে এসেছিলাম, তা হয়ত' পেয়েছ। তাতে আমার ঠিকানাও দিয়েছি। তোমার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হ'ল কিন্তু বহুক্ষণ ধ'রে কথা বলতে পারি নি। তার জন্য মনে বিশেষ বেদনা অনুভব ক'রছি। আগ্রায় যেয়ে আমার বন্ধুলাভ হ'ল। তা'ছাড়া লাভ ক'রেছি সাবিত্রীদের আত্মীয়তা। একই হোটেলে আমরা ছিলাম। সেদিনে এই পরিবারের কথা তোমায় কিছু ব'লেছিলাম। তোমার সঙ্গে আর কয়েকদিন আগে দেখা হ'লে, কত যে ভাল হ'ত। এঁদের সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতাম। মানুষকে আপন ক'রে নিতে এঁদের মত পূর্বে কাউকে দেখি নি। সাবিত্রীর কথাই বলি। তুমি হয়ত' তাকে দেখেছ, যদি ব্যবহার দেখিতে, মুগ্ধ হ'তে। আমি কয়েকদিন দিল্লীতেই থাকব। পরে দিল্লী থেকে বোধ হয় বোম্বাই যেতে হবে। তুমি এখানেই চিঠি দিও। যদি কখনও কাশী যাই, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আগ্রায় নিশ্চয়ই যাব,—ইত্যাদি। বাসার কুশল চাহিয়া মোহনলাল চিঠি শেষ করিয়াছেন।

একবার নয় বারবার চিঠি পড়িল সোমনাথ। সোমনাথের ভাল লাগিল না। সোমনাথের কাছে চিঠি অথচ সাবিত্রীর কথাই যেন চিঠিখানির প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মোহনলাল 'সাবিত্রী' 'সাবিত্রী' বলিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ ভাবিল মোহনলাল ভাগ্যবান। আবার ভাবিল তাহাতে তাহারই বা কি? কিন্তু এই কথাই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল, মোহনলাল লিখিয়াছে—'সাবিত্রী',—তবে কি সত্যই উনি কুন্তল নন? ইহা আর এক সমস্যা। রাজুর কথায় যে দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, মোহনলালের চিঠিতে তাহাতে আবার সন্দেহ বাসা বাঁধিল।

অফিসের বেলা বাড়িতে ছিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সোমনাথ অফিসে রওনা দিল। সোমনাথ অফিসে আসিয়াছে। কিন্তু কাজে মন লাগিতেছে না। মোহনলালের চিঠি না আসিলেই যেন ভাল হইত, ভাবিল সোমনাথ। আবার ভাবিল,

মোহনলালের সঙ্গে সাবিত্রীর নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই মোহনলালের বন্ধু হিসাবে সাবিত্রী তাহাকে গতকাল সকালে চা-পানে আপ্যায়ন করিয়াছে। সবই যেন কেমন তালগোল পাকাইয়া গেল। কুন্তল, সাবিত্রী, সোমনাথ, মোহনলাল, কাশী, আগ্রার হোটেল, তাজমহল,—কোথাও যেন কিছু দানা বাঁধিতেছে না।

কিন্তু এমনই বা কি ঘটিল! হোটেলে ভদ্রতার খাতিরে সাবিত্রী যদি সোমনাথকে আদর আপ্যায়ন করিয়াই থাকে তাহাতে এত অস্থির হইবার কি আছে? সাবিত্রী কে? কুন্তলই বা কে? ট্রেনে কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল? কে রাজুকে 'কুন্তল' নাম বলিয়াছিল? তাজমহলে সাবিত্রীর সঙ্গেই দেখা হইয়াছিল না কুন্তলের সঙ্গে?— সবই সমস্যার বিষয়। কিন্তু বলিতে চাই সোমনাথেরই বা ইহা লইয়া মাতামাতি করিবার এত ঔৎসুক্য কেন? ইহার উত্তর সে-ই দিতে পারে। সে-ই বলিতে পারে মোহনলালের প্রতি মনে মনে কেন সে আজ বীতরাগ,—কুন্তল-সাবিত্রী সমস্যা তাহার মনে কতখানি জট্‌ পাকাইয়াছে?

দুর্বল পুরুষ বাড়াবাড়ি করে সব কাজেই—সোমনাথেরও তাহাই হইয়াছে।

৯

কাশী। আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। শীতের সন্ধ্যায় অনুরূপা ও সাবিত্রী বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আগ্রার গল্প, মোহনলালের কথা, শ্রীরাধামোহনকে হয়ত' একবার দিল্লী যাইতে হইবে, বর্ধমান হইতে অনুরূপার বন্ধু তাঁহার ওখানে যাইতে বার বার লিখিতেছেন,—এই সব নানা বিষয় লইয়া কথাবার্তা হইতেছিল।

প্রসঙ্গ ক্রমে 'হিন্দু-কোড বিল' সম্বন্ধে কথা উঠিল। এই বিল

লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে, হইতেছে। 'না' এবং 'হ্যাঁ' এর দল এখনও তুমুল সংগ্রাম চালাইতেছেন।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বল বড়মা এই বিল পাশ হওয়া উচিত? ধর এখন বিয়ের এক রকম রীতিনীতি চলে আসছে। এই বিল পাশ হ'লে মেয়েদের সামাজিক অধিকারে পরিবর্তন আসবেই। সে পরিবর্তন ভাল হবে কি মন্দ হবে সেই হ'চ্ছে কথা।

অনুরূপা বলিলেন, মন্দ কেন হবে মা। আমাদের দেশের বিয়ের রীতিনীতি একান্ত ভাবে বদলান প্রয়োজন। এই বিল পাশ হ'লে দেশের অকল্যাণ হবে যাঁরা মনে করেন, দেশের সত্যিকারের হিত তাঁরা কোনদিনই চান নি। অনেকের মুখেই শুনতে পাই, মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক বেড়েছে, আজ কাল নাকি মেয়েরা চাকুরী করে, মন্ত্রী হয়,—কিন্তু দেশের গোটা নারী সমাজের সে কতটুকু অংশ? আজও আমাদের দেশের নারী সমাজের বৃহত্তর অংশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নতুন কিছু ধরতে গেলেই তার ভয়, পাছে নেশা ছুটে যায়, সে নেশা প্রাণের নয়,—মৃত্যুর। আচ্ছা তুই বলত' মা, সূর্য যখন ওঠে তখন পূবের দরজা বন্ধ ক'রে পশ্চাতের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকার অর্থ কোথায়?

সাবিত্রী কোন কথা কহিল না, এক দৃষ্টে তাহার বড়মার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনুরূপা আবার বলিতে লাগিলেন, স্বামীর খেয়াল, দু'টো খেতে পরতে দেওয়ার আজীবন দৌরাত্ম্য এবং শিক্ষাহীন স্ত্রীদের নিরেট জিদ, —এই বিল পাশ হ'লে, আমাদের দেশে কমে যাবেই। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষার প্রয়োজন কোন মতেই পরিহার ক'রবে না সমাজ। মেয়েদের প্রতি মেয়েদেরও শ্রদ্ধা ফিরে আসবে। মেয়ের বিয়ে দিতেও মা বাপের এত কষ্ট ভোগ ক'রতে হবে না।

সাবিত্রী এইবার হাসিয়া তাহার বড়মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বড়মা, আমাকে তুমি কি ভাবে বিয়ে দিতে চাও?

অনুরূপা উত্তর করিলেন, অশোকের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তা তুমি

হয়ত' টের পেয়েছ। বিয়ে ত' আমরা দেব না, বিয়ে তোমরা ক'রবে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঘরের মাতাপিতার বিয়ে দেবার এই নৃশংস দায়িত্ব আর যেন না থাকে। মেয়ে জন্মগ্রহণ করলেই,—'শেষকালে মেয়ে হ'লো'—এই বক্রোক্তি যেন আর শুনতে না হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনুরূপা হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, শুনবে কেমন ক'রে আমাদের বিয়ে হ'য়েছিল? বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেলাম দু'জনে। এক সঙ্গে প্রণাম জানালাম সুন্দরের দেবতাকে। ফুলের মালা হাতে তুলে দিলেন পুরোহিত। দু'জনে এক সঙ্গে অঞ্জলি দিলাম সেই মালা, সুন্দরের পায়ে। পুরোহিত আশীর্বাদী ফুল দিলেন। আমার ফুল ওঁকে দিলাম, ওঁর ফুল আমি পেলাম। গৃহে কয়েকজন বন্ধু এলেন, সাদর সম্ভাষণ হ'ল, মিষ্টি মুখ হ'ল—এই আমার এই জীবনের বিয়ে। আর ছোটকালে যে বিয়ে হ'য়েছিল, ওরে বাবা, সে কুড়িখানা গ্রাম জেনেছিল। বিয়ের আসরে পুরোহিতদের সে কি যুদ্ধ,—কুলীন বর আসন ছেড়ে উঠে যায় আর কি,—এখনও মনে আছে, উঃ—সে কি কাণ্ডই না হ'য়েছিল।

সাবিত্রী কহিল, আমি জানি আমার এক বন্ধুর বিয়েতে বন্ধুর বাবাকে সর্বসান্ত হ'তে হ'য়েছে। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্বেরা ভুরি ভোজনে উদর পরিতৃপ্ত ক'রলেন, বরের বাবা খাট-পালঙ্ক, বিছানা, বাসন, সেলাইএর কল, রেডিওসেট্ ও নগদ হাজার কয়েক টাকা সমেত বি-এ পাশ মেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। যাঁরা পড়ে রইলেন তাঁদের রাত্রে অরন্ধনের বিলাসে যে প্রায়ই পেয়ে বসত' তার ইতিহাস শুধু আমরাই জানতাম।

অনুরূপা ইহা শুনিয়া বলিলেন, এইজন্যই ত' মেয়ে বিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নান করার প্রথা আছে আমাদের। কন্যা এত বড় পাপ যে গঙ্গাস্নান ক'রে সেই পাপ মুক্ত হ'তে হয়। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। একটু উত্তেজিত হইয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, এই দুঃসহ অভিশাপ মাথায় ক'রে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে। আমরা গর্ব ক'রে থাকি আমাদের সনাতন শিক্ষার।

কিন্তু যে সামাজিক ব্যবস্থা এতদিন ছিল বা এতদিন সম্ভব হ'য়েছিল, আজকের এই অগ্রগতির দিনে সেই রীতিই কি আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে? তারপর আছে ত' অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য। কি অসহনীয় আয়োজন এই 'বিবাহ-পর্ব'। নগদ নজরানার কথা ছেড়েই দিলাম, তারপর রয়েছে সামিয়ানা, লাইট, চা, সিগারেট, লোকজন, হাঁক্‌ডাক্, লাউড স্পীকার, ভিয়ানখোলা, ইংরাজী বাংলা বাদ্য,—যেন বাড়ীতে এক সার্কাস্‌পার্টি খেল্ দেখাবে। ময়ূরপঙ্খী মোটরে, মাথায় সোলার টুপী পরে বর এলেন,—দর্শকেরা ভীড় জমাল, খেয়ে গেল, দু'কথা ভালমন্দ ব'লেও গেল। আর বেচারা মেয়ের বাবা, যেন কাঠগড়ার আসামী ;—অপরাধ,—ভাগ্যদোষে তিনি মেয়ের বাবা—সর্বত্র জোড়হস্ত। বাংলাদেশের মেয়েরা এই 'কন্যাদায়' অপবাদ আর কতকাল সহ্য ক'রবে? তোরা যে 'কন্যারত্ন' সে কথা তোরা ভুলে যাবি?—এই বলিয়া তিনি সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

সাবিত্রী কহিল, তুমি ঠিকই ব'লেছ বড়মা। শুধু সমাজের দোষ দিলেও ত' হবে না—দোষ আমাদেরও কম নয়। এত ভেঙ্গে পড়তে অন্য কোন দেশের মেয়েদের আমি দেখিনি। পদে পদে আমাদের ভয়। সকলের কাছে ভাল থাকার লোভ, অন্যায়কে স্বীকার করার দুর্বলতা, জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব গ্রহণ যে বিয়ে, সেটা আমাদের লজ্জার কারণ,—সব মিলে আমরা যে কি,—কোন কোন স্থলে বি-এ, এম-এ পাশ ক'রেও আমরা বুঝি না, বুঝবার চেষ্টাও করি না। তুমি বলছিলে নেশা, সত্যি এ আমাদের মৃত্যুর নেশাই বটে। আত্মবিস্মৃতির এই নিদারুণ সাচ্ছন্দ্য নিয়ে আমরা বেশ আছি, সুখে আছি।

অনুরূপা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, তাইত' মা আমরা ঠিক ক'রেছি তোমার বিয়ের ব্যাপারে আমরা কিছুই বলব না। তোমার যাকে ইচ্ছে, তোমার মনে যাকে তুমি সত্যিকারের আসন দিতে পার, তাকেই তুমি জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ ক'রবে। যে মতেই হ'ক না কেন মা, মনের মত ছাড়া কোন বিয়েই সিদ্ধ নয়।

তোমার মন্ত্র যেন আমাকে সেই পথেই নিয়ে যায় বড়মা। তুমি,

মেসোমশাই,—তোমরা নতুন পৃথিবীর বাণী বহন ক'রে চলেছ। কেন, কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বাংলাদেশ ছেড়ে এসে তুমি মেসোমশাইকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছ, তা আমি বুঝতে পারি। তুমি ভালবাসলে যাঁকে, তাঁকে তুমি পেলে না। যিনি তোমায় ভালবেসে কাছে টেনে নিলেন, তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলে তোমার জীবন-দেবতাকে। বড়মা, সত্যিই তুমি দেশের আগামী দিনের মেয়েদের বড়মা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, তোমার কথা তাদের কাছে যেন পৌঁছে দিতে পারি। বাংলা দেশের মেয়েদের 'দায়' মুক্ত হ'য়ে 'রত্ন' হবার মন্ত্র যেন আমি তাদের পৌঁছে দিতে পারি বড়মা।

এই বলিয়া সাবিত্রী প্রণাম করিল অনুরূপাকে। তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে ধরিয়া স্নেহ-চুম্বন করিলেন।

১০

চিঠি আসিয়াছে বর্ধমান হইতে—অনুরূপার বন্ধু লিখিয়াছেন। বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন বর্ধমান যাইতে। বন্ধুর অনুরোধ কোন বারই তিনি উপেক্ষা করেন নাই, এবারও করিবেন না ঠিক করিয়াছেন। এই বন্ধুর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথেই সাবিত্রীর সঙ্গে গতবার তাঁহার দেখা হয়। যথা সময়ে বাসার সমস্ত ভার সাবিত্রীর উপরে ন্যস্ত করিয়া অনুরূপা বাংলা মুলুকে রওনা দিলেন।

ঘটনাচক্রে কখন কি ঘটে বোঝাও কঠিন, বলাও সহজ নহে। অনুরূপা চলিয়া যাইবার পর, অল্প কয়েকদিন পরেই শ্রীরাধামোহন দিল্লী হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন। দিল্লীতে কোন কলেজে প্রফেসারীর কথা আগ্রা থাকিতেই দিল্লীর বন্ধুটির সহিত হইয়াছিল। শ্রীরাধামোহন সাবিত্রীকে সঙ্গে করিয়াই দিল্লী যাইবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী যাইতে চাহিল না। সাবিত্রীর এক মাসিমা দিল্লীতে থাকেন, আর তা'ছাড়া এই ত' সেদিন ছুটি লইয়া আগ্রা ঘুরিয়া আসিল;—এই সব মনে করিয়া সে শ্রীরাধামোহনকে একাই দিল্লী পাঠাইয়া দিল। বাসায় ঠাকুর, চাকর, ঝি আছে—অসুবিধার কিছুই নাই।

সাবিত্রী বাসায় একা। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু আগ্রার কথা ত' সাবিত্রী ভুলিতে পারে নাই। আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথারীতি সবই সে করিতেছিল, তবু আগ্রার তাজমহলকে কেন্দ্র করিয়া যে স্বপ্ন-বিলাস তাহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বেশীক্ষণ উদাসীন থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

রবিবার। দুপুর বেলায় শুইয়া নূতন মাসিক পত্রিকাখানা পড়িতেছিল সাবিত্রী। পড়িতে পড়িতে সোমনাথের একটি সাম্প্রতিক কবিতা চোখে পড়িল। অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এই কবিতার সুর মেলে না। আজিকার পৃথিবীর একটি লাঞ্ছিত রূপ যেন সোমনাথ ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছে। কবিতা পড়িয়া সোমনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় সাবিত্রীর মন ভরিয়া উঠিল।

স্ফীতকায় বর্বরতা সভ্যতার মুখোস্ পরা,
বেঁচে আছে মিথ্যার জয়ডঙ্কায়।
তার দম্ভের ভেকের পেট হয়েছে মোটা,
ফেটে যাবার আগের ফানুষের মত।
অবিরত যারা মানুষকে করে অপমান,
আপনারি হীনতার তুলাদণ্ডে,
দণ্ড দেয় যারা সুন্দরের দেবতায়।
তারা জানে না তাদের অন্তিম পাদক্ষেপ,
কোন অনন্ত অন্ধ-গহ্বরের মুখে।
তারা বোঝে না তাদের আরামের অভিশাপ
সাপের মত তাদেরই পা জড়িয়ে উঠেছে,
ফণা বাঁকিয়েছে।
আপনার বিষ-দংশে আপনি পড়বে ঢলে।
সেই মুমূর্ষু চীৎকারে,
বিধাতার আসন তবু টল্‌বে না।
এই চরম সত্য।

মোহনলালের অন্তরের বেদনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এই ছোট্ট কবিতায়। মোহনলালের বন্ধু সোমনাথ, তাঁহার ছোঁয়া হইতে বাদ যাবেন কি করিয়া,—এই কথাই ভাবিতেছিল সাবিত্রী। এমন সময়ে সুভদ্রা একখানা চিঠি দিয়া গেল।

চিঠিখানি মোহনলালের।

প্রিয় ভগ্নী সাবিত্রী,

আশাকরি কুশলে আছ তুমি, কুশলে আছেন মাসিমা ও মেসোমশাই। কাজের চাপে এতদিন পত্র দিতে পারি নি। জানই ত' ভবঘুরে লোক, কথায় ও কাজে সমতা রাখা সম্ভব হয় না। আমি শীঘ্রই ক'লকাতা যাচ্ছি। ফিরব কাশী হ'য়ে মনে ক'রেছি। আগামী ২৮শে তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার গাড়ীতে তোমাদের ওখানে পৌঁছিব। আমার বন্ধু সোমনাথ তোমার কথা লিখেছে। আগ্রায় হোটেলে তুমি তাঁকে আমার-বন্ধু বলে বিশেষ আপ্যায়িত ক'রেছ জেনে খুশী হ'য়েছি। সে লিখেছে, সে নাকি তোমাকে চেনে। তবে সাবিত্রী নামে নয়, কুন্তল নামে। তুমি নাকি ব'লেছ তুমি কুন্তল নও। ওর কিন্তু দৃঢ় ধারণা তুমিই কুন্তল, কোন ট্রেনে নাকি দেখা হ'য়েছিল তোমাদের। গিয়ে দেখাব কত বড় চিঠি ও আমাকে লিখেছে। ছেলেটি খুব ভাল। ওর সম্প্রতি প্রকাশিত 'চরমসত্য' এত ভাল লেগেছে আমার। এই মাসের 'মানসী'তে বেরিয়েছে। এখনকার কবিদের ত' আমাদের দেশে দাম নেই, তাই ওকে বিদেশী ফার্মে চাকরী ক'রতে হয়। যাই হোক সাক্ষাৎমত অন্যান্য সব কথা ব'লব এবং শুনব। আমি ভাল আছি। প্রণাম দিও মাসিমা ও মেসোমশাইকে। স্নেহাশীষ নিও তুমি। ইতি

তোমার মোহনলালদা'।

* * * *

২৮শে তারিখ আজ। আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে মোহনলাল আসিবেন। দিল্লী ও বর্ধমান হইতে পত্র আসিয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সকলেই আসিয়া পড়িবেন।

বাহিরের ঘরখানি উত্তমরূপে নিজের হাতে সাজাইয়াছে সাবিত্রী। মোহনলালের আহারের জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছে। ঠাকুর চাকর সকলেই আনন্দে দিদিমণির হুকুম মত কাজ করিতেছে।

মোহনলালের আগমন বার্তায় বাসার যেন নব-জীবন লাভ হইয়াছে। দীপালোকে স্নিগ্ধ বাহিরের ঘরখানি, ধূপগন্ধে আমোদিত। শুভ্র রজনীগন্ধার মৃদু-সৌরভে-পূর্ণ সান্ধ্য-সমীরণ অতিথিকে সাদরসম্ভাষণ জানাইতে বুঝি উন্মুখ।

আধঘণ্টা পূর্বে সাবিত্রী ষ্টেশনে গিয়াছিল, ট্রেন আসিল কিন্তু মোহনলাল আসিলেন না। কেন মোহনলাল আসিলেন না, ভাল লাগিল না সাবিত্রীর। বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিল সে। বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সোজা উপরের ঘরে চলিয়া গেল।

সকলেই বুঝিল যাঁহার আসিবার কথা ছিল তিনি আসেন নাই।

মোহনলাল আসিবেন বলিয়া সাবিত্রী আজ কম পরিশ্রম করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা, ঠাকুর, চাকর, সকলেই। কিন্তু মোহনলাল আসিলেন না কেন? সাবিত্রীর মনে এই প্রশ্নই বারবার জাগিতে লাগিল। মোহনলালের উপরে রাগও হইল যথেষ্ট। ভাবিল খুব কড়া করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দিবে। আবার ভাবিল, পরের ট্রেনেও হয়ত আসিতে পারেন; কাজের লোক, ঠিক সময়ে হয় ত' ট্রেন ধরিতে পারেন নাই। জানলায় দাঁড়াইয়া, বাহিরের আকাশে চাহিয়া, এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। সুভদ্রা ঘরে আসিল এমন সময়ে।

—দিদিমণি।

—কি রে সুভদ্রা,—এই বলিয়া সাবিত্রী পিছন ফিরিল।

সুভদ্রা কহিল, যে বাবুর আসবার কথা ছিল, তিনি বোধ হয় এসেছেন।

—কোথায়?

—বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঘরে এসে বস্‌তে ব'ললাম, তিনি ব'ল্লেন,—তুমি সাবিত্রীদেবীকে খবর দাও।

—ঘরে আলো—

—জ্বেলে দিয়েছি দিদিমণি।

যাক বাঁচা গেল, মোহনলালদা' নিশ্চয়ই ভীড়ের মধ্যে আমাকে দেখতে পান নি, বাসা চিনে আস্‌তেও তাই দেরী হ'য়েছে।

এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সে সিঁড়ি বাহিয়া নিমেষে নীচের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

—ঘরে আসুন মোহনলালদা', বা রে, বাইরে'দাঁড়িয়ে র'য়েছেন কেন ?

এই বলিয়া সে পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রীকে নমস্কার জানাইল সোমনাথ।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ সাবিত্রী সোমনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি !

সোমনাথের এই আকস্মিক আগমনে সাবিত্রী আশ্চর্য হইল।

—ভিতরে আসুন।

সোমনাথ কোন কথা না বলিয়াই ঘরে আসিল।

সাবিত্রী পর্দা ছাড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ, মোহনলাল আসে নি ?

—বসুন, আপনাকে প্রতি-নমস্কার জানান হয়নি, এই বলিয়া সাবিত্রী জোড়হাত করিয়া মাথা নোয়াইল।

না না, তাতে কি হ'য়েছে। কিন্তু মোহনলাল কই, সে আসে নি ?

—বসুন,—ব'লছি।

সোমনাথ বসিল।

আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি,—এই বলিয়া সাবিত্রী দ্রুত ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাবিত্রীর এ কি হইল ! অব্যক্ত আনন্দে সে যেন আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নববর্ষা সমাগমে ক্ষীণস্রোতা গিরি-নির্ঝরিণী বুঝি দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। কেন সোমনাথ আসিয়াছে, কেন আসিয়াই মোহনলালের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুহূর্তে সব কিছু যেন সাবিত্রীর কাছে দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

একটু পরে সে নির্মল প্রসন্নতায় ঘরখানি পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিল, বসিল সোমনাথের সামনে। অন্যমনস্ক ভাবে একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছকে কাছে টানিয়া, হাসিয়া সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর —কেমন আছেন বলুন।

—ভালই, মোহনলাল কোথায় ?

তিনি ত' কয়েকদিন আগেই এসেছিলেন। আজ চলে গেলেন। এইমাত্র তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।

হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোমনাথ বলিল, আজই চলে গেল ? কি অন্যায় বলুন ত' ? অথচ তারই জন্য আমি আগ্রা থেকে ছুটে আসছি। এই দেখুন চিঠি, আজই সন্ধ্যায় সে আমাকে এখানে আস্‌তে ব'লেছে, এই বলিয়া একবার কোটের পকেটে, একবার প্যাণ্টের পকেটে চিঠি খুঁজিতে লাগিল।

সাবিত্রীও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল এবং বলিল, থাক থাক আর চিঠি দেখিয়ে কি হবে ? চলে গেছেন যখন, উপায় ত' আর নেই।

'উপায় ত নেই' ব'ল্লেই হ'বে ? আমি তবে কেন এলাম ? এ সব ভবঘুরে লোকদের বিশ্বাস ক'রতে আছে ?

হাসিয়া সাবিত্রী কহিল, তা আপনি রাগ ক'চ্ছেন কেন, উত্তেজিতই বা হ'চ্ছেন কেন,—বসুন না ?

—আপনি হাস্‌ছেন ? কার না রাগ হয় বলুন ত' ? চিঠি অনুযায়ী অফিসে ছুটি নিয়েছি, আগ্রা থেকে কাশী এসেছি, অথচ আজই তিনি চলে গেলেন, চমৎকার আক্কেল মানুষের ?—এই বলিয়া হাতঘড়ি দেখিল সোমনাথ।

সাবিত্রী এবারে একটু কৃত্রিম গাম্ভীর্য প্রকাশ করিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, সত্যি মোহনলালদা'র এ ভারি অন্যায়। কিন্তু আপনি না বসলে, আমাকেও যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

ব'লছেন—বসছি, কিন্তু বসেই বা কি হবে ?

সোমনাথ বসিল। মহাবীর ট্রে করিয়া চা দিয়া গেল। সাবিত্রীও বসিল।

আবার চা কেন আনালেন, আমি এক্ষুনি চলে যাব যে।

বেশ ত' যাবেন, একটু চা খেতে কতক্ষণই বা সময় লাগ্‌বে। মোহনলালদা' এমন ক'রে আসতে বলে চলে যাবেন, আমিও ভাবতে পারি না, চা তৈয়ারী করিতে করিতে মুখ নীচু করিয়া বলিতে লাগিল সাবিত্রী। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় মুখে তাহার হাসি উপ্‌ছাইয়া পড়িতেছে।

চা-এর কাপ সোমনাথের সম্মুখে ধরিয়া সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, মোহনলালদা'র কাছেই ত' জরুরী কাজ আপনার?

—হ্যাঁ।

—কাশীতেই কাজ ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—মোহনলালদা' ত' চলে গেলেন, আপনার আসাটাই বৃথা হ'ল। তবে সে কাজে আমি কি আপনার কোন সহায়তা করতে পারি?

—আপনি?

—তাহ'লে হয়ত' বা মোহনলালদা'র ত্রুটির খানিকটা লাঘব হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া সোমনাথ কহিল, তার জন্যে আপনাকে আর বিপদে ফেল্‌তে চাইনে।

—কেন, এমন কি বিপদের কাজ সে?

—না না, আপনাকে দিয়ে কি ক'রে হবে। আপনাকে বারবার বিরক্ত কচ্ছি, কিন্তু যাকে দরকার তাকেই পাচ্ছি না।

সাবিত্রী এবারে হাসি থামাইতে পারিল না। একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, আপনার বোন রাজু কেমন আছে?

—ভাল।

—চা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল যে! আবার আমার উপরেও রাগ ক'রলেন।

—আচ্ছা আমি উঠি।

—এ আপনার অন্যায় কথা। মোহনলালদা'কে না পেয়ে তাঁর

বোনটির উপরে রাগ ক'রে যাবেন? ধীরে সুস্থে চা-টুকু খান। সম্ভব হ'লে মোহনলালদা'র কাজটা না হয় আমিই ক'রে দেব।

সোমনাথ নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইল। সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনার উপরে সত্যি আমি রাগ করি নি। শুধু ভাবছিলাম ওর কথায় বিশ্বাস ক'রে কেন এই কাশী পর্যন্ত এলাম?

এসে এমন কিছু জলে পড়েন নি। আর এসেই যখন পড়েছেন আপনার সমস্যাটার একটা সমাধান, আমাকেই ক'রে দিতে হবে।

—সমস্যা?

—হ্যাঁ, সাবিত্রী এবং কুন্তল সমস্যা ত'?

—আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?

—মোহনলালদা' বলে গেছেন।

—তাও বলে গেছে আপনাকে?

—বা রে, আমাকে নিয়ে এত কথা লিখেছেন তাঁকে, আর এইটুকু তিনি আমাকে ব'লবেন না?

—আপনাকে ব'লতে আমি কি তাকে লিখেছিলাম? এমন ক'রে সে আমাকে অপদস্থ ক'রবে ভাবতে পারি নি।

মোহনলালদা'র কথা থাক,—কহিল সাবিত্রী, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

—বলুন।

—আচ্ছা, সাবিত্রী যদি কুন্তলও হয় তাহ'লে আপনার কি?

এ প্রশ্নের জন্যে সোমনাথ প্রস্তুত ছিল না। তাইত, সে ত' একথা ভাবে নাই। সাবিত্রী যদি কুন্তলও হয় তাহা হইলে তাহার কি? এ কথার উত্তর সে কি দিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী পুনরায় বলিল, আপনি ত' আগ্রায় আমাকে ব'লছিলেন, কুন্তলের সঙ্গে আপনার ট্রেনে দেখা হ'য়েছিল,—

দেখুন যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি,—সাবিত্রীর কথার মধ্যেই বলিয়া উঠিল সোমনাথ।

—বলুন।

—ট্রেনে আমি কুন্তলকে দেখেছিলাম কি আপনার মত চেহারার অন্য কোন মেয়েকে দেখেছিলাম, জানি না। তবে সেই চেহারা আমি ভুলিনি। রাজুর মুখে কুন্তল নামটি শুনেছিলাম কাশীর বাসায় এবং সেদিন তাজমহলে। আমার মনে হয় কুন্তল আর কেউ নয়, সে আপনি। মোহনলাল এই সমস্যার একটা সমাধান ক'রে দেবে—তাই ব'লেছিল কাশী আস্‌তে। সমস্যা জানার ঔৎসুক্য ত' মানুষের থাকে। তবে সে যখন চলেই গেছে, তখন সে প্রশ্নের আর প্রয়োজন কি ?

—আপনি আমার সম্বন্ধে বৃথাই এত সব ভেবেছেন।

—মাপ্‌ করবেন, এবারে আমি যাব, এই বলিয়া সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল সাবিত্রী।

—তাই কি হয়, বসুন—, আপনি এখানে খেয়ে যাবেন যে।

—খেয়ে যাব—? আমি ?

—হ্যাঁ—দোষ আছে নাকি ?

—না, দোষ কিসের, আমাকে মাপ্‌ করবেন।

—আমার সব জোগাড়,—বসুন।

—সে কি ক'রে হবে ?

—কেন ?

—না, সে হয় না।

—খুব হয়, বসুন ত'। আমি ঠাকুরকে বলে আসি। এই বলিয়া সাবিত্রী ভিতরে চলিয়া যাইতে, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ফিরিয়া বলিল, আমি এখনই আসব, বসুন।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। সোমনাথ না বসিয়া পারিল না। অথচ বসিতে যে তাহার খুব ইচ্ছা ছিল তাহাও নয়। এই কথাই তাহার মনে বার বার আঘাত দিতে লাগিল, কেন মোহনলালের কথায় এই পর্যন্ত আসিলাম, কেনই বা এমন একটা হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলাম। সাবিত্রী যদি কুন্তলও হয়, তবু এমন করিরা এখানে আসা কি ঠিক হইয়াছে ? কিন্তু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া

সোমনাথের মন-প্রজাপতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, সে প্রসূন-পরাগ যে কাশী হইতেই মধু-গন্ধে আকর্ষণ করিতেছে,—মোহনলাল বা তাঁহার চিঠি ত' গৌণ। সাবিত্রীর প্রশ্ন, সাবিত্রী যদি কুন্তলও হইত তাহা হইলেই বা সোমনাথের কি ? —এ প্রশ্নের জবাব সোমনাথ কোথা হইতে দিবে।

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে,"—জীবনের কত ঘটনা বাদ পড়িয়া যায়, দাগ রাখিয়া যায় হয়ত' বিশেষ দিনের বিশেষ কোন ঘটনা। সেই দাগ মনে ছবি হইয়াই ফুটিয়া ওঠে। মন তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নিজের অজ্ঞাতে ভালবাসিয়া ফেলে। 'ভালবাসি' কথাটাও তাই বলা সহজ নয়। সোমনাথের পক্ষেও তাই কিছুই বলা সম্ভব হইল না। একা একা নির্জন ঘরে বসিয়া সে কত কিছুই ভাবিল। কিন্তু পালাইয়া গেলে বাঁচিয়া যায় তাহা তাহার মনে আসিল না, মনে আসেও না। আরশোলার আছে কাঁচপোকার রূপের আকর্ষণ, ভয়ও আছে। তাই আরশোলা যখন কাঁচপোকার কাছে ধরা পড়ে, আমরা কত জনে কত কথা বলি, কিন্তু আরশোলা ভাবতে ভাবতে কাঁচপোকার রূপ পায়। আশ্চর্য, নয় কি ?

একটু পরেই সাবিত্রী সোমনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সোমনাথ অর্থহীন চোখে চাহিল তাহার দিকে। সাবিত্রী শুধু কহিল, খাবেন আসুন।

সোমনাথ দ্বিরুক্তি করিল না। নিঃশব্দে সাবিত্রীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

আহার সমাপ্ত হইল সোমনাথের। সাবিত্রী তাহাকে নিজে বসিয়া থাকিয়া খাওয়াইয়াছে। সোমনাথ আহারান্তে পুনরায় বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে আসিল সাবিত্রী। কিন্তু সোমনাথের মনের সংশয় ত' গেল না। এখনও ত' কিছুই জানা হইল না। সে ভাবিল—যাক্, এবারে ভালয় ভালয় সরিয়া পড়া যাক, আর রহস্য ভেদ করিয়া কাজ নাই। কিন্তু তবু যেন যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অবশেষে কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ, আপনাদের বাসার আর সবাই কোথায় গেলেন ?

তবু ভাল এতক্ষণে লক্ষ্য পড়িল। মনের ভিতরে চলিয়াছে দ্বৈরথ সমর, তাই নয়ন শক্তি সংহার করিয়াছে। তাহা বুঝিয়া মৃদু হাসি মুখে সাবিত্রী কহিল, বাসায় আপাততঃ আমিই আছি একা। মেসোমশাই গেছেন দিল্লীতে, মাসিমা গেছেন বাংলাদেশে।

—বাংলাদেশে কোথায় আপনাদের বাড়ী, জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ।

—আমাদের বাড়ী ক'লকাতার কাছেই। বড়মাদের বাড়ী ছিল যশোর জেলায় মাগুরায়।

—মাগুরায় ? উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ।

—আপনি কি মাগুরা চেনেন্ ?

—আমাদের বাড়ীই যে সেখানে ছিল। মাত্র কয়েকদিন হ'ল পাসপোর্ট হবার মুখে আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি। বাবা মা দেশেই থাক্‌তেন।

বড়মা বাসায় থাকলে চিন্‌তে পারতেন বোধ হয় আপনাকে। দেশের কথা তিনি প্রায়ই বলেন। আপনাদের ওখানে ছোট্ট একটা নদী আছে না ?

হ্যাঁ 'নবগঙ্গা নদী', এসে মিশেছে কুমার নদের সঙ্গে। সেই ত্রিমোহনায় মাগুরা মহকুমা। ছোট্ট শহর, কি সুন্দর! কত স্মৃতি-কথাই না জড়িত আছে ওর পথ-ঘাট্, হাট্-বাজার, দোকান-পাটের সঙ্গে। ছোট নদীর উপরে 'নতুন বাজার', ঢেউ-খেলান টিনের ঘরে ঘরে ভরা। ওপারে বুড়ো বট্-পাকুড়ের গাছ, তার নীচে নদীর উপরে বাঁশের-শাঁকো। শুধু বাঁশ দিয়ে তৈরী প্রশস্ত পায়ে-চলার রাজপথ, রামধনুর মত ছুঁয়ে আছে নদীর এপার-ওপার। বর্ষাকালে ছোট নদী যখন জলের জোয়ারে ফেঁপে ওঠে, শাঁকোর বাঁশগুলি থর থরিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে, জোয়ারের যৌবন স্পর্শে সারা দেহ তার হ'য়ে ওঠে রোমাঞ্চিত।

সাবিত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ নজর পড়ায় সোমনাথ দেখিল সে তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। সোমনাথ লজ্জিত হইল। স্মৃতির স্রোতাবেগে এত কথা সে যে বলিয়া ফেলিবে বুঝিতে পারে নাই। সাবিত্রী বুঝিয়াছিল ইহা তাহার কবি মনের স্বতঃ-প্রকাশ। ভাল লাগিতেছিল সাবিত্রীর।

সাবিত্রী বলিল, থামলেন কেন, বলুন।

করজোড়ে সোমনাথ কহিল, ক্ষমা ক'রবেন, অনেক অবান্তর কথা ব'লে ফেলেছি। মোহনলালের জন্য, আগ্রাতে, আবার এখানেও, বারবার আপনাকে কষ্ট দিলাম।

—দাদার বন্ধুকে অযত্ন করলে দাদাকেই অশ্রদ্ধা করা হয়।

—আপনার যত্নের কথা ভুলে যাব না। মোহনলাল লিখেছিল, এমন ক'রে আত্মীয় ক'রে নিতে আমি আর কাউকেই দেখিনি,—দেখছি মোহনলাল এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। এইবার আমাকে যেতে অনুমতি করুন।

এই কথার কোন উত্তর না দিয়া সাবিত্রী কহিল, তাহ'লে ট্রেনের মেয়েটিকেই কুন্তল বলে আপনি ঠিক্ করে ফেলেছেন?

—কি যে ক'রেছি তা যেন আমি আপনাকে বোঝাতে পাচ্ছিনা। তবে ট্রেনের মধ্যে যাঁকে দেখেছিলাম, মনে হ'চ্ছে তাঁকেই যেন আমার সামনে দেখ্‌ছি,—তা তিনি কুন্তলই হন আর সাবিত্রীই হন।

—তাঁকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন নাকি?

—কবিতা! আপনি কি ক'রে জান্‌লেন আমি কবিতা লিখি?

—যেমন ক'রেই হ'ক জেনেছি। কিন্তু জানেন ত' কবিদের অনেকে পছন্দ করে না।

—অনেকের দলে তারা নয় ব'লে।

—মূল্যও দেয় না।

—অমূল্য জিনিষের মূল্য কে দেবে বলুন?

—এ আপনার দম্ভের কথা।

—যে স্রষ্টা তার একটু দম্ভ থাক্‌বে বৈ কি।

—সেটা ত' ভাল কথা নয়।

—স্রষ্টার দম্ভ তার সৃষ্টি, তার বেশী নয়।

—এ আপনার বাজে কথা।

—বাজে কথা ?

—তা নয় ত' কি ?

বেশ,—আচ্ছা রাত্রি বোধ হয় কম হ'ল না, যাবার সময় আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে যেতে চাইনে।

আপনি রাগ ক'রলেন ?

রাগ করার কি আছে।

সাবিত্রী ভিতরে ভিতরে বিশেষ কৌতূহল বোধ করিতেছিল। কেন যেন সোমনাথকে আরও রাগাইতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল।

দু'জনেই একটু চুপ্ করিয়া থাকার পর, সোমনাথ বলিল, নমস্কার, এবারে আমি যাই।

সাবিত্রী কৃত্রিম গাম্ভীর্য সহকারে সোমনাথকে কহিল, যাবেন ত' নিশ্চয়ই। আচ্ছা, কুন্তলই হ'ক আর যেই হ'ক, তাকে আপনার ভাল লেগেছে, বা তাকে যে কোন কারণে আপনি মনে রেখেছেন; আর আমার সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে, আমাকেই কুন্তল ধারণা ক'রলেন আপনি ? এ যেমন ছেলেমানুষী তেমন লজ্জার কথা।

কথাটা যে এতখানি শক্ত হইবে সাবিত্রী তাহা বুঝিতে পারে নাই। নিমেষে লাল হইয়া উঠিল সোমনাথের মুখ। এতক্ষণে সে কিসের মদির-মায়ায় আবিষ্ট ছিল ? সাবিত্রীর কথায় তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর করিল, আপনি ঠিকই ব'লেছেন, আমার লজ্জা রাখবার স্থান নেই। সত্যি হয়ত' আমার সব ধারণাই ভুল হ'য়েছে! তবে সব কিছু মিলিয়ে আপনাকেই ট্রেনের সেই মহিলাটি বলে আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছে।

কেন মনটা তাঁর জন্যে পড়ে থাকে তা হয়ত' আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবু ব'লব এ আমার ছেলেমানুষী নয়, এ আমার সব চেয়ে বড় সত্য। আমার নির্লজ্জতা আপনাকে ক্ষুণ্ণ ক'রেছে, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা ক'রবেন।

এই বলিয়া সোমনাথ করজোড়ে সাবিত্রীর মুখের দিকে অতি কষ্টে চাহিয়া দেখে, সাবিত্রীর কাতর চোখ দুইটি জলে টস্ টস্ করিতেছে। বিস্ময়-বিমূঢ় সোমনাথ হতবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল সেই নিশ্চল পাথরের মূর্তির দিকে।

১১

পরদিন সকাল। গতকালের কথা লইয়াই সাবিত্রী ও সোমনাথের আলোচনা চলিতেছে। সদ্য-স্নাতা, আলুলায়িত কেশ, নিটোল বাহুলতা, সাবিত্রীর এমন রূপ বুঝি কখনও দেখে নাই সোমনাথ।

সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল এবং একটু মৃদু হাসিয়া সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখছেন ?

সোমনাথ মনে মনে লজ্জিত হইল বটে, তবে লজ্জা ঢাকিবার সুন্দরতর প্রয়োগ রীতিও সে জানিত, তাই বলিল, এক ডুবুরী সাগরে ডুব দিত মুক্তো লাভের আশায়। মুক্তো সে পেল, সূর্যের দীপ্তিকেও ম্লান ক'রে দেয় সে মুক্তো, বলুন ত' মুক্তো ছেড়ে ডুবুরী তাকাবে কোন দিকে ?

—জানেন ত' মুক্তোর দিকে বেশী তাকালে চোখ নষ্ট হ'য়ে যায় ?

—তবু জানব মুক্তোর দিকে চেয়ে চেয়েই চোখ হারিয়েছি।

—আপনার সঙ্গে কথা ব'লে পারব না—কবিরা কথার সাগর।

—বাণী, ব্রহ্ম জানেন ত' ?

—না, তা আর জানতে চাইনা, তবে হ্যাঁ,—একটা কথা।

—কি ?

—আমার কুন্তল নাম এখানে কেউ জানে না, আপনি আমাকে সাবিত্রী ব'লেই ডাকবেন।

—বেশ, ডাকব।

—ভুলেও কুন্তল ব'লবেন না যেন।

—না।

—আপনাকে গতকাল খুবই আঘাত দিয়েছিলাম। এতখানি রূঢ় আমি কি ক'রে হ'লাম তাই ভাবি।

—সেই আঘাত, ফিরে গিয়েই কিন্তু কুন্তলকে আবিষ্কার ক'রেছে।

—আমি ভেবেছিলাম আপনি খুব রেগে যাবেন।

—রাগান মেয়েদের স্বভাব। আর রাগ ক'রলে মেয়েদের পরীক্ষায় পাশ করা যায় না।

—তা বটে।

এবারে না হাসিয়া পারিল না সাবিত্রী। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দু'হাতে উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশ লইয়া খোপা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, দেখলাম 'পাশ মার্ক' আপনি পেতে পারেন।

এমন সময়ে পিয়ন চিঠি দিয়া গেল একখানা। সাবিত্রী চিঠি খুলিয়া দেখিল চিঠি লিখিয়াছেন মোহনলাল। সোমনাথ কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় মোহনলাল আসিতে পারেন নাই, লিখিয়াছেন। তবে মোহনলালের অনুপস্থিতিতে যাহা সম্ভব হইল, আসিয়া পড়িলে তাহা কি রূপ লইত কে বলিতে পারে? এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সব রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তবে এই যে নব-পরিচয়,—যেন শঙ্করের ধ্যান-মূর্তির কাছে পার্বতীর আত্ম-নিবেদন—সম্ভ্রমের সৌন্দর্যে শান্ত।

চিঠি পড়া শেষ হইলে সাবিত্রী চিঠিখানি সোমনাথের হাতে দিল, পড়ুন।

—মোহনলালের চিঠি?

পড়ুন না।

চিঠি পড়িয়া বিস্মিত হইল সোমনাথ। সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আশ্চর্য, তবে যে ব'ল্লেন মোহনলাল এসেছিল এবং গত-কালই চলে গেছে।

—বলেছিলাম নাকি। ওটা আমার দোষ। তা ছাড়া আমার ত' কত দোষই আছে, হাসিদীপ্ত চোখে কহিল সাবিত্রী।

সাবিত্রীর চোখের হাসি লক্ষ্য করিল সোমনাথ, নিজেও হাসিয়াই উত্তর করিল, জানেন ত' নদীতে 'মাছরাঙা' পাখী উড়ে উড়ে মাছ ধরে। মাছের মনে পাখীর রং লাগে, মাছ উপর জলে ভেসে ওঠে, তখন পাখী তাকে ধরে,—আপনারা হ'লেন সেই 'মাছ-রাঙা' পাখী।

বা বা, এতও ভাবতে পারেন। আচ্ছা এবারে উঠুন, স্নানটা সেরে নেবেন—বেলা হ'য়েছে।

সোমনাথ উঠিল।

সাবিত্রীর উচ্ছ্বলিত নয়নে 'মাছরাঙা' পাখীর আবেশ তখনও কাটে নাই।

আহারে বসিয়া সোমনাথ সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, স্কুলে গেলেন না আজ ?

—না আজ আর যাওয়া হ'ল কই। শরীরটাও বিশেষ ভাল নেই। তারপর আপনার ভার ত' আর ঠাকুর বা সুভদ্রার উপরে দিয়ে যেতে পারিনে। এই বলিয়া সাবিত্রী সোমনাথের দিকে হাসিয়া চাহিল। ওকি আপনি ত' কিছুই খাচ্ছেন না! না-না ও ভাত ক'টি মেখে নিন্। ঠাকুর আর একটু মাছের কালিয়া নিয়ে এস।

—মাপ ক'রবেন আমি আর খেতে পাচ্ছি না।

—খাওয়া হ'য়ে গেল ? বেশ,—কি খেলেন তাহ'লে ?

—কত খেয়েছি দেখুন ত'।

—ওকি একটিমাত্র সন্দেশ, সে কিছুতেই হবে না। দেখি আমি তুলে দিচ্ছি।

—না না, দেবেন না।

সোমনাথের বারণ শুনিল না সাবিত্রী। নিজের হাতে আরও কয়েকটি সন্দেশ সোমনাথের থালায় উঠাইয়া দিল।

—কি করলেন দেখুন ত', এত কি ক'রে খাব ?

ভারি ত' ক'টি সন্দেশ। দেখুন একটা কথা ব'লছিলাম কি, যে

ক'টা দিন কাশীতে আপনার কাজ, হোটেলে না খেয়ে এখানেই খাবেন।

আহার শেষ করিয়া উঠিল সোমনাথ। এমন পরিতৃপ্তির আহার জীবনে কোনদিন তাহার হইয়াছে কিনা মনে করিতে পারিল না। আহার করিতে বসিয়া সে সাবিত্রীর আর এক নূতন রূপের সন্ধান পাইয়াছে। বিশ্রাম-শয়ানে সেই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানে না।

আজ বৈকালের চা-এর পর্ব একটু ঘটা করিয়াই হইল। ফিকে আকাশ রং এর শাড়ী পরিয়াছে সাবিত্রী। খোপায় দোলন চাঁপা ফুল। বেশের এমন কিছু পরিপাটি নাই, তবু সব কিছু মিলাইয়া কি যেন রহিয়াছে যাহাতে মন খুশীতে ভরিয়া যায়। কর্ম-ব্যস্ত রহিয়াছে সাবিত্রী।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সাবিত্রীর অসম্বদ্ধ অলকে দোলা লাগাইয়া যাইতেছে নর্ম-বিলাসী মুগ্ধ সমীরণ।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সাবিত্রী সোমনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, চলুন না বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখে আসি।

—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ?

—কেন, আপনিও কি মোহনলালদা'র মত ঠাকুর দেবতা মানেন না নাকি ?

—ঠাকুর দেবতা খুব যে মানি তাও নয়, আবার অশ্রদ্ধা করার মত সাহসও নেই। তবে আরতি দেখার কথা আলাদা।

—কেন, আলাদা কেন ?

—পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে এই আরতি। ধূপ-গন্ধের আকর্ষণে মনে আনন্দ-বেগের সঞ্চার হয়।—চলুন যাই।

দু'জনে বাহির হইল পথে। মাথার উপরে সন্ধ্যা আকাশের একটি বড় তারা,—সেও চলিয়াছে তাহাদের সঙ্গে, যেন পথ দেখান'র ভার পড়িয়াছে তাহার উপরে। কত দোকান-পাট পিছনে রাখিয়া, কত বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে দু'জনে। জীবনের সর্বপ্রথম

বন্ধুর পথ-পরিক্রমা,—পৌঁছাইবে তাহারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে। মাঝে মাঝে দু' একখানা গাড়ী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। মন্দিরের পথে ধর্মার্থীদের আনাগোনা এই সময়ে একটু বেশী হয়। পুণ্যকামী নর-নারী মন্দিরে ভীড় জমায়। সাবিত্রী ভাবিতেছিল, সত্যই কি জীবনের পথে আজ বাহির হইলাম ? সোমনাথ ভাবিতেছিল, জীবন যাত্রার প্রথম দিন এমন করিয়াই কি আরম্ভ হইল আজ! প্রশান্ত পবিত্রতায় মন্ত্র-মুখরিত মন্দির প্রাঙ্গনে ক্রমে আসিয়া পড়িল তাহারা। আরতি-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

সোমনাথ আর সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছে পাশাপাশি। সোমনাথ ভাবিল বিশ্বনাথের সামনে এই যে দাঁড়াইয়াছি দু'জনা, শুধু এই মুহূর্তই কি জীবনে সার্থক হইয়া থাকিবে না। কি অনির্বচনীয় আনন্দ, আবেশ-মধুর করিয়া তুলিয়াছে সন্ধ্যারতির পূত পরিবেশ। সাবিত্রীও ইহা অনুভব করিতেছিল, প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। আরতি শেষ হইল, উভয়েই প্রণাম করিল।

পথ চলিয়াছে দু'জন। আনন্দ-আবেশে ভরপুর মন, কেহই কোন কথা কহিতে পারিতেছে না। কে আগে কথা কহিবে, কি কথা কহিবে, কেহই যেন তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। অথচ মনে হইতেছে কত রহিয়াছে কথার ভাণ্ডার, অনন্তকাল ধরিয়া বলিলেও বুঝি তাহার শেষ নাই। তবু তাহারা নীরব। কেহ বাধা দিবার নাই, কেহ কিছু বলিবার নাই, উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত বিহঙ্গ যেন তাহারা, কিন্তু কল-কণ্ঠ-কাকলী এমন করিয়া স্তব্ধতায় মুখর হইয়া উঠিল কেন ? প্রশান্ত প্রকৃতি নীরব স্নিগ্ধতায় পূর্ণ, দূরের আকাশে শুক্লা দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ যেন মায়া রচনা করিয়াছে। তন্দ্রাঘন নয়ন আলোকস্নাসে অধীর। মনের মণিকোঠার দরজা খুলিয়া গিয়াছে, তাই বাহিরের দুয়ারে সাড়া নাই। নিবিড়তার পরম মুহূর্তগুলি কেমন করিয়া নিঃশব্দে কথা কহিয়া গেল, শুধু যাহারা বুঝিল, তাহারাই জানিল। বাসায় ফিরিয়া আসিল দু'জনা।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই সাবিত্রা ঘরের আলোগুলি জ্বালাইয়া দিল,

খুলিয়া দিল সব জানালা। আলো আর বাতাসে ঘর ভরিয়া গেল। মুগ্ধ বাতাস বুঝি বলিল, আমি আসিয়াছি সপ্ত-সমুদ্রের বাণী বহন করিয়া। স্নিগ্ধ আলো যেন বলিয়া উঠিল, আমি আসিয়াছি সপ্ত-স্বর্গের সুধা বহন করিয়া। শুধু অকারণ পুলকে মন-বীণা বারেবারে 'কোমল-নিখাদে' বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

১২

পরদিন। অনুরূপার চিঠি আসিয়াছে। তিনি আগামী কাল রাত্রির গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সাবিত্রী সোমনাথকে তাই যাইতে দেয় নাই। বড়মার সঙ্গে দেখা করিয়াই সোমনাথ যাইবে। অবশ্য সোমনাথের ছুটি এখনও আছে।

সূর্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। তাহার শেষ রাঙা রশ্মি এখনও আকাশ হইতে মিলাইয়া যায় নাই। মন্দিরের চূড়ায়, মস্‌জেদের মিনারে, এখনও বুঝি লাল রংএর ছোঁয়াটুকু লাগিয়া আছে। সাবিত্রী ও সোমনাথ আজও বাহির হইয়াছে পথে। এই বারাণসীর পথ-প্রান্তর ত' দু'জনারই জানা, তবু এত সুন্দর ত' পূর্বে কোনদিন বোধ হয় নাই। ক্রমে উহারা জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হইল।

স্বচ্ছ কাশীর গঙ্গা।

আর গঙ্গার ঘাট? কি সুন্দর হইয়াছে দেখিতে। উপর হইতে সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে গঙ্গা গর্ভে। অগণিত নর-নারী। কোথায়ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কলতান, মুখরিত গঙ্গাঘাট। ঘাটের পাশে বড় বড় বজরা, অন্য পাশে অসংখ্য বিহার-তরণী, মৃদু তরঙ্গে দোল খাইতেছে। একদিকে ধর্মলোভাতুরদের স্নান-তৎপরতা, অন্যদিকে সৌন্দর্য পিয়াসীদের অস্থির আনন্দ আয়োজন। সব মিলিয়া স্নানের ঘাট এক অপূর্ব প্রাণ-চঞ্চলতায় ভরিয়া আছে। সন্ধ্যা-পূর্ব-সমীরণে মৃদু তরঙ্গিত কাশীর গঙ্গা মনে আনন্দ-হিল্লোল জাগাইয়া তোলে। মন-সুরধুনী বুঝি মলয়া-নীলে নৃত্য করিয়া ওঠে।

সাবিত্রী কহিল, যাবেন ? চলুন বেড়িয়ে আসি নৌকোয়।

সোমনাথের কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সাবিত্রী সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুটা নীচে নামিয়া আসিবার পর সাবিত্রী পিছন ফিরিয়া দেখিল সোমনাথ তখনও উপরে দাঁড়াইয়া আছে। সাবিত্রী তাহাকে ডাকিল, কই আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

সোমনাথ নামিয়া আসিল। নৌকা ঘাটে বাঁধাই ছিল—বাঁধাই থাকে। একখানা মনোমত নৌকায় তাহারা উঠিয়া বসিল।

নৌকা উজানে চলিল।

এমন কত জনেই ত' নৌ-বিহারে আসিয়াছে। গঙ্গার বক্ষ অজস্র কলগানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও নৌকা মাঝ-গঙ্গায়, কাহারও নৌকা ভাটিতে গা এলাইয়া দিয়াছে, কেহ কেহ আবার জোরে বাহিয়া চলিয়াছে। আমাদের সাবিত্রী ও সোমনাথের নৌকা কোন্ দিকে গেল দেখিতে হয়। উহারা উজান বাহিতে সুরু করিয়াছে—উজানেই চলিয়াছে। মাঝিকে বিশ্রাম করিতে দিয়া সোমনাথ নৌকার হাল ধরিল। আবার সোমনাথকে সরাইয়া দিয়া সাবিত্রী ধরিল হাল, দেখিলে মনে হয় এ যেন প্রাণের স্পন্দন-অজস্রতা, কোন্ দিকে ফাটিয়া পড়িবে বুঝিতে পারিতেছে না।

চুপ করিয়া বসিল দু'জনে পাশাপাশি। নৌকা চলিয়াছে। অনেকক্ষণ কথা নাই, শুধু গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি, আর মাঝে মাঝে বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দ।

সাবিত্রী প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে একটু হাসিয়া কহিল, জানেন ত ?

—কি ?

—'প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না'।

—জানি।

সাবিত্রী হাস্যোজ্জ্বল নয়নে আবার কহিল, আচ্ছা আপনি ত' লেখেন, ধরুন তাদের মত ক'রে গঙ্গায় কেউ কেউ যদি সাঁতার কাটে, আপনি কি লিখবেন ?

সোমনাথ দেখিল উত্তরের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে সাবিত্রী। সে বলিল, আমি লিখব, সাবিত্রী ডুবিল, আর—

সাবিত্রী সোমনাথের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, সোমনাথও ডুবিল,—কেমন তাই না ?

এই বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিল সোমনাথ। তাহাদের হাসির লহরী-পক্ষ বুঝি গঙ্গা বক্ষে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-কল্লোল জাগাইয়া তুলিল।'

পরদিন আবার পথ। পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে সোমনাথ আর সাবিত্রী। তাহারা আজ একটু সকাল সকালই বাহির হইয়াছে। সাবিত্রী তাহার সব কথা সোমনাথকে বলিয়াছে। শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে সোমনাথের মন। শহর ছাড়াইয়া নির্জন গ্রামের পথে তাহারা আগাইয়া চলিল। শহরের উপকণ্ঠের গঙ্গার ধারের মেঠো পথ কত যেন পবিত্র মনে হইল। চলিয়াছে দুইজনে পাশাপাশি।

সোমনাথ ডাকিল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী মুখ উচু করিয়া চাহিয়া কহিল,—বলুন।

—তোমাকে আর 'আপনি' বলব না।

—বেশ ত'।

—তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার অতীত ইতিহাস শুনে ঘৃণা করব,—না ? তুমি ত' জান না তোমাকে পেতে হ'লে ভাগ্যের প্রয়োজন।

—তাই নাকি !

—কি সম্পদ আছে আমার যাতে তোমার মত মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করে নিতে পারি ?

—সম্পদ,—আপনার শিক্ষা, সম্পদ আপনার কবি-দরদী মন, সম্পদ আপনার কর্তব্য জ্ঞান। তার পরিচয় আমি পেয়েছি আপনার মধ্যে, আপনার লেখায়, আপনার কথায়, ব্যবহারে—আপনার কর্তব্য-সম্পাদনে। আপনি জানেন না কি দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। অনেকে হয় ত' অনেক কিছু মনে

ক'রবেন,—কিন্তু আপনাকে কিছু গোপন করা ত' আমার চলবে না সোমনাথবাবু, গোপন করিও নি।

—সাবিত্রী, তোমাকে ভালবাসি, সব কিছু ভাললাগে তোমার। তোমাকে আমি পেয়েছি—এই আমার চরম পাওয়া। আর কোন প্রশ্ন আমার নেই।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়াছে।

সোমনাথের কথা শুনিয়া সাবিত্রী উত্তর করিল, সোমনাথবাবু, ভালবাসা এক, ভাল লাগা আর। তারপর আছে বিয়ে। বড়মার কথাই বলি, অনেককে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সকলকেই বিয়ে করা যায় না। ভাললাগা অন্ধ-বিচার করে, সে শুধু স্বপ্ন দিয়ে রচনা করে রঙ্গীন রামধনু। কিন্তু বিয়ে, তার দায়িত্ব অনেক। লোকে বলে ভালবাসা ক'রে বিয়ে হয় না। আমি বলি সে কথা সত্য নয়। ভালবাসায়-ঘটা যে বিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, দেখবেন সে ভালবাসায় আছে গলদ্। আসলে সে ভালবাসাই নয়। সে শুধু ভাললাগার উচ্ছ্বাস। বিয়ের পরের নৈকট্য সেই উচ্ছ্বাসের অন্ধ-আবরণ দেয় খুলে—সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবন ভুলের মাশুল গোনে। তাই ভালবাসব যাকে, তার দোষ-ত্রুটি নিয়েই ভালবাসব। যে ভালবাসবে তারও ঠিক অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়েই ভালবাসতে হবে। তা হয় না বলেই, ভাল লাগার উচ্ছ্বাসে যে বিয়ে হয়, তা বিয়ের পরে সুষ্ঠু সংসার গড়তে পারে না। বড়মা আরও বলেন, প্রকৃত ভালবাসা বিয়ের চেয়ে বড়—বিয়ের দায়িত্ব ভালবাসার আঙ্গিক।

পথের আজ যেন শেষ নাই, তেমন নাই কথার। সাবিত্রীর কথা শুনিয়া সোমনাথ কোন কিছুই কহিতে পারিল না। শুধু বারবার এই কথাই মনে করিয়া গর্ব অনুভব করিতেছিল, কেমন করিয়া সাবিত্রীর সন্ধান সে পাইল।

গঙ্গার ধার দিয়া পথ চলিয়াছে। গঙ্গায় আজ তরঙ্গ নাই, শান্ত সমীরণ শুধু তাহার সুখ-স্পর্শ অঙ্গে ঢালিয়া দেয়।

শহরের অনতিদূরে ছোট্ট গ্রাম—তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে

সোমনাথ আর সাবিত্রী। এদিকের গ্রামগুলি ঠিক বাংলাদেশের মত নয়। মাটির ঘর, দেওয়াল, ছাদ, সব মাটির। ছোট ছোট ঘর গায়ে গায়ে লাগান। অনেকগুলি গৃহস্থ এক জায়গায়। এক এক মহল্লার অনেকগুলি বাড়ী লইয়া একটি গাঁও। তাহার মধ্যেই যাহার অবস্থা একটু ভাল একটা ছোট্ট দালান তাহার বাড়ীতে। গ্রামের পাশে বা মধ্যে শিব-মন্দির বা মসজেদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। সাবিত্রী ও সোমনাথ এমনই একটি গ্রামের পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল। অফুরন্ত তাহাদের কথা, অবাধ মনের প্রসন্নতা। জীবনের উপকূলে যেন দুইটি তরঙ্গ জোয়ারের যৌবনবেগে নাচিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে অকূল সমুদ্র, এক সঙ্গে পাড়ি জমাইবে।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা লাগিয়াছে। গ্রামের শেষে শিব-মন্দিরে আরতি-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গ্রামবাসীরা দেবতাকে ভক্তি ও প্রণাম জানাইতে জড় হইয়াছে। বিদ্যুৎ-আলোক নাই, তবু সন্ধ্যা-প্রদীপে উজ্জ্বল—স্থানটি মনোরম মনে হইতেছিল। শিবের মন্দির,—তাহার সম্মুখে চত্বর, পাশেই ফুলের বাগান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানুষ ইচ্ছা করিয়া দেবভূমি তৈয়ারী করিয়াছে।

সোমনাথ ও সাবিত্রী ভীড়ের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল। সকলের সঙ্গে শিব-সুন্দরকে প্রণাম করিল। আরতি শেষে পুরোহিত সকলকে আশীর্বাদী ফুল দিলেন, 'জয়-শিব-শঙ্কর' বলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সকলে চলিয়া গেল। সোমনাথ ও সাবিত্রী তখনও দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুরোহিত তাহাদিগকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। শিবের মন্দিরে উঠিয়া আসিল তাহারা। পুরোহিতকে বলিল, তাহারা শিব-সুন্দরের পায়ে ফুলের মালা অঞ্জলি দিবে। পুরোহিত মালা দিলেন।

সাবিত্রী নিজেদের কথাও বলিল পুরোহিতকে। তাহারা ফুলের মালা লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সুন্দরের পায়ে অঞ্জলি দিল। শিবমূর্তিকে প্রণাম করিল এক সঙ্গে। পুরোহিত তাহাদের হাতে দিলেন শুভমিলনের আশীর্বাদী ফুল। সোমনাথ তাহার ফুল দিল

সাবিত্রীকে, সাবিত্রী তাহার ফুল দিল সোমনাথকে। নিস্তব্ধ মিলনতীর্থ নূতন বিবাহ মন্ত্রে নন্দিত হইল। সাবিত্রীর হাত ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিল সোমনাথ, দেখিল অনন্ত বিশ্বের শুভঙ্করী, সহস্র নক্ষত্র-প্রদীপে বধূবরণের আয়োজন করিয়াছেন।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ। নূতন পথের যাত্রীর যাত্রা সুরু হইল আজ। নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন জীবনের অজস্রতা। একটু অগ্রসর হইতে উহারা দেখিতে পাইল পথে পথে অজস্র আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদূরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। মন্দিরের আরতি-বাদ্যের দূরাগত ধ্বনি বুঝি নব-দম্পতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে।

* * * *

প্রসঙ্গক্রমে হয় ত' বলিতে শুনিব—ইহা কি একটা বিবাহ না কি! নূতন বিবাহ, নূতন বিবাহ বলিলেই নূতন বিবাহ হইবে? অপরিণত মনের উচ্ছৃঙ্খল পরিচয় ছাড়া ইহাকে আর কি আখ্যা দেওয়া চলে? ঢোল-শানাই বাজিল না, রসগোল্লা-সন্দেশের ভিয়ান চড়িল না, উচ্ছিষ্ট গেলাস পাতায় পথের আবর্জনা বাড়াইয়া তুলিল না, আড়াই সের বেলকাঠের আগুনে পাঁচ সের ঘি পুড়িল না, মেয়ের বাবা জোড়হস্ত করিয়া জনে-জনের কাছে কৃপা ভিক্ষা করিলেন না, কেহ জানিল না, শুনিল না, ইহা আবার কেমন বিবাহ?

কিন্তু বলিতে চাই বিবাহটা হইবে কাহাদের? কেহ জানুক আর নাই জানুক—যাহাদের জানা সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, তাহারা জানিতে পারিল কি না সেইটাই আসল প্রশ্ন।

একদিন সকলে জানিল এবং জীবন ভরিয়া দু'টি প্রাণী অজানা থাকিয়া প্রাণপাত করিল, তাহা হইতে দু'জনে দু'জনকে জানিয়া জীবন ভরিয়াও যদি সাধারণের কাছে অজানা থাকিয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কোথায়? বাংলার-প্রাণ, অসংখ্য মধ্যবিত্ত কন্যাদায়-গ্রস্ত গৃহস্থদের কথাই বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক বিবাহ প্রথা কি আরও সহজ করা চলে না? সংস্কারকে উড়াইয়া দিতে বলি না—কিন্তু

তাহারও সময়োপযোগী সংস্কার প্রয়োজন, এই কথাও আজ উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

*   *   *   *

সাবিত্রী ও সোমনাথের শুভ মিলন যে অনাড়ম্বর প্রথায় আজ সম্পাদিত হইল তাহাতে তাহাদের বিবাহ অসিদ্ধ হইয়াছে ইহা আর কেহ মনে করিলেও, তাহারা করে নাই। জীবনের পরম মুহূর্ত্তটিতে তাহারা শিব-সুন্দরের আশীর্বাদ কামনা করিয়াছে। যেমন করিয়া পার্বতী শঙ্করের মিলন কামনা করিয়াছিলেন, তেমন করিয়াই উমা হইবার মন্ত্র কামনা করিয়াছে সাবিত্রী। সোমনাথের মধ্যে সেই সুন্দরই বুঝি আজ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শিবের মন্দিরে সোমনাথকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল সাবিত্রী—সোমনাথ দিয়াছে তাহাকে তাহার আশিস-কুসুম। সেই কুসুম-সম্ভার সাবিত্রীর জীবনের পরম সম্পদ।

একসঙ্গে পুরোহিতকে উহারা প্রণাম করিল। পুরোহিত কহিলেন, আমার শিবপূজা বুঝি সার্থক হ'ল আজ। তাই মন্দিরে আজ শঙ্কর-পার্বতীর আবির্ভাব। তোমরা সুখী হও, তোমরা সুন্দর হও।

পথে আসিতে আসিতে শুধু এই কথাই সাবিত্রীর মনে হইতেছিল, এই যে আরম্ভ হইল আজ নূতন জীবনের পথ-যাত্রা, সম্মুখের সহস্র আলোক-আশীর্বাণী যেন তাহা জীবন ভরিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

*   *   *   *

রাত্রি হইল উহাদের বাসায় ফিরিতে।

আজ আবার অনুরূপা আসিবেন তাহা সাবিত্রী ভুলিয়া যায় নাই। সে সোমনাথকে বলিল, জীবনের পরম দিনটি আমাদের বড়মা না হ'লে যেন সম্পূর্ণ হ'ত না। কত যে ভাল লাগছে, বড়মা আজই আসবেন। গাড়ী আসতে আর আধঘণ্টা আছে, চল ষ্টেশনে যাই।

—ক'টায় গাড়ী, জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ।

—সাড়ে ন'টায়,—উত্তর করিল সাবিত্রী।

—চল তাহ'লে আর দেরী করা চলবে না।

—ছ'জনে আবার ষ্টেশন অভিমুখে রওনা দিল।

ষ্টেশনে পৌঁছাইবার মিনিট পনের পরেই কলিকাতার গাড়ী আসিল। অনুরূপা গাড়ী হইতে নামিলেন। সামনে সাবিত্রীকে দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। অনুরূপাকে প্রণাম করিল সাবিত্রী, প্রণাম করিল সোমনাথ।

ছেলেটি কে মা,—জিজ্ঞাসা করিলেন অনুরূপা।

সোমনাথ তাঁহার কথার উত্তর দিল, আমি সোমনাথ, মোহনলালের বন্ধু।

মোহনলাল এসেছে নাকি, অনুরূপা জানিতে চাইলেন। সবাই গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে অনুরূপা সাবিত্রীর কথা, বাসার কথা, শ্রীরাধামোহনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবিত্রীও অনুরূপার কুশল সংবাদ জানিল। ক্রমে ক্রমে কথায় কথায় গাড়ী বাসার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জনেই গাড়ী হইতে নামিলেন। ঠাকুর, সুভদ্রা, মহাবীর আগাইয়া আসিল। সকলেই মাইজীকে প্রণাম করিল। সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন অনুরূপা।

বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই ঘরখানির উপরে নজর পড়িল অনুরূপার। দেখিয়া তিনি তৃপ্তিবোধ করিলেন এবং সোমনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, জান বাবা সোমনাথ, সাবিত্রীকে একা রেখে গিয়েছিলাম, কত যে ভেবেছি। কিন্তু যে সংসারে ও যাবে তাকে ও সুন্দর ক'রেই তুলবে। তুমি একটু ব'সো বাবা, ট্রেনের ধূলোমাটিগুলো ভারি অস্বস্তিকর লাগছে। এসে তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করব'খন। এস মা সাবিত্রী।

সাবিত্রীকে সঙ্গে করিয়া তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন। সোমনাথ এই প্রথম অনুরূপাকে দেখিল। এমন মাতৃ-মূর্তি সে পূর্বে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কতটুকুই বা দেখা, আর কতটুকুই বা পরিচয়, মনে হইল এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে কি অসামান্য আত্ম-প্রত্যয়ের ইঙ্গিতই না তিনি করিয়াছেন। স্নেহ-পূর্ণ মনের অনাবিল অভিব্যক্তি মুহূর্তে যে সোমনাথকে তাঁহার কাছে টানিয়া

লইল, তাহা বুঝিতে সোমনাথের সময় লাগিল না। স্বর্গের মন্দাকিনী হয় ত' কেহ দেখে নাই, কিন্তু অনুরূপার অন্তর্বাহিনী মন্দাকিনীর স্বচ্ছ স্রোত-প্রবাহ সোমনাথ অনুভব করিতে পারিল। শ্রদ্ধাভারানত মনে সে বারবার তাই অনুরূপাকে প্রণাম না জানাইয়া পারিল না।

ইহার মাঝে সাবিত্রী একবার আসিল বাহিরের ঘরে, দেখিল সোমনাথ একমনে কি যেন ভাবিতেছে।

—কি ভাবছ ?

—অ্যাঁ, না কিছু নয়।

—হাত মুখ ধুয়ে নাও লক্ষ্মীটি, আমি সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—সাবিত্রী চলিয়া যাইতেছিল, সোমনাথ ডাকিল, শোন।

—কি ? কাছে আসিল সাবিত্রী।

—না, তুমি,—আচ্ছা যাও।

এই বলিয়া সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিল সোমনাথ। মৃদু হাসিয়া সাবিত্রী কহিল, আমি সুভদ্রাকে পাঠিয়ে দেই—কেমন ?

তৃপ্তির উষ্ণতায় যেন ঘরখানি ভরিয়া গেল। সুভদ্রা আসিল। সোমনাথের হাতমুখ ধুইবার, কাপড় ইত্যাদি পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইল। কিছুক্ষণ বাদে অনুরূপা নিজেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

এস বাবা, খাবে এস।

অনুরূপার সঙ্গে সোমনাথ আহার করিতে গেল।

আহারান্তে সোমনাথ বাহিরের ঘরেই বিশ্রাম করিতেছিল। আহারাদি সমাপন করিয়া অনুরূপাও বাহিরের ঘরে আসিলেন। সোমনাথের সামনে একখানা চেয়ারে বসিলেন তিনি। একটু পরে বলিলেন, কি খেলে কিছুই ত' দেখতে পেলাম না ভাল ক'রে।

—প্রচুর খেয়েছি বড়মা, বলিল সোমনাথ।

আমি সব শুনেছি সাবিত্রীর মুখে, বলিলেন অনুরূপা, আমি খুব খুশী হ'য়েছি বাবা। সাবিত্রী তার যোগ্য পাত্রই গ্রহণ ক'রেছে। সাবিত্রী সাধারণ পর্যায়ের মেয়ে নয়, ওকে জীবনসঙ্গিনী পেয়ে তুমি সুখী হবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমাদের মিলন-গ্রন্থি তোমরাই

পরেছ। আমি ত' মনে করি—জীবনের এত বড় উৎসব লোকজন ডেকে হয় না বাবা। তোমরা বাংলা দেশের ছেলেরা, মেয়েদের সত্যিকারের সম্মান তোমরা ছাড়া আর কেউ ত' দিতে পারবে না। তোমাদের কাছে আজ আমার অনেক দাবী।

চুপ করিলেন অনুরূপা। সোমনাথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল তাহার কথা। অনুরূপা জিজ্ঞাসা করিলেন সোমনাথকে, সাবিত্রী বলছিল তোমাদের বাড়ী নাকি যশোর জেলায়, মাগুরায় ?

—হ্যাঁ, মাগুরাতেই আমাদের বাড়ী ছিল। মহিম চক্রবর্তীর ছেলে আমি।

অনুরূপা অকস্মাৎ আর্ত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি ব'ল্লে— মহিম চক্রবর্তীর ছেলে তুমি ? তোমার নাম শঙ্কর ?

হ্যাঁ, শঙ্কর আমার ডাক নাম,—বলিয়া বিস্ময়-বিহ্বল সোমনাথ অনুরূপার দিকে চাহিয়া দেখে,—অনুরূপা স্থিরনেত্রে নিস্পন্দ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন।

অন্তর-আকাশের অপরাহ্ন-কালবৈশাখী, বুঝি বা মুহূর্তে বাহিরের সব কিছু সংহৃত করিয়া লইল। অনুরূপার এই মূর্তি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সোমনাথ ভীত হইল। অনড় অনুরূপার দেহ। বিস্ফারিত সূচী-তীক্ষ্ণ নয়ন, আনন্দ-বেদনার কি সুগভীর রহস্য সোমনাথের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে !

আশঙ্কা-আর্ত সোমনাথ অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে অনুরূপাকে ডাকিল, বড়মা, আপনি কথা বলছেন না কেন ? শুনুন, হ্যা আমিই শঙ্কর, মহিম চক্রবর্তী আমার বাবা।

অনুরূপা হঠাৎ সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সোমনাথের ডাকে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তিনি শান্ত কণ্ঠে সোমনাথকে বলিলেন, আমার বাপের বাড়ী ওখানেই ছিল কি না। তোমাদের ছোটকালে হয় ত' আমরা দেখেছি। সে ত' আজকের কথা নয়, সব ঠিক মনেও নেই। তাই ভাবছিলাম,—মহিম

চক্রবর্তীর বাড়ী কোনটা। তোমার বাবাকেও আমি চিনতাম—সে আজ অনেক দিনের কথা।

আমার নতুনমাকে আপনি দেখেছেন?—জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ।

শুনেছিলাম তোমার বাবা আবার বিয়ে ক'রেছেন। তোমার নতুনমাকে আমি দেখিনি কিন্তু তোমার মাকে আমি দেখেছি, আলাপ পরিচয়ও ছিল, উত্তর করিলেন অনুরূপা।

আমার মাকে আপনি দেখেছেন? আমি দেখিনি আমার মাকে। শুনেছি আমি ভূমিষ্ঠ হ'তেই মা মারা যান।

হঠাৎ হতাশ-বাতাসের কান্নায় সারা ঘরখানি গুমরিয়া উঠিল। অনুরূপা কাঠের পুতুলের মত চুপ করিয়া শুধু সোমনাথের কথা শুনিতেছেন। সোমনাথ আবার বলিল, শুনেছি ছোট বেলায় আমার এক মাসিমা আমাকে মানুষ করেন, তিনিও না কি মারা গেছেন।

অনুরূপা অতিকষ্টে অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, হ্যাঁ আমিও শুনেছি তিনি মারা গেছেন। আচ্ছা তুমি ব'স, আমি আসছি।

এই বলিয়া অনুরূপা দ্রুত স্থান ত্যাগ করিলেন। অনুরূপার রুদ্ধ-অশ্রু আর বাঁধ মানিল না। নিজের ঘরে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বুকখানা যেন তাঁহার ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। কাঁদিলেন,—শুধু কাঁদিলেন। সেই শঙ্কর, তাঁহার মাধুরীর ছেলে শঙ্কর—যাহাকে তিনি মাতৃকোল হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। সেই শঙ্কর—যাহাকে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় মহিমের ঘরে রাখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ সাবিত্রী তাহাকেই খুঁজিয়া তাঁহার কাছে আনিয়া দিল। কিন্তু কেন তিনি তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলেন না? তিনি যে মহিমকে ভালবাসিতেন একথা কলঙ্কের কাহিনী হইয়া আছে, শঙ্কর কি তাহার কিছুই জানে না, কিছুই কি সে শুনে নাই? কত কথা অনুরূপার মনে পড়িয়া গেল। অশ্রুজলে, কই কিছুই ত' ধুইয়া মুছিয়া যায় নাই!

সহসা তিনি অশ্রুসিক্ত শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, কিসের এই দুর্বলতা? কেন এই অশ্রুজল? শঙ্কর যদি আসিয়াছেই,

তাহাকে পরিচয় দিতে হইবে। শ্রীরাধামোহন সবই ত' জানেন। যাহা সত্য তাহা মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে কেন? সোমনাথকে তিনি তাহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সোমনাথ আসিল।

অনুরূপা কহিলেন, ব'স বাবা।

বসিল সোমনাথ। সে দেখিল অনুরূপার আর এক মূর্তি! একটু পূর্বে যে চাহনি সোমনাথ দেখিয়াছিল অনুরূপার, তাহার সহিত এই দৃষ্টির কোন সামঞ্জস্য নাই। বর্ষণ শেষে প্রকৃতির স্থির শান্ত মূর্তি যেন।

কণ্ঠে এতটুকু জড়তা নাই। অনুরূপা বলিলেন, আজ তোমাকে এক কঠিন সত্যের সম্মুখে দাঁড়াতে হ'য়েছে। সত্যিই যদি তুমি মহিমের ছেলে হও, জানি সে সত্যকে তুমি অস্বীকার ক'রবে না। এই বলিয়া তিনি প্রসন্ন-উদার চক্ষে সোমনাথের দিকে চাহিলেন।

সোমনাথ খুবই নম্রকণ্ঠে কহিল, বলুন।

জীবনের বিরাট সত্য এবং তুরপনেয় কলঙ্ক প্রকাশ করিতে হইবে। অনুরূপাকে দেখিলে মনে হয় যেন জৈষ্ঠ্যের দীপ্ত সবিতার আকাশ। সত্যের রৌদ্র-সম্পাতে সংকোচহীন স্বচ্ছ শুভ্রতায় ব্যাপ্ত। ধীর কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, শঙ্কর, আমিই তোমার মাসিমা। তোমার মায়ের আপন বোন। আমিই তোমাকে পাঁচটি বছর ধরে মানুষ ক'রেছিলাম, তোমার মা মারা গেলে। আবার আমিই তোমাকে নৃশংসের মত ফেলে গৃহত্যাগ ক'রেছিলাম। আমি মরিনি শঙ্কর,—আমি মরিনি।

এই বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যগ্র বাহুতু'টি বাড়াইলেন শঙ্করের দিকে। শঙ্করও কাঁদিতেছিল। নিমেষে সে 'মাসিমা' বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তুইহাতে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন অনুরূপা। পুত্রাধিকের মাথায় করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইতে লাগিলেন।

* * * *

সাবিত্রী আসিল, ফুল-সম্ভার আসিল। কোন কাহিনীই আর

গোপন রহিল না। নিজের হাতে ফুল দিয়া সাজাইলেন অনুরূপা শঙ্কর-সাবিত্রীকে,—আশীর্বাদ করিলেন।

ঠিক এই সময়ে বাহিরে শ্রীরাধামোহনের গলা শোনা গেল। অনতিবিলম্বে তিনি ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনুরূপা বলিলেন, তুমিও এসে গেছ—ভালই হ'য়েছে।

এতটুকুও দেরী না করিয়া সোমনাথ ও সাবিত্রী শ্রীরাধামোহনকে প্রণাম করিল। তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া তিনি প্রসন্ন-কল্যাণ দৃষ্টিতে অনুরূপার মুখের দিকে তাকাইলেন।

১৩

আজ মধুরাত্রি।

সাবিত্রী বসিয়া বসিয়া এই বিবাহের কথাই ভাবিতেছিল। মনে হইল তাহার বাবার কথা। এই বিবাহ লইয়াই ত' এত ব্যাপার। বাংলাদেশে থাকিয়া, পড়াশুনা করিয়া, নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া, সে কি এমন কিছু করিতে পারিত, যার সঙ্গে আজিকার উৎসবের কোন সামঞ্জস্য আছে ?

অথচ মেয়ে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার পিছনে বিশেষ কোন কারণ আছে, একথা কে না বলিয়াছে, আর কে না বিশ্বাস করিয়াছে।

দোষ কি শুধু ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেই চলিবে ? কারণ দেখাইতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা কহিতে হয়, সে কথা থাক। তবে একথা ঠিক—সংসারে, সমাজে, আত্ম-সম্মান আমরা ভুলিয়াছি, তাই নিজেদের লাঞ্ছনার কারণ যে আমরাই, সে কথাও ভুলিয়া যাই। ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই দিয়া নিজের মৃত্যুর সান্ত্বনা খুঁজিতেছি মাত্র।

কুন্তল ঘর ছাড়িয়া আসিলেও আত্ম-মর্যাদা সে ভুলে নাই। মিথ্যার আবরণে নিজেকে বিড়ম্বিত না করিয়া, ঘরের বাহিরে সে জীবনের

সত্যকে আজ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই কথা ভাবিয়া সে স্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। নির্জন ঘরে মিলন রজনীর শুভ-সূচনায় তাই মনে মনে নিজের মা ও বাবার আশীর্বাদ কামনা করিল।

সোমনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন অনুরূপা। বড়মার সঙ্গে বসিয়া সে বাড়ীর গল্প করিতেছিল। মহিমের কথা, রাজুর কথা, মহামায়ার কথা। সাবিত্রীকে আগেই তিনি তাহাদের শয়ন কক্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহিম চোখে দেখিতে পান না, অনুরূপা শুনিলেন শঙ্করের মুখে। জলে ডুবিয়া গেলে প্রাণ-স্পন্দন যেমন করিয়া থামিয়া যায়, অনুরূপার বুকের মধ্যে তেমন করিয়া উঠিতে লাগিল।

নিরুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অ্যাঁ—তুমি বল কি শঙ্কর, মহিম অন্ধ, সে চোখে দেখতে পায় না, কিছুই দেখতে পায় না ?

—কঠিন অসুখের পর চোখ নষ্ট হ'য়ে যায়, বলে সোমনাথ।

জলন্ত আগ্নেয়গিরির আলোড়ন বক্ষে চাপিয়া অনুরূপা শান্ত ধীর কণ্ঠে কহিলেন, শঙ্কর, যাও তুমি ঘুমোও গে।

শঙ্কর সাবিত্রীর ঘরে আসিল।

সাবিত্রী নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চাহিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। সোমনাথ নীরবে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখে মুখে আনন্দোচ্ছ্বাস। সাবিত্রী তাহা বুঝিতে পারিল। মৃদু হাসিল, তবু নড়িল না। সোমনাথ দু'হাতে সাবিত্রীর বাহু ধরিল, তবু সাবিত্রী নড়িল না। সোমনাথের বুকের উপরে সাবিত্রীর ফুল-মালা-লাঞ্ছিত খোপা। কেশ-গন্ধে উছল সোমনাথের মন। কম্প্রদেহ-লতার সাবিত্রী ফিরিয়া চাহিল সোমনাথের আবেশ-মধুর চোখের দিকে। আর সোমনাথ—?

*　　*　　*　　*

মুগ্ধ সমীরণ নিরুদ্ধ ছিল, এতক্ষণে বুঝি বা ছাড়া পাইল। সোমনাথের পাশে বসিয়া সাবিত্রী। সোমনাথ পড়িতেছে তাহার মিলন রজনীর রচনা—শুনিতেছে সাবিত্রী।

আজি কোন কথা নয়,
শুধু গান আর গানে ভ'রে দাও মন।
আজি কোন ব্যথা নয়,
ফাগুন এনেছে নবীন মিলন-ক্ষণ।
শাখে রোমাঞ্চে কিশলয়,
নব-মঞ্জরী চুমিয়া ভ্রমর ঘুরে।
মনে বসন্ত পূজালয়,
আরতি কাহার আজিকে বিশ্ব জুড়ে ?
ওরে দুরন্ত বাঁশরী,
সুরে সুরে তোর কোন কোকিলের কূজনী।
ছলে জল ভরি গাগরী,
বিহসি পালটি তাকাল' সে কোন সজনী।
ভুবন ভরিয়া জয় রে,
ক্ষয় ক্ষতি নাই নয়নে নয়ন বিচরণ।
আজি কোন কথা নয় রে,
শুধু গান আর গানে ভ'রে দাও মন।

প্রগলভ মধু রজনী—হাসি উচ্ছ্বাসে, চপল-নর্ম-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ !

* * * *

কিন্তু অনুরূপার এ কি হইল ! চোখের জল যে তাঁহার বাঁধ মানে না। মহিম অন্ধ, মহিম চোখে দেখিতে পায় না। যে আঁখি দু'টি তাহার কাছে প্রাণের চাহিতেও প্রিয় ছিল, সে আঁখি আর নাই। কোন দিন যদি দেখাও হয়, মহিম তাহাকে দেখিতে পাইবে না। বার বার তিনি ভগবানের কাছে মাথা কুটিয়া আর্ত-বেদনায় এই কথাই বলিতে লাগিলেন, ভগবান এ তুমি কি ক'রলে ?

বেদনাস্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন একদৃষ্টে; চক্ষু ফাটিয়া অজস্র-ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল অনুরূপার।

ভগবান খুব রসিক কিনা—এক চোখে তিনি হাসেন আর এক চোখে তিনি কাঁদেন। মধু রাত্রি ভোর হইয়া আসিল।

১৪

কয়েকদিন কাটিল আনন্দ-উৎসবে। সোমনাথের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। সোমনাথ আগ্রায় ফিরিয়া যাইবে, সঙ্গে যাইবে সাবিত্রী।

সাবিত্রী মোহনলালকে চিঠি দিয়াছিল, সোমনাথও দিয়াছিল, কিন্তু তাহার জবাব এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মোহনলাল কোথায় আছেন, কেমন আছেন, তাহার চিঠি পাইলেন কি না, ইহার মধ্যেও কতবার ভাবিয়াছে সাবিত্রী। আগ্রায় চলিয়া যাইতে হইবে, সেই আগ্রা—যেখানে মোহনলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। এই শুভ পরিণয়ে মোহনলাল বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়া আছেন। সবই যেন তিনিই করিলেন অথচ তিনি আসিলেন না। আগ্রায় মোহনলাল বলিয়াছিলেন অনুরূপাকে,—কিন্তু মাসিমা, সাবিত্রী যদি তার বিয়েতে আমাকে ফাঁকি দেয় সে লজ্জা আমার সইবে না।—সেই কথা আজ বার বার সাবিত্রীর মনে হইতে লাগিল।

সাবিত্রী চলিয়া যাইবে, অনুরূপা সেই কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। এই ত' সেদিন মাত্র সাবিত্রী তাঁহার কাছে আসিয়াছে। কত না আপনারই সে হইয়াছে। আজ যাহাকে সে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছে সেও ত' তাঁহারই পুত্রাধিক। তবু এই বিচ্ছেদ মাতৃ-হৃদয়কে আজ অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি শঙ্করকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, সাবিত্রীই তাহার সন্ধান দিয়াছে। এ ক'দিন তাই তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছিলেন। সে সুখ-স্বর্গ তাহার ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবু উহাদের যাইতে দিতে হইবে। একা একা বসিয়া এই সব মনে করিয়া তিনি কাঁদিতেছিলেন। এমন সময় ঘরে ঢুকিল সোমনাথ।

—বড়মা।

—কে শঙ্কর, এস, ব'স;—চোখের জল মুছিলেন অনুরূপা। সোমনাথ বসিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অনুরূপা তাহাকে বলিলেন,

সাবিত্রী তোমাকে খুঁজে বের ক'রেছে। জীবনেও তার এই ঋণ শোধ ক'রতে পারব না। এ ক'দিন আমি যেন জগতের সব ভুলে ছিলাম। আমার শঙ্কর, আমার সাবিত্রী আমাকে ঘিরে র'য়েছে, সে যে আমার কি সুখ! তোমরা আমার ঘর শূন্য ক'রে চলে যাবে একথা যে আমি ভাবতেও পাচ্ছিনে শঙ্কর।

সোমনাথ বলিল, আমি বরং একাই চলে যাই বড়মা—সাবিত্রী থাক। ওকে না হয় পরে নিয়ে যাব।

না,—সে কি হয়, সোমনাথের কথায় বলিলেন অনুরূপা,—সাবিত্রী তোমার সঙ্গেই যাবে। শোন শঙ্কর, যে জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। সাবিত্রী সব কথাই হয়ত' তোমাকে ব'লেছে। তার ভালমন্দ, দোষ-ত্রুটি, সব জেনেই তুমি তাকে গ্রহণ ক'রেছ। সে তোমাকে ভালবাসে। ভালবাসার দায়িত্ব আত্ম-কৃপণতায় কখনও ক্ষুণ্ণ ক'রনা বাবা।

তোমার আদেশ আমি কখনও ভুলে যাব না বড়মা,—উত্তর করিল সোমনাথ।

অনুরূপা পুনরায় বলিলেন, আমার জীবনের কথাও তোমাকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। আমি যা ব'লব সে আমার জীবনের কঠিন সত্য। সাবিত্রীকে গোপন করিনি, তোমাকেও ক'রব না। কারণ আমি জানি এ লজ্জারও নয়, পাপেরও নয়। তোমাকে তার আগে একটা অনুরোধ জানাব, বল রাখ্‌বে আমার অনুরোধ।

—অনুরোধ কেন বড়মা, তোমার আদেশ।

—না, না রে শঙ্কর, এ আমার আদেশ নয়, এযে আমার সত্যিই অনুরোধ,—আমার কথা, তোমার বাবাকে কোন দিন জানাবে না।

—আচ্ছা তাই হবে।

—কেন জানাতে চাইনা তাও বলি। তোমার মা তোমাকে রেখে মারা গেল। তোমাকে পাঁচ-বছর ধ'রে মানুষ ক'রেছিলাম—তুমি আমার সেই আদরের শঙ্কর। ঘটনাচক্রে সবই হ'ল উল্‌টো, তোমাকে ছেড়ে চলে আস্‌তে বাধ্য হ'লাম। ভালবাসার মর্যাদা সে-

দিন কলঙ্ক-কালিমায় ধূলোয় লুণ্ঠিত হ'ল। শোন শঙ্কর, ভালবাসা লজ্জার কথা নয়, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য। তোমার বাবাকে ভালবাস্‌তাম ছোটকাল থেকেই। সে ছিল আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। বিয়ে তার সঙ্গে আমার হয় নি। তবু বিয়ের পরে বিধবা হ'য়ে যখন ফিরে এলাম তখনও আমার ভালবাসাকে মিথ্যা ব'লে মেনে নেই নি আমি। তোমার মায়ের মৃত্যু বুঝি সেই সত্যকেই রূপ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হ'ল না, দুষ্ট-চরিত্রা আখ্যা নিয়ে তোমাকে ফেলে রেখে চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম অন্ধকার পথে।

নির্বাক বিস্ময়ে সোমনাথ অনুরূপার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনুরূপা কহিলেন, তোমার বাবা যা পারেন নি, তোমার মেসোমশাই তা পেরেছেন। তবু জানি জীবনের এ সত্যকে তোমার বাবা মনে মনে কখনও উপেক্ষা করেন না। আমার আজন্ম শ্রদ্ধার দেবতা তোমার বাবা, তাই আমার অজ্ঞাতবাসকে তাঁর কাছে শ্রেয় ক'রেই রাখ্‌তে চাই। সাবিত্রী আমার নিজের মেয়ে নয়, তবু নিজের। তুমি আমার নিজের ছেলে নও, তবু নিজের। তোমাদের মিলন-তীর্থে আমার সব চাইতে একান্ত আপনার লোকটিই র'য়েছেন। তোমরা তাঁকে সুখী রেখো,—আমার জন্য ভেব' না।

অনুরূপার চোখে জল, সোমনাথও কাঁদিতেছিল। অনুরূপা নিজের আঁচলে শঙ্করের চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, কেঁদনা শঙ্কর। আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রেছি। তাঁর সঙ্গে জাতি-গোত্রেরও বোধহয় আমার মিল নেই। কিন্তু একথা জেন, যে সত্যিকারের মানুষ তার কোন জাতি-গোত্রের প্রয়োজন হয় না।

সোমনাথ কথা কহিতে পারিতেছিল না।

অনুরূপা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিতে লাগিলেন, অনেকে হয়ত' ব'লবেন, কেন আমি আবার বিয়ে ক'রলাম? কাশীতে এসে কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত নিয়ে বিধবা জীবনের কলঙ্ক সারা জীবন ভ'রে কেন ধুয়ে ফেললাম না?

কিন্তু তোমার কাছে, ছেলে হ'লেও, ব'লতে আমার এতটুকু বাধবে না, প্রকৃত পক্ষে বিধবা আমি হই নি। আর যদিও বা মেনে নিতাম সমাজের বিধি, তবু লোক দেখান বিধবার বেশে স্বর্গগত স্বামীর আত্মাকে কখনই শান্তি দিতে পারতাম না। কেননা সতের বছরের একটি মেয়েকে লৌকিক ধর্মের অনুশাসনে বিধবার মুখোস্ পরিয়ে প্রকৃতির ধর্মকে উপেক্ষা করা যায় না। একটু থামিয়া পরে আবার বলিতে লাগিলেন অনুরূপা, তা'ছাড়া নারীর জীবনে বিয়ে ছাড়া শ্রেয় কিছু নেই। সে শ্রেয় আমার, সে শ্রেয় প্রত্যেক নারীর। সাবিত্রীও সেই শ্রেয়কেই বরণ ক'রেছে। তাই তোমাদের ভালবাসার কুশণ্ডিকা সার্থকতায় সুন্দর হ'য়ে উঠবে। নতুন পৃথিবীর সূর্য—ছায়া তোমরা,—এগিয়ে চল আপন মহিমায়, এই কামনাই করি।

চুপ করিলেন অনুরূপা। সারা ঘরখানিতে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সাবিত্রীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধামোহন ঘরে ঢুকিলেন। অনুরূপাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ছেলেকে পেয়ে খুব, এদিকে মেয়ে যে আমার কেঁদে সারা হ'চ্ছে তা দেখবে কে?

কেন মেয়েকে তুমিই ত' দেখেছ, আজও সে ভার আমার ওপরে নেই, মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন অনুরূপা। একটু পরে আত্ম-তৃপ্তির প্রসন্নতায় আবার তিনি বলিলেন, তুমি এমন ক'রে সাবিত্রীকে আপন ক'রে নিয়েছ বলেই সাবিত্রী তার জীবনের মহার্ঘ বস্তুটির সর্বোচ্চ মূল্য দিতে পারবে,—নিঃসংশয়ে একথা আজ আমি ব'লে রাখ্ছি, এই বলিয়া শ্রদ্ধায় চাহিলেন তিনি শ্রীরাধামোহনের দিকে।

শ্রীরাধামোহন উত্তরে কহিলেন, কথাটি ঠিক উল্টো অনু। সত্য প্রকাশের এত বড় সাহস তোমার, তার কাছে আমি খুবই তুচ্ছ। কুন্তলকে সাবিত্রী তুমিই তৈরী ক'রেছ। সে মন্ত্রের ছোঁয়া শঙ্করও পেয়েছে। মহিমবাবু সে দায়িত্ব পালন ক'রেছেন। তোমার আর মহিমবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা তাই আমার বেড়েই যায়। মনে হয় আমিও বুঝি তোমাদের মন্ত্র-শিষ্য।

পরম শ্রদ্ধায় অনুরূপা প্রণাম করিলেন শ্রীরাধামোহনকে। প্রণাম করিল সাবিত্রী, প্রণাম করিল সোমনাথ। য়াত্রার সময় আসিল।

অনুরূপা সাবিত্রীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি শঙ্করকে কহিলেন,—শঙ্কর, সাবিত্রীকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার কুড়িয়ে পাওয়া 'রত্নকে' আমার অন্তরের 'মাণিকের' কাছে গচ্ছিত রাখ্‌ছি। আবার বলি শঙ্কর, যে দায়িত্ব তোমরা—নিজেরা গ্রহণ ক'রেছ বাবা, দৈনন্দিন জীবনের আবিলতার অহংকারে তাকে কখনও উপেক্ষা ক'র না।

শঙ্কর ও সাবিত্রী একসঙ্গে অনুরূপাকে প্রণাম করিল। চিবুক স্পর্শে তিনি তাহাদের চুম্বন করিলেন। আবার প্রণাম করিল শ্রীরাধামোহনকে। তিনি দু'জনকে দু'হাতে আশীর্বাদ করিলেন।

সাবিত্রীকে নিজের কাছে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীরাধামোহন বলিতে লাগিলেন, জীবনের পথে অনেক বিঘ্ন মা, তাদের জয় করা দাম্পত্য জীবনের ধর্ম। দায়িত্বের সমবায় সুন্দরতায় ভ'রে দিও; শঙ্করের গৃহে শঙ্করী তুমি,—এই আমার আশীর্বাদ।

বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। মেসোমশাইএর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সাবিত্রীও কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুর, সুভদ্রা, মহাবীর সবাই অশ্রু-নয়নে তাহাদের দিদিমণিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। স্নিগ্ধ সুগভীর পরিবেশ, অশ্রু-সজলতায় সকরুণ,—শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার কথাই যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

১৫

মধুপুরে রাজুর মামা বাড়ী। মামা হরলাল গাঙ্গুলী চাকুরী উপলক্ষে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া মধুপুরেই 'ডোমিসাইলড্‌' হইয়াছেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষ। আগেকার দিনের কুলীন

সন্তানের দ্বিতীয় পক্ষ ত' কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মহাশয়ের পিতামহের নাকি স্ত্রীর হিসাবের খাতা ছিল। সে হিসাবে হরলাল ত' ব্রহ্মচারী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী গত হইলে তাহার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন হরলাল এবং তাহার অল্প কয়েক দিন পরেই দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনয়নীকে ঘরে আনিয়া পূর্বশোক ভুলিয়াছেন। পাড়ার জ্ঞানী-গুণীরা বলিলেন, ভাগ্যবানের বৌ মরে,—এই বয়েসেও হরলালের নবীনা স্ত্রী লাভ হইয়াছে, হরলাল ভাগ্যবান।

কিন্তু সেই নবীনা সুনয়নীর ভাগ্যের কথা কেহই চিন্তাও করিলেন না। সে হয়ত' অন্যান্য সমবয়সীদের মত একটি সুন্দর স্বামীর স্বপ্ন দেখিয়া থাকিত; সে হয়ত' অন্যান্য সঙ্গীদের মতই মনে মনে আপন মনের মত করিয়া সুখের সংসার রচনা করিত। কিন্তু কোথা হইতে ভাগ্যবানের আবির্ভাব হইল, আর তাহার স্বপ্ন-সৌধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচ্‌নচ্‌ হইয়া গেল।

মহিমের সঙ্গে হরলাল যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহামায়ার বিবাহ দেন তখন তাঁহার পিতা বাঁচিয়াছিলেন। সে বহু বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। তারপর হরলালের বিবাহ, পিতার মৃত্যু, মধুপুরে আগমন, প্রথমা পত্নী বিয়োগ, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ, এত ঘটনা ঘটিয়াছে।

সুনয়নী সুন্দরী। বয়স প্রায় পঁচিশ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সামনের দাঁত দু'টি একটু উঁচু,—হাসিলে মনোরম দেখায়। কোঁকড়ান কালো চুল, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ,—চাহিলে যেন কথা বলে। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী।

সুনয়নীকে আদর করিয়া 'নয়ন বৌ' বলিয়া ডাকিতেন হরলাল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীদের আদর-যত্ন নাকি বেশী প্রাপ্য, সে কারণে স্বামীর উপরে প্রভাবও অধিকতর। তবে সুনয়নীর কাছে আমাদের হরলালের অবস্থা শিকলে-বাঁধা 'শাখা-মৃগ' না হইলেও, মৃগ-নয়নী স্ত্রীর কথায় তিনি যে উঠিতেন বসিতেন, একথা সকলেই বলিত।

সুনয়নী নিঃসন্তান। ইহা হরলালের ভাল লাগিত না। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—সেই ভার্যার যদি পুত্রই না হইল, তবে "পুন্নামক"

নরক হইতে উদ্ধার করিবে কে ?—এই চিন্তা হরলালের এই শেষ-প্রৌঢ় বয়সেও পাইয়া বসিত ; সুনয়নীকে ভয় করিতেন, তাই বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেন না।

সেদিন স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। হরলাল দুঃখ করিতে-ছিলেন, ভগবান কেন তাঁহাদের নিঃসন্তান করিলেন। মাদুলী, চরণামৃত, ঝাড়-ফুক্,—কিছুই ত' তিনি বাকী রাখেন নাই। বন্ধুদের পরামর্শে ডাক্তারও দেখাইয়াছেন। তবু কোন ফলোদয় হইল না।

সুনয়নী বলিলেন, বেশ আছি, কোন' ঝামেলা নেই, ভালই ত'।

হরলাল রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, বেশ আছ ?

—তা কি এমন মন্দ আছি বল ?

—যে গাছে ফল হয় না, সে আবার গাছ না কি ?

—তা একটা ফলবন্ত গাছ ঘরে আনলেই ত' পারতে ?

—তুমি এমন সাহারা মরুভূমি হ'য়ে থাকবে, কে জানে বল ?

—আমি বলি কি—যদি শোন ত' বলি।

—কি ?

মৃদু হাসিয়া সুনয়নী হরলালকে বলিল, দেখ এক কাজ কর, তুমি বরং একবার ডাক্তারকে দেখাও।

—আমি ?

—হ্যাঁগো, বলিয়া সুনয়নী আবার হাসিল।

হরলাল গম্ভীর হইলেন। কথাটা তাঁহার ভাল লাগে নাই। কথায় একটু ঝাঁঝ রাখিয়া তিনি সুনয়নীকে বলিলেন, কি যে তোমার আধিক্যেপনা, আমি ডাক্তার দেখাতে যাব কোন দুঃখে।

দুঃখ,—ছেলেপুলে হ'ল না বলে,—এই বলিয়া রুদ্ধ-অশ্রু থামাইতে না পারিয়া সুনয়নী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। হরলাল বুঝিতে পারিলেন না হঠাৎ সুনয়নীর কি হইল। সুনয়নী বুঝিত সে নিঃসন্তান বলিয়া প্রায়ই হরলাল তাহার সামনে এই প্রসঙ্গ তুলিয়া থাকেন। সে জানে কি সুখেই এই প্রৌঢ়ের সংসার সে করিতেছে! শাঁখা-সিঁদুরের কর্তা ও বাঙ্গালী গরীবের ঘরের একটি মেয়ের উদ্ধারকর্তা

হিসাবে, সে এক প্রকার তাঁহাকে মানাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই নিঃসন্তান হইবার পাপ নিয়ত তাহাকে সূচ-বিদ্ধ করিত।

কাহার জন্য সে আজ নিঃসন্তান হইল, কে তাহার বিচার করিবে? তাহার মাতৃ-হৃদয় কাহার জন্য আজ "বেশ আছি" বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে চায়,—কে ইহার সন্ধান করিবে? সে কি ইহা বোঝে না, কোন্ বিবাহিত রমণীর 'মা' হইবার সাধ না জাগে! আমরা বলিব, সুনয়নী নিঃসন্তান,—সে তাহারই দোষ। পুত্রহীনার অপবাদ একা তাহাকেই বহন করিতে হইবে। হাসিয়া সে তাহার স্বামীকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিল,—তুমি এবং একবার ডাক্তারকে দেখাও—কথাটি কি একেবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয়?

সুনয়নীর কোথায় ব্যথা হরলাল তাহা জানিতেন না। জানিবার প্রয়োজনও ছিল না। সে কারণে সুনয়নী চলিয়া গেলে তিনিও নিজের কাজে মন দিলেন। একটু পরে ডাক পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

চিঠি লিখিয়াছেন মহামায়া,—আগ্রা হইতে। চিঠির আদ্যোপান্ত পড়িলেন হরলাল এবং চীৎকার করিয়া সুনয়নীকে ডাকিলেন, ওগো শুনছ, ওগো নয়নবৌ—কোথায় গেলে?

হরলালের চীৎকার শুনিয়া সুনয়নী আসিল ও জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে,—চীৎকার ক'রছ কেন?

চীৎকার ক'রব না,—তুমি বল কি? সোমনাথ নাকি একটা অজাত-কুজাতের মেয়েকে কাশী থেকে বিয়ে ক'রে এনেছে। তাকে ঘরে উঠিয়েছে। দিদির তাহ'লে ত' বড়ই মুস্কিল হ'ল।

—কেন,—মুস্কিল কিসের?

—দ্যাখ, যা তা কথা ব'ল না। কোথাকার মেয়ে, কার মেয়ে, জানা নেই, শোনা নেই, বিয়ে করে ঘরে আনলেই হ'ল?

—কেন হবে না! বলিয়া সুনয়নী হাসিয়া ফেলিল।

—তুমি হাসছ? সুনয়নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন হরলাল।

—বা—রে, হাসব না?

—হাসবে ?

—শোন, সোমনাথ এম-এ পাশ ছেলে, ভাল চাকুরী করে। সে যদি কোন মেয়েকে ঘরে এনেই থাকে, তবে সে ঘরে রাখবার মত মেয়েই হবে। তার জন্য তুমি কেন এখানে চীৎকার ক'রে পাড়া মাতাচ্ছ, বলিল সুনয়নী।

হরলাল উত্তর করিলেন, তুমি জান না নয়নবৌ, সোমনাথ এম-এ পাশ ক'রলে কি হবে, সে কবিতা লেখে !

কবিতা লেখা কি খারাপ ? জিজ্ঞাসা করিল সুনয়নী।

—খারাপ নয় ?

—আমি সোমনাথের কবিতা পড়েছি।

—পড়েছ ? কোথায় পেলে ?

—কেন মাসিক পত্রিকায়। ওকে কে না চেনে ? তারপর আমাদের ভাগ্নে ত'।

—ভাগ্নে ? সং ভাগ্নে, সে আবার ভাগ্নে নাকি ? তুমি ওসব বাজে কবিতা-টবিতা পড়বে না। আমি জানি, ওই সব বাজে কবিতা লিখেই ছেলেটা যা তা হ'য়ে গেছে।

—চুপ কর,—কবিতা লিখলে লোকে যা তা হ'য়ে যায় না।

—না, হ'য়ে যায় না ? চরিত্রের মাথা খেয়ে, না হ'লে এসব যাকে তাকে বিয়ে ক'রতে পারে ?

কি যে তুমি ব'লছ সব ? তোমাদের মত যারা নিজেকে বিশ্বাস করে না, যাদের নিজেদের নেই কোন চরিত্র, তারাই মনে করে, লেখক, কবি যারা, তাদের ভাল ব'লবার কিছুই নেই। আমি বলি, তারাই মানুষ, তারাই মানুষের বেদনা বোঝে, বোঝে কোথায় কার ব্যথা। নিজেদের দরদী মন দিয়ে তারাই সকলকে আপন ক'রে নেয়। আর তোমরা, কাপুরুষেরা তাদের নিন্দে না করে জল-স্পর্শ কর না। সোমনাথের লেখা যদি পড়তে তাহ'লে একথা তুমি ব'লতে পারতে না, তাকে চিনতেও পারতে। চরিত্র তুমি কাকে বল ?—এই বলিয়া হরলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল সুনয়নী।

থাক্, সোমনাথকে আজ আর নতুন ক'রে আমাকে চিনতে হবে না। পড়ত,—দেখ না দিদির চিঠি। এই বলিয়া সুনয়নীর দিকে চিঠিখানি আগাইয়া ধরিলেন হরলাল।

সুনয়নী চিঠি পড়িয়া কহিল, বেশত,—দিদি তোমাকে আগ্রায় যেতে বলেছেন, যাও। দেখে এস, সোমনাথ কার মেয়ে বিয়ে ক'রে এনেছে।

—আমি যাব না, কহিলেন হরলাল।

—দিদি যখন যেতে ব'লেছেন একজনকে যেতেই হয়। তুমি না যাও, আমি যাই।

—তুমি যাবে সেই মোগলবাদশার মুলুকে—একা ?

—কি আর করি বল ?

বেশ তোমার যখন ইচ্ছা, আমিই যাব,—দেখেই আসি। এই বলিয়া হরলাল উঠিলেন। রাত্রির গাড়ীতেই তিনি আগ্রা যাত্রা করিলেন।

১৬

কয়েকদিন হইল আগ্রার বাসায় আসিয়াছেন হরলাল। মহামায়া ভাই এর কাছে সোমনাথের বিবাহ বৃত্তান্ত সব বলিয়াছেন, সব শুনিয়াছেনও হরলাল। হরলাল একটু সেকাল-পন্থী লোক, তাই সোমনাথের এই বিবাহ, রীতি বিরুদ্ধ হইয়াছে ইহা দিদিকে বুঝাইলেন। কুলীন সন্তানের আভিজাত্য ভাইবোন দু'জনারই ছিল। তাঁহাদের ধারণা,—ভবিষ্যতে রাজুর বিবাহ লইয়া অসুবিধা হইতে পারে যদি এই বিবাহ মানিয়া লওয়া যায়। ভাইবোনের ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক হইল, মহামায়া রাজুকে লইয়া হরলালের সঙ্গে মধুপুরে চলিয়া যাইবেন। মহামায়া তাহারই জন্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

অপর পক্ষে মহিম এই বিবাহ অসঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি অন্ধ। সংসারের ভাল-মন্দ সব কিছুই মহামায়াকেই দেখিতে হয়। মহামায়া স্বামীকে যে এ সব কথা না শুনাইয়াছেন এমন নহে। এই

বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তর্ক-বিতর্কও কম হয় নাই। মহামায়া এই বিবাহ মানিয়া লইতে রাজী নন। শুধু মহিম,—সাবিত্রী ও সোমনাথকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।

এমত অবস্থায় হরলালকে চিঠি দিয়া আনিয়াছেন মহামায়া। হরলাল আসিবার পর রাজুর মা আরও রুদ্র-মূর্তি ধারণ করিলেন। মহিম অন্ধ হইলেও কিছুই তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলিতে লজ্জায় তিনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। কেননা সাবিত্রীকে লইয়াই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সাবিত্রীকে মহামায়া এমন করিয়া অপমান করিবেন, মহিম কিছুতেই যেন তাহা মনে মনে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না।

বাড়ীতে যে এইরূপ পরিস্থিতি হইবে তাহা সোমনাথও ভাবিতে পারে নাই। সাবিত্রীকে পাইয়া রাজু অবশ্য খুবই খুশী হইয়াছিল। তবে তাঁহার প্রতি মহামায়ার বিরূপ ব্যবহার রাজুর ভাল লাগিত না। এইরূপ অবস্থায় সকলের দিন কাটিতেছিল। হরলাল আসিয়া পড়াতে মহামায়ার পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

সেদিন রবিবার। হরলাল বাহিরের ঘরে বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন বিবাহ সম্বন্ধে সোমনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। এমন সময়ে দেখিলেন সাবিত্রী আর সোমনাথ ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের বেশের পরিপাটি দেখিয়া মনে হয় কোথায় যেন যাইবে তাহারা।

সোমনাথ হরলালকে দেখিয়া বলিল, এই যে মামা আপনাকে ত' দেখতেই পাই না।

—তার মানে ?

—না সেই প্রথম যেদিন এলেন, তারপরে আর দেখা হ'য়েছে ?

—দেখার তোমার আর কি চোখ আছে বাবা ?

—কেন ?

—কেন আর কি।

—সাবিত্রীর সঙ্গেও ত' কোন কথা বলেন নি।



—সম্পর্কে আমি তোমার মামা হই সোমনাথ।

হাসিয়া সোমনাথ উত্তর করিল, তা কি আর আমি জানি না। যাক্ গে, আমরা মোটরে বৃন্দাবন যাচ্ছি, আমার এক বন্ধুও যাবে। যাবেন আপনি আমাদের সঙ্গে, বৃন্দাবন দেখে আসবেন?

—আগ্রায় বসেই ত' বৃন্দাবন দেখতে পাচ্ছি!

—সাবিত্রী আমার সঙ্গে র'য়েছে মামা।

—তোমরা কি দল বেঁধে আমাকে অপমান ক'রতে চাও?

—অপমান?

ছিঃ—মামার সঙ্গে তর্ক ক'রতে নেই, চল,—সাবিত্রী কহিল সোমনাথকে।

সোমনাথ কোন কথা কহিল না, সাবিত্রীকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। সোমনাথের এই আচরণে হরলাল বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। সোমনাথ ইচ্ছা করিয়াই যে স্ত্রীর সামনে তাহাকে অপমান করিল, এই ধারণাই তাহার বদ্ধমূল হইল। হরলাল উত্তেজিত হইলেন। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করিবার পর মহিমের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহিমকে উদ্দেশ্য করিয়া হরলাল বলিলেন, দিনদিন কত যে দেখব—লজ্জা তাদের না হ'তে পারে, কোন্ ভদ্রলোক এসব সহ্য ক'রতে পারে?

মহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'য়েছে হরলাল?

হরলাল রাগিয়াই উত্তর করিলেন, হবে আর কি! দেখুন চক্রবর্তী মশাই, আমরা আপনার আত্মীয়-স্বজন, আমাদের একটা সংবাদ দেওয়াও প্রয়োজন মনে ক'রলেন না ছেলের বিয়েতে। অবশ্য এসব বিয়ে লোকজন ডেকে দেবেনই বা কি ক'রে?

মহিম বলিলেন, তুমি কি ব'লছ হরলাল?

উত্তরে হরলাল কহিলেন, কি ব'লছি তা আপনিও জানেন। সোমনাথের এই বিয়ে সমর্থন করি না আমরা। কার মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, জাতি গোত্র জানা হ'লনা, সোমনাথ বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে এল,—আর অম্লান বদনে তাকে আপনি ঘরে তুলে নিলেন!

মহিম ধীরে ধীরে হরলালের কথার উত্তর দিলেন, সোমনাথ সব কথা আমাকে ব'লেছে। সাবিত্রীর সঙ্গে কথা ব'লে আমি দেখেছি। অজ্ঞাত-কুলশীলা ব'লে যদি তাকে আমি গ্রহণ না করি—

—আপনার অপরাধ হ'বে?—জিজ্ঞাসা করিলেন হরলাল।

—অপরাধ শুধু নয়, মহাপাপ হবে তাই আমি মনে করি, উত্তর করিলেন মহিম।

—আপনি ত' আর চোখে দেখতে পান না, চোখ থাকলে দেখতেন।

—চর্ম-চক্ষু নেই ব'লেই ত' মন দিয়ে দেখতে পাই হরলাল।

—ওসব বাজে কথা ব'লে কোন লাভ নেই চক্কোত্তি মশাই। এসব বেহায়া-বেলেল্লাপনা আমি কেন সহ্য ক'রব? আমার দিদি ও ভাগ্নীর সম্বন্ধে আম কে একটা ব্যবস্থা ক'রতেই হ'বে।

মহামায়া ও হরলালের চক্রান্ত মহিমের কাছে নিমেষে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সহজ কণ্ঠে বলিলেন, রাজুর মা সাবিত্রীকে গ্রহণ করেন নি, এ আমার যে কত বড় লজ্জা তা তুমি বুঝবে না। তোমার দিদির কথায় তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ। বেশত' রাজু তোমার ভাগ্নী, দায়িত্ব তোমারও আছে। এটা সোমনাথের বাসা। তোমার দিদি যদি রাজী হন, তাঁকে আর রাজুকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পার মধুপুরে।

হরলাল কথার উত্তর দিতে, বেশ রাগিয়াই বলিলেন, সে ভয় আপনি আমাকে দেখাবেন না। ভগবানের আশীর্বাদে নিজের বোনকে খেতে আমি দিতে পারব। দিদিকে ত' চোরের মত করে রেখেছিলেন মশাই। তাঁরও মান মর্যাদা আছে তা আপনার জানা উচিত। আপনিও যেমন ছিলেন দুঃশ্চরিত্র, তেমনি ছেলের এই কেলেঙ্কারী অনায়াসে হজম ক'রতে পেরেছেন। কিন্তু আমার বোন এ ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নেবে না।

এ কথার কোন উত্তর দিলেন না মহিম। তিনি রাজুকে ডাকিলেন। রাজু আসিল। সোমনাথ কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজুর মুখে

শুনিলেন তাহারা আগ্রার বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে, রাত্রে ফিরিবে। তিনি রাজুকে তাহার মাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

মহামায়া দরজার পাশেই ছিলেন। হরলাল ও স্বামীর কথা শুনিতেছিলেন। একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আমি এখানেই আছি।

মহিম বলিলেন, হরলালের কথা শুনেছ তাহ'লে। এবারে আমার কথা শোন। সোমনাথ আমাদের না জানিয়ে বিয়ে ক'রে এসেছে। সাবিত্রার সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় বুঝেছি—বধূ হবার সর্ব-যোগ্যতা তার আছে। আমি এ বিয়ে সমর্থন না ক'রে পারি না। সমর্থন না করারও কিছু নেই। কালের চক্রকে রোধ করা চলে না, তাকে বাধা দিতে গেলে নিজেদেরই গুড়িয়ে যেতে হবে তার নির্ম্মম আবর্ত্তনে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, আমি রাগের কথাও বলি না, অভিমানের কথাও বলি না। সত্যি যদি সোমনাথের এই বিয়েতে তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে মনে কর, রাজুকে নিয়ে আজই তুমি মধুপুরে চলে যেতে পার। আমি চোখে দেখি না, আমার কিছু করারও শক্তি নেই। কোন কিছু ব'লে কাজে পরিণত করাও আমার পক্ষে সহজ নয়। রাজুর দায়িত্ব তোমাদেরই। তুমি হরলালকে চিঠি লিখে আনিয়েছ, ভালই ক'রেছ। তবে তোমার ভাইকে বলে দিও, সত্যিই আমি দুঃশ্চরিত্র, কারণ জীবনের পরম সত্যকে উপেক্ষা ক'রে, তোমার ভাই-এর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন ক'রতে আমার লজ্জা হয় নি। সে যে কত বড় চরিত্রহীনতার কাজ, তারত' মার্জনা নেই।

হরলাল এই কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। দাঁতের উপরে দাঁত রাখিয়া প্রায় চীৎকার করিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ভণ্ডামিকে ভাল কথার প্রলেপে বেশী দিন লুকিয়ে রাখা যায়না চক্কোত্তি মশাই। বিধবা শালীকে নিয়ে যে দিন-দুপুরে কেলেঙ্কারী করে, তার আবার সত্য, তার আবার চরিত্র। আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে

ওঁর মান-সম্মান গেছে। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব' না। রাজুকে নিয়ে তুমি তৈরী হ'য়ে নাও দিদি, আমি গাড়ী ডেকে আনি। এত বড় কথা,—বলিতে বলিতে হরলাল রাগে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া বাসার বাহির হইয়া গেলেন।

মহিম কোনই প্রত্যুত্তর করিলেন না। স্ত্রীর নীরবতায় বুঝিলেন তাঁহারও যাইতে আপত্তি নাই। তিনি খুব ধীরে শান্ত ভাবে বলিলেন, রাজু তোমার মাকে বলো তৈরী হ'তে। আমার জন্য তোমরা চিন্তা ক'রোনা। সাবিত্রীর হাতে দু'টি খেলে আমার জাত যাবে না। আমি জানি, আমি বুঝতে পারি জীবনের বড় কলঙ্ক আমার কোথায়? প্রথম জীবনের ভুল কড়ায় গণ্ডায় তার মাশুল গুনে নেবে।

মহামায়া উত্তর করিলেন এ কথার। বিরক্তি এবং অশ্রদ্ধার সবখানিই তাঁহার কথায় ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এ কথা তুমি কাকে শোনাচ্ছ?

ম্লান হাসিমুখে বলিলেন মহিম, কাকে আর শোনাব, নিজেকেই শোনাচ্ছি। ওরা এসে পড়লে তোমাদের যাওয়া হবে না। তোমরা যত শীঘ্র পার বেরিয়ে পড়।

রাজু এই সব শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি যাবনা বাবা।

মহিম বলিলেন, তোমার জন্যই ওদের ভয়, তোমাকে ওরা রেখে যাবেন না।

উত্তরে মহামায়া বলিলেন, রেখে যাব কোথায়, আর কেনই বা থাকবে? কি অধিকার আছে আমাদের? জানি আমাকে তুমি কোন দিনই ভালবাসনি। রাজুকে পেয়ে সে ক্ষোভ আমার ছিল না। তবু সোমনাথের এতবড় নির্লজ্জতা, এতবড় হঠকারিতা, তোমার মত ছাই চাপা দিয়ে আমি মেনে নিতে পারব না।

—কোন কিছুইত' আমি বলিনি। বরং আমিইত' বলছি তোমাদের শীঘ্র বেরিয়ে প'ড়তে।

—গেলেই ত' তুমি বাঁচ।

—আমি বাঁচি না, বাঁচ তোমরা। যাক্, তর্কের কি দরকার। তোমাকে ভালবাসিনি সে কথা সত্য নয়। কাছে থাক্‌লে লোকে বেড়ালটাকেও ভালবাসে।

—আমি বেড়াল কুকুরেরও অধম তা আমি জানি। শঙ্করের মাকেও তুমি ভালবাসনি, আমাকেও নয়। আমরা ত' আর তোমার 'রমা' নই—রুক্ষ-কণ্ঠে কহিলেন মহামায়া।

মহিম কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার ঠোঁট দু'টি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

রাজু আবার কাঁদ' কাঁদ' হইয়া বলিল, আমি যাব না মা।

রাজুকে ধমক দিয়া লইয়া গেলেন মহামায়া। একটু পরেই হন্ত-দন্ত হইয়া হরলাল আসিলেন। দেখিলেন মহামায়া ইহার মধ্যেই তৈরী হইয়া লইয়াছেন। শুধু রাজু কাঁদিতেছিল। বাক্স প্যাঁটরা গাড়ীতে উঠিল।

রাজুর হাত ধরিয়া মহামায়া মহিমের ঘরে আসিলেন। দেখিলেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন মহিম। অন্ধ হইলেও নিজের শয়ন ঘরের তাঁহার আন্দাজ ছিল। পায়চারি করিতে করিতে তিনি আপন মনে বলিলেন, যার ঘরও নেই, পারও নেই,—তার কি কেউ নেই ?

মহামায়া একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আমরা যাচ্ছি। তোমাকে প্রণাম ক'রতে এলাম।

—প্রণাম—বেশত' কর, এই বলিয়া মহিম দাঁড়াইলেন।

প্রণাম করিয়া উঠিলেন মহামায়া।

মহিম বলিলেন,—তুমি চলে যাচ্ছ বলে, আমার কাছে কোন দিন ফিরে আস্‌তে পারবে না, একথা কিন্তু মনে ক'রে যেওনা। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আমার কাছে আস্‌তে তোমার এতটুকু যেন সংকোচ না হয়।

মহামায়া কোন কথা কহিলেন না।

রাজু প্রণাম করিতে গিয়া মহিমকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল, আমি যাব না বাবা, আমি কিছুতেই যাব না। দাদাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকব।

হরলাল বিরক্ত হইয়া রাজুর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—যাব না বাবা, থাক্‌বি কোন্ চুলোয়—চল্।

—বাবা—না—না, আমি দাদাকে ফেলে যাব না,—

রাজুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন—কই কেহই ত শুনিল না। হরলাল তাহাকে ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন। গাড়ী ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিল। রাজু তখনও চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। অন্ধ মহিম শুধু নির্জ্জন ঘরে একা পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * *

সাবিত্রীর শরীরটা হঠাৎ ভাল না লাগায়, উহাদের বৃন্দাবন যাইবার যে প্রোগ্রাম ছিল, তাহা বাতিল করিতে হইল। উহারা বাসায় ফিরিয়া আসিলে সাবিত্রী নিজের ঘরে গেল। সোমনাথ রাজুর জন্য এক বাক্স টফি আনিয়াছে। রাজুর নাম ধরিয়া ডাকিল, মা বলিয়া ডাকিল, কেহই সাড়া দিল না,—না দিলেন মহামায়া, না দিল রাজু। সোমনাথকে ডাকিলেন মহিম—বলিলেন, সব। সোমনাথ কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—রাজুও চলে গেল ?

মহিম চুপ করিয়া রহিলেন। চীৎকার শুনিয়া সাবিত্রী ঘরের বাহিরে আসিল।

—মাত্র আর দশ মিনিট আছে ট্রেন ছাড়তে, পাব ত' এস,—এই বলিয়া সোমনাথ দৌড়াইয়া পথে বাহির হইল। একটু যাইতেই—একটা টাঙ্গা পাইল। টাঙ্গাওয়ালা বক্‌শিসের লোভে তীরবেগে টাঙ্গা ছুটাইল। সাবিত্রীও আর একখানা টাঙ্গা লইয়া তাহার পিছনে ছুটিল।

সোমনাথ যখন ষ্টেশনে পৌছাইল তখন গাড়ীর শেষ ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। গাড়ীর সামনের দিক হইতে "রাজু"—"রাজু" বলিয়া

চীৎকার করিয়া ছুটিল সোমনাথ। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে, আর 'রাজু-রাজু' চীৎকার করিতেছে। ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পাইল—তবু ডাকিতেছে সোমনাথ,—প্রাণপণ ডাকিতেছে।

সোমনাথের 'রাজু-ডাক্' বুঝি প্লাটফরমের মর্মভেদ করিয়া তুলিল। হঠাৎ ট্রেনের শেষ দিক হইতে রাজু সোমনাথকে দেখিতে পাইয়া 'দাদা' বলিয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিল। ট্রেনের শেষভাগ তখন প্লাটফরম ছাড়িয়া যাইতেছে। সোমনাথ দৌড়াইয়া রাজুর হাত ধরিতে চেষ্টা করিল। ষ্টেশনের লোকজন চীৎকার করিয়া উঠিল। নির্মম ট্রেন সোমনাথের আর্ত-আবেদন শুনিল না—তাহার 'রাজু' ডাক শেষ হইতে না হইতেই সে প্লাটফরমের উপরে পড়িয়া গেল। ট্রেন তখন সিগ্ন্যাল্ লাইন পার হইয়া গিয়াছে।

কয়েকজন ধরাধরি করিয়া সোমনাথকে উঠাইল। সাবিত্রী সোমনাথের মত তাড়াতাড়ি আসিতে পারে নাই। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে কথা কহিবার কিছুই তাহার রহিল না। অ্যাম্বুলেন্স আসিল। সোমনাথকে কাছেই এক হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল।

সোমনাথের বুকে চোট লাগিয়াছিল, তবে খুব বেশী নয়। হাসপাতালের প্রাথমিক চিকিৎসার পর সাবিত্রী তাহাকে বাসায় লইয়া আসিল। সাবিত্রীর সেবায় ও যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই সোমনাথ সুস্থ হইয়া উঠিল।

মর্মাহত অন্ধ শ্বশুর ও দুবল স্বামীকে লইয়া সাবিত্রীর নূতন সংসার। মহিম সেদিন সাবিত্রীকে কাছে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—সাবিত্রীর এমন সেবা না হইলে সোমনাথ এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিত না।

অন্ধ হইলেও সব দিকে যেন মহিমের দৃষ্টি। তিনি স্নেহ-কণ্ঠে সাবিত্রীকে বলিলেন, ওদের জন্য তুমি দুঃখ ক'রো না মা। তোমার কথায় বুঝতে পারি, রাজু আর রাজুর মায়ের জন্য তুমি কত ভাব। না, না, ওদের কথা তুমি ভেব না। ওরা এতবড় নৃশংস, আমার এই অন্ধ অবস্থা, আমাকে একলা ফেলে আমার সহধর্মিনী, মেয়েটাকে

পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে চলে গেলেন। কিন্তু ও কেন গেল ষ্টেশনে। না গেলে এই বিপদে তোমাকে ত' পড়তে হ'ত না মা।

' বিপদ বলে দুঃখ করিনা বাবা। দুঃখ—মা এইভাবে চলে যেতে পারলেন। আমার জন্যই যদি এই অনর্থ, আমাকে কেন তা খুলে ব'ল্লেন না। বিপদকে জীবনে বড় করে দেখি নি বাবা, কিন্তু এ বেদনার সান্ত্বনা যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না,—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

মহিম তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সাবিত্রীকে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন, না না, তুমি ওসব কিছু মনে ক'র না মা। ওরা চলে গেছে, আমি যেন একটু নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি। মন যাদের কাছে কিছুই নয়, সামগ্রী হ'য়ে যারা মূল্য আদায় কত্তেই শুধু শিখেছে, তাদের জন্য সংসারে অনেক দুঃখ, তা ত' তুমি বোঝ মা। তোমার সঙ্গে একদিন কথা বলেই আমি তা বুঝেছি।

এই বলিয়া মহিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। এই দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ যে কতখানি মর্ম্মন্তুদ, তাহা সাবিত্রী বুঝিতে পারিল। সে শুধু চিন্তা করিতে লাগিল, এমন অঘটনও ঘটিতে পারে যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।

সংসারে এমনই ত' ঘটে। ভাবিবার অবসর দিয়া কোন ঘটনাই ঘটে না। সাবিত্রী যেদিন বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিনও কি সে ভাবিতে পারিয়াছিল, বাবা মা ভাইবোন ছাড়িয়া সে চলিয়া আসিতে পারে? অনুরূপার আশ্রয়,—সেও কি কোন চিন্তার মধ্যে আনিয়াছিল? সোমনাথের সঙ্গে পরিচয় এবং পরিণয়,—সেও অভাবনীয়। কিন্তু 'রাজুর মা' যাহা করিয়াছেন তাহা যে সাংঘাতিক। অন্ধ স্বামীকে কোন স্ত্রী এইভাবে ফেলিয়া যাইতে পারে তাহা ত' চিন্তার মধ্যে আসে না।

অথচ সাবিত্রী জানে এই মহিমের জন্যই প্রদীপের মত পুড়িয়া শেষ হইতেছেন অনুরূপা। সূচের আঘাত যাঁহার সহ্য হয় না, সারা জীবন পুষ্পার্ঘ সাজাইয়া যে বসিয়া রহিল, সে কাছেও আসিতে পারিল

না, আর যাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বরণ করিয়া গৃহে আনা হইল,—অন্ধ স্বামীকে একা রাখিয়া ভাইএর সঙ্গে চলিয়া যাইতে সে সতীলক্ষ্মীর এতটুকু কুণ্ঠা হইল না।

হায় রে সংসার! নদীর বুকে আজ চড়া পড়িয়াছে, অনুর্বরতায় দেশের মাটি আজ বালু-প্রস্থ হইয়াছে। প্রবল স্রোতাবেগে ঐ চড়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। শস্য-শ্যামলতায় ঐ বালু-প্রান্তর ভরিয়া দিতে হইবে। তাহার দায়িত্ব যাহারা লইবে, তপ্ত বালুকার আঁধিতে তাহারা কলঙ্কিত হইবেই। সে কলঙ্কের ভয় করিলে চলিবে না—ভাবিতে ভাবিতে, এই দৃঢ় সংকল্পই সাবিত্রী করিয়া বসিল।

১৭

সোমনাথ ভাল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন হইল অফিসে যাইতেছে। শ্বশুর ও স্বামীকে লইয়া সাবিত্রীর সংসার। তবু এই সংসার-যাত্রার মধ্যে কেন যেন মনে শান্তি পায় না সাবিত্রী। সোমনাথ কেমন যেন একটু নির্লিপ্ত থাকিতে চায়। রাজুর অভাব তাহাকে যে বেদনা-কাতর করিয়া তুলিয়াছে সাবিত্রী তাহা বুঝিতে পারিত। বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই এমন একটা নির্মম আঘাত মহামায়া তাহাকে দিতে পারেন, সে তাহা কল্পনা করে নাই। তবু আঘাত সে পাইল।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে সোমনাথ। সোমনাথের জন্য চা ইত্যাদি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল সাবিত্রী।

চা খাওয়া শেষে সাবিত্রী সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই?

—কেন?

—বেশী কথা ব'ল না, কি হ'য়েছে তোমার?

—কই—কিছু হয়নি ত?

—হ'য়েছে বৈ কি, আজ ক'দিন হ'ল তুমি আমার সঙ্গে কটা কথা ব'লেছ? আমার জন্য তোমার মা চলে গেলেন, রাজু চলে

গেল—এসব হবে তুমি কি আগে জান্‌তে না? তাহার কণ্ঠও কাঁপিল না, চোখেও জল আসিল না।

সোমনাথের চমক্ ভাঙ্গিল। তাহার মনের নিস্ক্রিয়তা যে সাবিত্রীকে ব্যথিত করিতে পারে তাহা সে ভাবে নাই। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না না না, ওই রাজুটা—ওই রাজুটা,—

সাবিত্রী বলিল, বুঝতে পারি রাজু চলে গেছে, তোমার মন খুব খারাপ। কিন্তু আমিও ত' মানুষ।

লক্ষ্মীটি, রাগ ক'রো না, বলিতে বলিতে সে সাবিত্রীর সম্মুখে উঠিয়া আসিল। তাহার কাঁধের উপরে নিজের হাত দু'খানি রাখিয়া সে আবার বলিল, আমি অত বুঝি নি, সত্যি বিশ্বাস কর। আমি যেন মনে শান্তি পাই না। শরীরটাও বোধ করি ভিতরে ভিতরে দুর্বল হ'য়ে আছে। শুধু মার কথাই মনে হয়। এমন করে কেউ চলে যেতে পারে? যত দোষ লোকে তোমাকেই ত' দেবে। লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী রাজুটাও চলে গেল—যাক্‌গে আপদ গেছে;—বলিতে বলিতে সোমনাথের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে খোলা জানলার ধারে চলিয়া গেল।

সাবিত্রী লজ্জিত হইল। সে উঠিয়া সোমনাথের পিছনে যাইয়া দাঁড়াইল। তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ভেব না, আমি মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই। মানুষে কি ব'ল্লে, কি না ব'ল্লে, তা নিয়ে ত' আমাদের মন খারাপ ক'রলে চলবে না। বাবা শুন্‌লে দুঃখ পাবেন। মানুষের অজ্ঞতায় যে পাপ, তাকে স্বীকার ক'রবার দুর্বলতা তোমার ত' নেই।

সোমনাথ উৎসুক নয়নে সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটু পরে বলিল, তুমি মাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব।

—মা যে রাগ ক'রে চলে গেলেন।

—আমার উপরেই ত' তাঁর রাগ। আমি মধুপুরে যাব। তুমি

দেখো, আমি মাকে ফিরিয়ে আনবই। আর রাজুকে ত' আনতেই হবে। আমাদের ঘরের মেয়ে মামার বাড়ী পড়ে থাক্‌বে কেন ?

সোমনাথের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দু'হাতে সোমনাথের হাত দু'খানি মৃদু দোলাইতে দোলাইতে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে সাবিত্রী বলিল, আর বলি রাজুকে, ধন্যি মেয়ে বাবা। দাদার কথা একেবারে ভুলে গেলি ? এদিকে যে 'হা রাজহংসী' 'হা রাজহংসী' করতে করতে দাদা বেচারীর প্রাণ যায়।

সোমনাথ বুঝিল রাজুকে লইয়া সাবিত্রী ঠাট্টা সুরু করিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গেল। মেঘমুক্ত রবিকে কাহার না ভাল লাগে। সাবিত্রীর চাহনি-চটুল হাসি দেখিয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল সোমনাথ।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, কি ?

কিছু না,—বলিয়া সোমনাথ সাবিত্রীকে দু'হাতে জোরে আকর্ষণ করিল। সোমনাথের বক্ষ-আশ্রয়ে, বাহুপাশে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া সাবিত্রীর আর কোন উপায় রহিল না। আবেশ-মধুর-সন্ধ্যা মিলন-অনুরাগে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী কহিল,—ছাড়।

পরম তৃপ্তিতে সোমনাথ ঘরের বাহির হইয়া গেল।

১৮

হরলাল নিজের দিদি মহামায়া ও ভগ্নী রাজুকে লইয়া যথাদিনে মধুপুরে পৌঁছাইলেন। সুনয়নীর বিবাহের পরে এই প্রথম মহামায়াকে সে দেখিল। সুনয়নী ইহাদের পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইল। আদর আপ্যায়নে মহামায়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন।

মহামায়া বলেন, বৌ, আমার 'মা'ও এমন ক'রে আমাকে আদর করেন নি। হরলাল তোমাকে পেয়ে সত্যি সুখী হ'য়েছে।

—কি যে ব'লছেন দিদি, কি-ই বা কচ্ছি এমন। ওঁর মুখেই

আপনার কথা শুনেছি, কোনদিন দেখিনি ত'। কত যে ত্রুটি হ'চ্ছে আপনার যত্নের তা ত' বুঝি।

অমন কথা ব'লো না বৌ, আমি ত' স্বর্গসুখে আছি।

এমন করিয়া বেশ কয়েকদিন কাটিল। রাজুকে লইয়া দিদি কেন চলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুনয়নী শুনিয়াছে,—হরলাল ও মহামায়ার নিকট হইতে। তাহাদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সাবিত্রী নামে কাশীর একটি ধিঙ্গি বেহায়া মেয়ে অকস্মাৎ সোমনাথের স্কন্ধে ভর করিয়াছে এবং তাহার দৌরাত্ম্যে উঁহারা আগ্রা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজুর কাছেও সুনয়নী সাবিত্রীর কথা গোপনে শোনে। সাবিত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা না করিতে পারিলেও সোমনাথ যে যেমন তেমন একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে না, সে ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইল। তাই সেদিন সন্ধ্যার পর স্বামী হরলালকে এই প্রসঙ্গে সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিল ;—

—আচ্ছা সাবিত্রীকে দেখতে কেমন ?

—দেখতে মন্দ নয়,—ভালই।

—বি-এ পাশ না ?

—হ্যাঁ।

—সোমনাথ নিজে পছন্দ ক'রে—

—পছন্দ ক'রে ? প্রেম ক'রে বল।

—বেশ তো হ'ল না হয় প্রেম ক'রেই বিয়ে ক'রে এনেছে। আর সেই ছেলে আর ছেলের বৌ এর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তুমি দিদিকে এখানে নিয়ে এলে,—ভাবলে না কিছুই ?

মহামায়া পাশের কামরায় ছিলেন। তিনি সুনয়নীর কথা শেষ হইতে না হইতেই এই ঘরে আসিলেন। তিনিই তাহার কথার জবাব দিলেন ;—ভেবেই হরলালকে চিঠি দিয়েছিলাম, ভেবেই ও আমাকে নিয়ে এসেছে বৌ। তুমি কি একে বিয়ে বল ? জানা নেই, শোনা নেই, কি জাত, কি গোত্র তার ঠিক নেই—

সুনয়নী বলিল, কেন, শুনেছি রাজুর মুখে, শিবমন্দিরে তাদের না কি বিয়ে হ'য়েছে ?

—তুমি যাই বল না কেন বৌ, ওকে বিয়ে বলে না।

—নারায়ণ শিলার সামনে হ'লে বিয়ে, আর শিব-মন্দিরে বিয়ে হ'লে বিয়ে নয়, এ কেমন কথা দিদি ?

—ও বিয়েকে আমরা বিয়ে বলি না।

তা না বলতে পারেন, তবু ব'লব দিদি, আপনাদের ধারণা ভুল। আমি অবশ্য সাবিত্রীকে দেখি নি। যতটুকু জানি সোমনাথকে, তাইতেই ব'লতে পারি ওদের ভালবাসার বিয়ে অসিদ্ধ হয় নি।

হরলাল এইবারে কথা বলিলেন। ভালবাসা ? হুঁ। তুমি ত' দেখনি কি সে ব্যাপার ! আমি বসে আছি, তু'জনে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। এতটুকুও লজ্জা নেই। আমিই কি আর ছেড়ে দেবার পাত্র ? দিলাম তু'কথা শুনিয়ে, আরে—আমি তোর চ্যাটাং চ্যাটাং কথার ধার ধারি—বলে বাবার কথার ধার ধারিনি কোনদিন, আর তুই ত' কালকের সোমনাথ, তুধের ছেলে।

সুনয়নী কহিল, কি হ'য়েছে তোমার ? যেমন তোমার মোটা বুদ্ধি, তেমন তোমার কথা। দিদিকে আর রাজুকে নিয়ে এসেছ—বেশ ক'রেছ –কিন্তু মহিমবাবুকে কোন লজ্জায় ফেলে চলে এলে ? সোমনাথ সাবিত্রীকে বিয়ে ক'রে এনেছে, বিয়েই বল আর যাই বল, সোমনাথকে সে জন্য ত্যাগ করতে পারবেন মহিমবাবু ? পারবেন তোমার দিদি ? আজ হোক কাল হোক বাগ পড়ে যাবেই। মাঝখান থেকে তুমি এই নাটকের মহাবীর হ'তে গেলে কোন বুদ্ধিতে ? মহিমবাবুকে ঐ ভাবে অন্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে আসা তোমারই কি উচিত হ'য়েছে ?

স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিলেন না হরলাল।

সুনয়নী আবার বলিল, আমি ত' দেখছি, চোখ থাকতেও তোমরা অন্ধ ; না হ'লে চারদিকের কিছু কি তোমাদের চোখে পড়ে না ? যোগ্য ছেলে যোগ্য বধূ বরণ ক'রে এনেছে, কোথায় তোমরা তাকে

আদর ক'রে ঘরে তুলে নেবে, না রাগরঙ্গ দেখিয়ে দিদিকে নিয়ে একেবারে যেন দিগ্বিজয় ক'রে এখানে এলে। দিদি, আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আমার সংসারে কেই বা আছে বলুন, দু'টো খেতে পরতে আমিও পারব, অপনারাও পারবেন। কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা হয় ত' ভাল শোনাবে না, তবু আপনাকে একটু ভেবে দেখতে বলি। ভালবাসার মিলনই সত্যিকারের মিলন। আপনি কি মহিমবাবুকে ভালবাসেন না?

মহামায়া কোন কথা কহিলেন না, উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

হরলাল চুপ করিয়াছিলেন। দিদি চলিয়া গেলে সুনয়নীকে বলিলেন, নয়নবৌ, তুমি ঠিকই বলেছ, যথার্থ ব'লেছ। আমি ত' অত বুঝিনি। সত্যই ত দিদিকে এমন ক'রে সাত তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা আমার ঠিক হয় নি। কি লজ্জার কথা বল দেখি। কথায় কথায় কি যে হ'য়ে গেল। দিদিকে ব'লব আগ্রায় ফিরে যেতে?

—তুমিই তাকে এনেছ, তুমিই তাকে যেতে ব'লবে? এসেছেন, থাকুন কিছু দিন, পরে নিজেই তোমাকে ব'লবেন।

—যা বলেছ,—তোমার যে বুদ্ধি নয়নবৌ,—এই বলিতে বলিতে স্ত্রীর গর্বে তাহার হাসির পর্দা বেশ চড়িয়া গেল।

সুনয়নী স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, কি যেন তুমি ভাবছ নয়ন বৌ?

—না কিছু নয়, আচ্ছা—ধর, যদি সাবিত্রী আর সোমনাথ দিদিকে ফিরিয়ে নিতে আসে, তুমি তাদের বাসায় উঠতে দেবে ত'?

—এসেই দেখুক না একবার?

—এসেই দেখুক না—মানে?

—দেখুক না—কি ব্যবহার আমি তাদের সঙ্গে করি। নয়নবৌ, আর আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছি আমার অন্যায় হ'য়েছে, সত্যিই অন্যায় হ'য়েছে। মহিমবাবু যে অন্ধ হ'য়ে

গেছেন, রাগের মাথায় আমার একেবারেই খেয়াল হয় নি। সাবিত্রী বা সোমনাথ যদি কেউ আসে, তবু লজ্জার হাত থেকে বোধ করি কিছুটা বাঁচতে পারি।

—আমার যেন কেন মনে হ'চ্ছে ওরা দু'জনেই, না হয় একজন কেউ নিশ্চয়ই আস্‌বে। প্রেমের অনেক দায়,—জান তা কিছু?

অত সব বুঝিনা বাপু। তবে তোমার কথায় এইটুকু বুঝেছি, সোমনাথ সাবিত্রীকে আমরা ফেলে দিতে পারব না। দেখি কয়েক দিন, আসে ভাল, না হয় ওদের রেখে আসবার যা হোক একটা ব্যবস্থা আমাকেই ক'রতে হবে। কাজটা যে এতখানি গর্হিত হ'য়েছে, তা বুঝতেই পারিনি নয়নবৌ,—এই বলিয়া হরলাল উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সুনয়না উঠিল না, একদৃষ্টে সে শুধু স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হরলাল দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

১৯

প্রথমে অস্বীকার করিলেও মহিম শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীকে মধুপুরে যাইবার অনুমতি না দিয়া পারিলেন না। সাবিত্রী একাই মধুপুরে রওনা হইয়া গেল।

সাবিত্রী খুব প্রত্যুষেই মধুপুরে পৌছাইয়াছে। হরলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসা চিনিয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই তাহার। বাসার সম্মুখে আসিয়া সে দেখিল হরলাল মামা ফুল-বাগিচায় পায়চারি করিতেছেন। হরলালও সাবিত্রীকে দেখিয়া চিনিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ফুলের বাগিচা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে আমাদের সোমনাথের স্ত্রী, সাবিত্রী যে, এস এস। তা চিঠি দাওনি কেন মা লক্ষ্মী। চল চল, ঘরে চল।

সাবিত্রী হরলালের এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য বোধ করিল কিন্তু

কিছুই বলিল না, শুধু প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। হরলাল প্রসন্নচিত্তে সাবিত্রীকে লইয়া বাসার ভিতরে আসিলেন।

আসলে হরলাল লোক মন্দ নয়, একটু 'রগচটা' এই যা দোষ। হঠাৎ না বুঝিয়া রাগেন আবার বুঝাইয়া দিলে বুঝেন। দিদি বুঝাইলেন, সোমনাথের বিবাহ বিবাহই নয়, হরলাল তাহা বুঝিলেন। মধুপুরে আসিলে, সুনয়নী আবার বুঝাইল,—বিবাহ যখন হইয়াছে ফেলিয়া ত' আর দেওয়া যাইবে না; হরলাল তখন স্ত্রীই ঠিক বলিতেছেন, বুঝিলেন।

রাজু সাবিত্রীকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা, বৌদিকে লইয়া সে যে কি করিবে বুঝিতে পারিল না। সাবিত্রী, মহামায়া ও সুনয়নীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

—কেমন আছেন মা, কেমন আছেন মামীমা ?

মহামায়া কোন কথা কহিলেন না। সুনয়নী বলিল, ভালই আছি, তোমরা ত' সব ভাল আছ বৌমা ?

—হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন।

মহামায়া কথা কহিতে পারিতেছেন না, সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করিল। সে পুনরায় মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি আমার উপরে রাগ ক'রে চলে এলেন মা। আমি আপনার মেয়ে, যদি আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, যদি কোন কারণে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রে থাকি, আপনার পা ধ'রে আমি ক্ষমা চাইছি মা। ফিরে চলুন। বাবা চুপ ক'রে বসে থাকেন, আপনার ছেলে কথা বলে না, জানেন ত' রাজু তাঁর কাছে কি। আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে না নিয়ে কিছুতেই ফিরে যাব না। মামীমা, মাকে যেতে বলুন।

—আপনার বৌ-এর কথা শুনেছেন দিদি। দিদি অনেকদিন পরে এসেছেন ভাইএর কাছে, আবার কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই যাবেন। তোমার উপরে রাগ ক'রে দিদি চলে এসেছেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাই কি হয়। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা, ব'স, —হাসিমুখে বলিল সুনয়নী।

সাবিত্রী কহিল, আমাকে কথা দিন মা। আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আপনার ছেলে ষ্টেশনে পর্যন্ত এসেছিলেন। আপনাদের যখন দেখতে পেলেন তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আপনাদেরও ফেরাতে পারলেন না, নিজেও 'অ্যাক্‌সিডেন্ট' ক'রে প্রায় এক মাস ভুগলেন।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, অ্যা—সে কি?

সাবিত্রী বলিল, হ্যাঁ, তাঁকে সুস্থ ক'রে তবে আমাকে আসতে হ'ল, তা না হ'লে আপনাদের আসবার পরদিনই আমি এখানে এসে হাজির হ'তাম।

রাজু চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। দাদাকে ছেড়ে একদণ্ড আমার ভাল লাগে না।

—তাঁরও হয়েছে তাই। রাজু হতভাগী চলে গেল, সব সময় মুখে লেগেই আছে। এতটুকু শান্তি নেই বাড়ীতে। মা,—আগ্রায় ফিরে চলুন। বেশ আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে যদি আপনার কাছে স্থান না দেন, আমিই যদি আপনার ক্ষোভের কারণ হই, আমি আপনাকে আগ্রায় পৌঁছে দিয়ে জন্মের মত চলে যাব আগ্রা ছেড়ে।

রাজু বৌদির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, ইস্ চলে যাবে—যেতে দেবই আর কি।

সুনয়নী সাবিত্রীর কথা বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, রাজু ঠিক কথাই ব'লেছে। তুমি হ'লে ঘরের লক্ষ্মী, তুমি কেন যাবে বৌমা। যাই বলুন দিদি, আমি আগেও ব'লেছি, এখনও ব'লছি, এমন ক'রে চলে আসা আপনার ভাল হয় নি। অপমান আপনি কাকে ক'রলেন দিদি! এমন লক্ষ্মী-প্রতিমা বৌ কার হয়? দেখুন ত' এই পর্যন্ত ছুটে এসেছে। আপনি মনে আর কিছু 'কিন্তু' রাখবেন না দিদি। ফিরে যান। হাজার হ'লেও আপনার ভাইটি আকাট মুখ্যু, গোঁয়ার, সোজা বোঝালেন সোজা, বাঁকা বোঝালেন বাঁকা। তুমি এস ত' বৌমা,—তোমাকে ভাই 'বৌমা' ব'লব না, কি বলব বল না?—এই

বলিয়া হাসিয়া সাবিত্রীর হাত ধরিয়া সুনয়নী তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

কয়েকদিন মধুপুরে থাকিয়া মহামায়া বুঝিয়াছিলেন এখানে তাহার থাকা হইবে না। কারণ হরলাল ঝোঁকের মাথায় উহাদের লইয়া আসিলেও, বাসায় ফিরিলে সুনয়নীর কথায় ভুল বুঝিতে পারিলেন। মহামায়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, বলিতে গেলে নিজেই ত' জোর করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছেন, কেমন করিয়াই বা আবার আগ্রায় ফিরিয়া যান। সাবিত্রী লইতে আসিয়াছে, তিনি আজ যেন সাবিত্রীকে অন্য চোখে দেখিলেন। মনে হইল তাহারই সোমনাথের স্ত্রী, তাহারই পুত্র-বধূ, তাহারই সাবিত্রী, তাহাকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে আসিয়াছে। ইহা মনে করিয়া তিনি বিশেষ স্বস্তি বোধ করিলেন।

দু'দিন কাটিল। সুনয়নীর আদর যত্নে সাবিত্রী মুগ্ধ হইল। সুনয়নীও প্রায় সাবিত্রীর সমবয়সী। অল্প সময়ের মধ্যেই দু'জনার বেশ ভাব হইয়া গেল।

আহারাদির পরে সাবিত্রীকে লইয়া সুনয়নী গল্প করিতে বসিয়াছে। রাজু বৌদির কাঁধের উপরে মুখ রাখিয়া উহাদের কথা শুনিতেছে।

সাবিত্রী বলিল, আপনার নামটি বেশ।

সুনয়নী উত্তর করিল, তোমার নামটি যে আরও ভাল।

—আপনার কাছে কিছুই নয়।

—আবার 'আপনি' কেন ভাই। বল 'তুমি', দু'দিন ধরে তোমাকে 'তুমি' বলাতে পারলাম না।

—বলনা বৌদি 'তুমি',—বলিল রাজু।

—আচ্ছা ব'লব, বলিল সাবিত্রী।

—না এখনি বল 'তুমি', সুনয়নী হাসিয়া চাহিল সাবিত্রীর দিকে।

সাবিত্রী সুনয়নীর হাত দু'খানি ধরিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা 'তুমি'।

রাজু হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল—বৌদি 'তুমি' ব'লেছে—মামী, 'তুমি' ব'লেছে।

সুনয়নী বলিল, বেশ 'তুমি' যেন হ'লাম, আমাকে তুমি তাহ'লে কি ব'লে ডাক্‌বে ?

রাজু কহিল, আমি ব'লব,—'নয়নমামী'।

বেশ নাম, সুন্দর নাম, নয়নমামী, কহিল সাবিত্রী।

দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। সাবিত্রী হাসিতে হাসিতেই বলিল, নাম রাখাতে ওরা ওস্তাদ। রাজুর নাম ওর দাদা রেখেছেন—রাজহংসী।

রাজু আবার বলিল, জান বৌদি, মামা—মামীকে 'নয়ন-বৌ' ব'লে ডাকে।

তাই নাকি,—হাসিল সাবিত্রী।

সুনয়নী কহিল, দুষ্টু মেয়ে সব লক্ষ্য ক'রেছে। আচ্ছা বল্ দেখি আমি তোর বৌদিকে কি ব'লে ডাকব' ?

রাজু উত্তরে কহিল, দাদা ত' আর বৌদিকে কিছু ব'লে ডাকে না।

ডাকেরে ডাকে, তুই শুনিস্ নি,—এই বলিয়া সুনয়নী বক্র-কটাক্ষে সাবিত্রীর দিকে চাহিল।

সাবিত্রী কথা কহিল না, শুধু মৃদু হাসিল।

আমি তোমাকে 'সাবিত্রী সই' ব'লেই ডাকব,—এই বলিয়া সুনয়নী সাবিত্রীর থুথ্‌নি ধরিয়া তাহার গালে ছোট্ট একটি চুমা খাইল।

সাবিত্রীর সত্যিই ভাল লাগিল সুনয়নীকে,—ভাবিল, হরলাল মামা ভাগ্যবান, তাই দ্বিতীয় পক্ষেও এমন স্ত্রী পাইয়াছেন। তাহার আন্তরিকতা সাবিত্রীর মর্ম্মস্পর্শ করিল।

দুই বন্ধুতে কত গল্প হইল। রাজু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গল্প হইল—কেমন করিয়া সোমনাথের সঙ্গে পরিচয়, কেমন করিয়া ভাব বিনিময়, কেমন করিয়া বিবাহ—কোন কথাই গল্পের মধ্য হইতে বাদ পড়িল না।

গল্প শুনিতে শুনিতে সুনয়নীর চোখে জল আসিল। সে উঠিয়া

সাবিত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী 'সাবিত্রী সই'— এই বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রীর বুঝিতে বাকী রহিল না, সুনয়নীর বেদনা কোথায় বাজিয়া উঠিয়াছে। হাসিয়া খেলিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিলেও তাহার অন্তরের অশ্রু আজ কি প্রমাণ করিয়া দিল, তাহার সন্ধান ত' কেহই করিল না।

কেহ করেও না। এ সংসারে সুনয়নীরা এমন কত হাসিয়াছে, খেলিয়াছে, হয় ত প্রশংসাও পাইয়াছে। আর অন্ধকার রাত্রে স্বামীর শয্যা পার্শ্বেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনিদ্র রজনী যাপিয়াছে,—আজিও যাপিতেছে। নব-মল্লিকার পাঁপড়িগুলি উত্তরীবায়ে নীরবে ঝরিয়া যায় তাহা কেহ চাহিয়াও দেখে না!

এই কলনৃত্যা নির্ঝরিণীর বুকে যে সাতসমুদ্র জমাট বাঁধিয়া আছে তাহা নিমেষেই সাবিত্রীর কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হরলাল দিদিকে ডাকিয়া সেদিন বুঝাইতেছিলেন, দেখ দিদি, আমি তোমাকে আগ্রা থেকে নিয়ে এসেছি। কথায় বলে ব্রাহ্মণের বোন উপবাতের চেয়েও বড়। আমি যদি শাক ভাত খাই, তোমারও জুটবে। কথা তা নয়। স্বামী, স্বামীর ঘর, ছেলে, এদের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে ত'? সেটা ভুলে গেলে—ভগবানের কাছে জবাব দিতে হবে। তাই বলছিলাম, সাবিত্রী যখন এসেছে— কথা এখানেই থামাইয়া দিদির মুখের দিকে তাকাইলেন হরলাল।

হরলালের কথার অর্থ খুবই সহজ। মহামায়া যে ভুল এবং অন্যায়, দুই-ই করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছেন। মধুপুরে আসিয়া এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে একথা তিনি আগে ভাবিতে পারেন নাই। এমন সময়ে সুনয়না আসিল। রাজু তখন ঘরে বৌদির সঙ্গে বসিয়া বসিয়া দাদার কথা শুনিতে ব্যস্ত।

সুনয়নী মহামায়াকে বলিলেন, যাই বলুন দিদি এমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আগেকার দিনের মন নিয়ে এখন থাকলে চলবে না দিদি। যে যুগের যে হাওয়া তাকে মানতে হবেই।

হরলাল বলিলেন, দেখ নয়নবৌ, আমরা একটু সেকেলে, চোখের উপরে সব যেন কেমন বরদাস্ত ক'রতে পারিনে।

মহামায়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, বৌ, তুমি আমার বয়সে ছোট, সম্পর্কেও ছোট, তবু তোমাকে আজ নমস্কার কচ্ছি,—এই বলিয়া তিনি হাত জোড় করিলেন।

সুনয়নী তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল, ও মা—একি ক'রছেন দিদি?

মহামায়াকে প্রণাম করিল সুনয়নী। সাবিত্রী পূর্বেই দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সব কিছুই শুনিল এবং দেখিল। ভাবিল, এই শ্যামবর্ণা নিঃসন্তান মেয়েটির কথা বলিবার, মানুষকে আকৃষ্ট করিবার, কি অদ্ভুত ক্ষমতাই না রহিয়াছে। সাবিত্রী মনে মনে তাহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিল।

সেদিনের আলোচনায় ঠিক হইল, আগামী কাল সকালের গাড়ীতেই উহারা সকলে আগ্রায় যাত্রা করিবেন।

রাত্রে একই বিছানায় দুই বন্ধুতে শুইয়াছে—সুনয়নী আর সাবিত্রী। আগামী কালই সাবিত্রী চলিয়া যাইবে। ঠিক এই রাত্রিটার মত আর একটি রাত্রি তাহাদের জীবনে আর আসিবে কি না কে জানে। তাই কথারও যেন অন্ত ছিল না দু'জনার। ঘরে উজ্জ্বল আলো—সেও কি উহাদের কথা শুনিতেছে না কি!

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, নয়নমামী, জীবনটাকে এমন ক'রে তুমি অভিনয়ে ভরে দিলে?

কি ক'রব বল্ দেখি সই, বলিতে লাগিল সুনয়নী,—কোন উপায় নেই; মরণ ত' হয় না, তাই অভিনয় করি। অভিনয় যারা বোঝে না তারা ত' খুশী হয়। না হ'লে ব্যথা আরও বেড়েই চলে। আর তাছাড়া—সাধারণ সংসারে অভিনয় আমাদের সহজাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বহু কাপুরুষ স্বামী সেই অভিনয় বেশী ক'রে আমাদের প্রতি আরোপ ক'রে ক'রে আমাদের প্রকৃতি অভিনয়-ধর্মী ক'রে ফেলেছে। ভালবাস্‌তে আর পারলাম কই সই, আর দিলেই বা কে?

তোমাকে পেয়ে যেন হাঁফ্ ছেড়ে বেঁচেছি এ ক'দিন। ক'টা দিনের জন্যও বুঝি জীবনকে ফিরে পেলাম। তুমি চলে যাবে, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

সুনয়নী কাঁদিতেছিল। সাবিত্রী তাহা বুঝিতে পারিল কিন্তু অশ্রু প্রবাহকে বাধা দিল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

সুনয়নী বাষ্প-কম্প্র কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল, আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি সই, ভাল না বাসলে কি ভালবাসা যায়? সে ব'লেছিল, তোমাকে ভালবেসেছি—তাই সারা পৃথিবীকে ভালবাসি। তোমার হাতে বাঁধন পড়ল—আমার যাত্রা সুরু হ'ল পৃথিবীর বন্ধন-বিহীন অনন্ত পথে। দেখবে তার ফটো?

এই বলিয়া সুনয়নী একটি সুন্দর ছোট্ট ফটো সাবিত্রীকে দেখাইল। সাবিত্রী চম্‌কিয়া উঠিল,—সে ইহাকে চেনে।

২০

আগ্রায় ফিরিয়া আসিয়াছেন মহামায়া। মহিম রাগ করেন নাই। কয়েকদিন নীরবেই কাটিয়া গেল। সেদিন বৈকালে সোমনাথ, সাবিত্রী ও রাজু বেড়াইতে গিয়াছে। বাসায় মহিম এবং মহামায়া।

মহামায়ার মনে স্তূপীকৃত অনুশোচনা—বাহির হইবার অবসর খুঁজিতেছিল। এ ক'দিন ধরিয়া নিজের গ্লানিতে নিজেই দগ্ধ হইতে-ছিলেন। মহিমের ঘরে আসিলেন মহামায়া এবং তাঁহার কাছে বসিলেন।

—কে?—জিজ্ঞাসা করিলেন মহিম।

—নতুন বৌ,—উত্তর করিলেন মহামায়া।

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিলেন, অনেকদিনের কথা মনে ক'রিয়ে দিলে। 'নতুন বৌ' ব'লে ডাকতাম তোমাকে। তুমিই একদিন ব'লেছিলে, আমাকে তুমি 'রাজুর মা' বলে ডেকো। তোমার কথাই মেনে নিয়ে আছি আজও। আজ আমার 'নতুন বৌ'কে ফিরে

পেলাম। এমন ক'রেই বুঝি জীবনের হারান সব কিছু ফিরে আসে। —ওরা কি সবাই বেড়াতে গেল?

—হ্যাঁ, উত্তরে বলিলেন মহামায়া। তিনি ধরা গলায় পুনরায় বলিতে লাগিলেন, শুধু এই কথাই আমি ভেবে পাইনে, আমার এত বড় অপরাধ তুমি ক্ষমা ক'রলে কি করে?

মহিম কিসের যেন আনন্দ উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার মনের ছবি মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, দেখ 'নতুন বৌ', আজ আমার বাড়ীতে সুন্দরের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সারা অন্তর দিয়ে অনুভব ক'রছি যেন তাঁর একান্ত আবির্ভাব। তুমি—নতুন বৌ—বুঝি তার দূতী হ'য়ে এলে। আজ তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রো না। ক্ষমা কি ক'রে তোমাকে ক'রতে পেরেছি—জিজ্ঞাসা ক'রলে যদি, তবে শোন। ক্ষমা করা যায় দু' রকমে। এক রকম তাচ্ছিল্যের ক্ষমা, অন্য রকম ভালবাসার ক্ষমা। কিন্তু এমনই মজা,—তুমি বলো আমি তোমাকে ভালবাসি না—আবার তোমাকে তাচ্ছিল্য করি এমন কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তবু তোমাকে ক্ষমা ক'রেছি।

মহামায়া কোন কথা কহিলেন না। কথা কহিতেও পারিতে-ছিলেন না।

মহিম আবার বলিতে লাগিলেন, নতুন বৌ, মানুষকে নিজের গণ্ডীটুকু দিয়েই বিচার ক'রতে নেই, বিচার ক'রো না। তোমার ভাই হরলাল, সেদিন উত্তেজিত হ'য়ে তোমারই ক্ষতি ক'রেছিল সব চাইতে বেশী। সাবিত্রীকে তোমার ছেলে কুড়িয়ে আনেনি—বিয়ে ক'রেই ঘরে এনেছে। তাকে অপমান ক'রতে গিয়ে অপমান করলে তুমি নিজেকে। সে তোমাকে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে এনেছে। এ তার দুর্বলতা নয়, এ তার মনের বিপুল শক্তির পরিচয়। সোমনাথ ভুল করেনি। আমার জীবনে আমি ভুল ক'রেছিলাম।

বাধা দিয়া মহামায়া বলিলেন, ওকথা থাক।

মহিম বলিলেন, না—থাকবে কেন 'নতুন বৌ', শোন'। মানুষের

জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলি। মনের দাম ত' আমাদের সমাজে নেই, আছে শুধু খোলস নিয়ে মারামারি, বলিতে বলিতে থামিলেন মহিম।

তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, যাক্‌গে যা বলছিলাম। আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভুল কাউকে আমি জানতে দেইনি। তবু আমার এমনই ছিল পরিবেশ,—তুমি না জানলেও আমার বহুরঞ্জিত কলঙ্কের কথা সকলেই জানত, হরলালও জানত। তা জেনেও এই চরিত্রহীনের হাতে হরলাল ও তার সমাজ তোমাকে তুলে দিলেন কেন? আমি যদি তোমাকে ভাল না বাসতে পারি—তার প্রশ্ন তুমি ক'রবে কার কাছে? 'মার্কামারা' চোরের কাছে ধর্ম-সিন্দুকের চাবী দিলেই তাকে ধার্মিক করা যায় না। এটা ত' বোঝ। তাঁরা কেন এই কথাটা বুঝ্‌লেন না। যাক্, তবু বলি শোন, আমি তোমাকে কখনও অসম্মান করিনি। আমার ভালবাসা, তা থেকেও তোমাকে বঞ্চিত করিনি। ভালবাসা কলসীর তোলা জল নয়, একজন নিলেই ফুরিয়ে যায় না। যে একজনকে সত্যিকারের ভালবাসে, সেই পারে সকলকে ভালবাসতে।

মহামায়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মহিমকে কোনদিনই তিনি যেন এমন করিয়া চিনিতে পারেন নাই। অসুখের পর মহিমের চোখ যখন খারাপ হইয়া গেল,—তখনও বোধ করি এত অশ্রু তাহার ভিতরে জমা হয় নাই। তিনি মহিমের পা ধরিয়া, তাহার উপরে নিজের অশ্রুসিক্ত গণ্ড রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, তুমি আমাকে শাস্তি দাও, অনেক শাস্তি দাও। তোমাকে আমি যে কত ভুল বুঝেছিলাম, তোমাকে কত কষ্ট যে আমি দিয়েছি। আমি জানি আমার এ মহাপাপের মার্জনা নেই, মার্জনা নেই।

মহিমের কণ্ঠেও কথা সরিতেছিল না। তিনি মহামায়ার হাতখানি ধরিয়া রুদ্ধ আবেগে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কেঁদ না 'নতুন-বৌ'। তোমাকে সত্যি আজ আমি ফিরে পেয়েছি। আজ আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। বাংলাদেশে বহু স্বামী-স্ত্রী আছে, যারা কেউ

কাউকে চেনে না, তবু সংসার করে। কার কোথায় দুঃখ, কার কোথায় ব্যথা জমা হ'য়ে আছে, কে তার সন্ধান রাখে? তোমার উপরে আমার এতটুকু দ্বেষ ছিল না। তুমি আমার স্ত্রী, সে কথা আমি কেমন ক'রে ভুলব? কখনও ভুলিনি। রমা আর আমি এক সঙ্গে 'নবগঙ্গার' জলে ডুব দিয়েছিলাম, সে নদীস্রোত ত' এখনও প্রবাহমান, তাকে অস্বীকার ক'রব কোন্ লজ্জায়? হয়ত' কোনদিন তার সঙ্গে আর দেখা হবে না, নাই বা হ'ল দেখা, তবু তাকে হারাই নি। তাকে মনে রেখেছি বলে, তোমাকে গ্রহণ করিনি, এ কথাও সত্য নয়। তোমাকে উপেক্ষা আমি কোনদিনই করিনি,—তাই করিনি বলে—আজ আমার 'নতুন-বৌ'কে আমি ফিরে পেয়েছি।

এমন সময়ে বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। মহামায়া ভাবিলেন, সোমনাথেরা বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে।

ওরা ফিরে এল—দরজাটা খুলে দিয়ে আসি। সন্ধ্যাও লেগেছে। আলোটাও জ্বেলে দেই,—এই বলিয়া তিনি ঘরের আলো জ্বালাইয়া দিলেন।

মহিম বলিলেন, আলো জ্বললে, অন্ধ চোখেও আলোর রশ্মি ভেসে ওঠে—না?

মহামায়া বলিলেন, দরজাটা খুলে দিয়ে আসছি।

দরজা খুলিলেন মহামায়া।

স্মিতহাস্যে মহামায়াকে নমস্কার করিয়া বলিলেন অনুরূপা, আমি সাবিত্রীর মাসিমা।

—বেয়ানদিদি? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

অনুরূপা ভিতরে আসিলেন।

মহামায়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, সাবিত্রী ব'লছিল কয়েকদিন আপনাদের পত্র পায় না। আপনারা দিল্লী যাবেন ব'লে পত্র দিয়েছিলেন, শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ কাশী ছেড়ে দিল্লী আমরা চলে এসেছি। আসব আসব

ক'রে আর চিঠি দেওয়া হয়নি। রাজু কোথায়? তাকে ত' আর দেখিনি, ওদের পত্রেই শুনেছি রাজহংসীর কথা।

দুইজনেই হাসিলেন। মহামায়া বলিলেন, হ্যাঁ, সোমনাথ ওকে রাজহংসী বলে ডাকে।

—কেমন আছে সবাই? আপনার শরীর?—জিজ্ঞাসা করিলেন অনুরূপা।

—ভালই আছে। আমিও ভাল আছি। আপনি, সাবিত্রীর মেসোমশাই—

—তিনি ভালই আছেন। আর আমাকে ত' সশরীরে দেখতেই পাচ্ছেন, এই বলিয়া অনুরূপা হাসিলেন।

হাসি মুখে মহামায়াও বলিলেন, বড় খুশী হ'লাম, আপনি এলেন, আসুন,—সামনের ওই ঘরে আমার স্বামী আছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ক'রিয়ে দেই। জানেন ত' তিনি অন্ধ।

—হ্যাঁ, জানি।

হঠাৎ অনুরূপার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জানিতেন মহিমের সঙ্গে তাহার দেখা হইবে। মহিম অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাহাও জানিতেন, তবু কেন তিনি আসিলেন? যেদিন সোমনাথের কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন, মহিমের অন্ধ হইয়া যাইবার কথা, সেদিন ঐ আঁখি দু'টির কথা মনে করিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন। কত দিনের কত কাহিনী চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।—সেই ছোটবেলা, একদিন কাণা-মাছি খেলিতে খেলিতে মহিমের চোখে লাগিয়াছিল। আঁচল দিয়া সেই চোখে কত মুখের ভাপ দিয়াছিলেন।—সে চোখ দু'টি আর নাই—ভাবিতে ভাবিতে সারারাত্রি তাঁহার চোখেও ঘুম আসে নাই, সেকথা ত' কেহ জানে না, কেহ কোনদিন জানিবেও না। সেই অবধি সবই তিনি করিতেন, কিন্তু মহিমকে দেখিবার প্রবল বাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সোমনাথ ও সাবিত্রীকে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই এখানে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তবু মহিমকে দেখিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা কিছুতেই তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না।

মেয়ে জামাইকে একবার দিল্লী লইয়া যাইতে অনুরূপা আগ্রায় আসিলেন। আগ্রা আসিবার মূল কারণ যে মেয়ে জামাই নয়, শ্রীরাধামোহন তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, মহিমকে অনুরূপা ভালবাসেন। মেঘে বর্ষণপ্রাচুর্য থাকিলে সামান্য ভূমিখণ্ডকেই সে জলদান করে না, একথা শ্রীরাধামোহন বুঝিতেন। তাই অনুরূপাকে ট্রেন পর্যন্ত তিনি তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

মহামায়া অনুরূপাকে সঙ্গে করিয়া মহিমের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহিমকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন তিনি, ওগো সাবিত্রীর মাসিমা, আমাদের বেয়ানদিদি এসেছেন।

—নমস্কার বেয়াই মশাই, কহিলেন অনুরূপা, আর মনে মনে ভাবিলেন, কে কাহাকে পরিচয় করিয়া দিতেছে, কাহার কাছে? জীবন-দেবতার কি এ নির্মম পরিহাস!

মহিম যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। 'বেয়ান দিদির' কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, অ্যা-কে? ও, হ্যাঁ, নমস্কার, ব'সো, না না কি বলছি বসুন, বসুন বেয়ান দিদি।

অন্ধ চক্ষু দু'টি অনুরূপার মুখ বরাবর লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দেখিতে কত যে নিষ্ফল প্রয়াস করিল।

অতিকষ্টে অনুরূপা বসিলেন, বুঝিলেনও মহিম তাহাকে ভুলিয়া যান নাই। এই কণ্ঠস্বরটুকুই তাঁহার মনকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দ ও বেদনায় অনুরূপা বুঝি নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু এত বড় ঝড় বাহিরে প্রকাশ লাভ করিলে, এক মুহূর্তে সব যদি অন্য রূপ ধারণ করিয়া বসে, তখন কি হইবে?

তাই সব কিছু বেদনার ভার নিজের মধ্যে চাপিয়া, সহজ কণ্ঠে মহিমকে বলিলেন, সাবিত্রীর বিয়ের পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কাশী থেকেই আসব ঠিক ছিল। কিন্তু দিল্লীতে চাকুরীটা ওঁর হ'য়ে গেলো; তাই দিল্লীর বাসার হাঙ্গামা মিটিয়ে তবে আস্‌তে পারলাম।

মহামায়া বলিলেন, আপনারা গল্প করুন বেয়ানদিদি', আমি আসছি। এই বলিয়া মহামায়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অনুরূপার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। নিস্পলক নেত্রে তিনি মহিমের চোখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—নিথর,—নিস্পন্দ। শুধু চোখ দু'টি ভরিয়া অশ্রুজল টল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

মহিমই প্রথমে কথা বলিলেন, আপনারা দিল্লী যাবেন শুনেছিলাম। শুনেছি দিল্লী খুব ভাল জায়গা, তা হবে না? চোখ দুটি ত' হারিয়েছি, দেখে আসতাম নাহ'লে, মুঘল বাদশাদের কীর্তি, আর কয়েক দিন আপনাকে বিরক্তও ক'রে আস্‌তাম। তবে চোখ থাক্‌লেই যে সব দেখা যায় তাও ত' সত্যি না—কি বলেন?

একটু হাসিয়া আবার তিনি বলিলেন, তা যাক্, আপনাকে হঠাৎ 'তুমি' ব'লে ফেলেছিলাম, অন্ধ মানুষ বলে ক্ষমা ক'রবেন। আপনার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার জানা এক আত্মীয়ের এত মিল, মনে হ'য়েছিল তিনিই বুঝি এসেছেন। তাঁকে 'তুমি' বলি কিনা,—বলি কেন, বল্‌তাম, এই বলিয়া হাত দু'খানি যুক্ত করিলেন মহিম।

অনুরূপা একদৃষ্টে মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন, হাত জোড় করিতে দেখিয়া তিনি যেন আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। বড় বড় ফোঁটা করিয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কোন কথা না কহিয়াও বুঝি এমন করিয়া কেহ কোনদিন এত কথা কহিতে পারে নাই। সংসারের সব কিছু দেনা-পাওনা শোধ করিয়া ঐ অন্ধ লোকটির জোড়হাতখানি ধরিয়া তিনি কি বলিতে পারেন না, ওগো, 'তুমি',—তুমিই ত' বলবে, তুমি কেন আমাকে 'আপনি' বলছ, কেন তুমি আমাকে ক'রছ নমস্কার—আমি যে তোমার রমা, তোমারই রমা।

কিন্তু পোড়ামুখ দিয়া তবুও একটা কথাও বাহির হইল না। হয়ত' রাজুর মা এখনই আসিয়া পড়িবেন। চোখের পাতা তিনি ত' সিক্ত দেখিয়া যান নাই। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া অনুরূপা নিজেকে অনেকখানি শক্ত করিয়া লইলেন। তবু কি আঁখির জল

বাঁধ মানিতে চায়—অঝোর শ্রাবণ-ধারা। আজ কতদিন পরে তিনি মহিমকে দেখিতে পাইয়াছেন—দেখা যে তাঁহার মিটিতেছে না। শুধু পলকহীন চোখে দেখিতেই ইচ্ছা করিতেছে।

রাজুর মায়ের পদশব্দ শোনা গেল। অনুরূপা কথা কহিবেন মনে করিয়াও মহিমের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুই তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না। কি হইল অনুরূপার? সারা অতীত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অতীতের অগ্রগতিতে বর্তমান পশ্চাতে পড়িয়া গেল—ও ত' অনুরূপা নয়, ও যে রমা।

মহিম কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আপনি কি আমাকে ক্ষমা ক'রতে পারেন নি? আমার কথার কোনই ত' উত্তর দিলেন না। সত্যিই আমি অতটা বুঝিনি। নিশ্চয় আপনি মনে মনে বিরক্ত হ'য়েছেন।

না না, আমি কিছুই মনে করিনি। বিরক্ত কেনই বা হব,—এই বলিয়া অনুরূপা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিলেন।

মহিম কহিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, যতবারই আপনার কণ্ঠস্বর শুনছি, আমার সেই আত্মীয়ের কথা মনে পড়ছে। বহুদিন তাকে দেখি না, আর দেখতেও পারব না। শুনেছি সেও নাকি মরে গেছে। কিন্তু আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি, আপনার কণ্ঠস্বর একেবারে তার মত।

অনুরূপা যেন জলে পড়িয়াছেন। 'রমা' বুঝি অনুরূপাকে ছাপাইয়া ওঠে! উদ্বেলিত ভাবাবেগে 'রমা' বুঝি হাত বাড়ায়—সে বলিতে চায়, ধর ধর আমার হাত, এই দেখ আমি এসেছি কতদিন পরে, কতদিন পরে,—আমিই তোমার রমা।

অনুরূপা হাত গুটাইয়া লইয়া আসেন, তিনি বুঝি বলেন, ওরে, ওরে—হতভাগী, তুই কি সব খোয়াবি?

'রমা' কাঁদিয়া বলে, ওযে আমার মহিম। আমার মহিমকে কেন ওরা কেড়ে নেয়। কেন ওরা অন্ধ ক'রে দিয়েছে আমার প্রিয়তম কে? কেন,—কেন?

অনুরূপা বলেন, মনে ত' র'য়েছ রাজরাণী হ'য়ে, কিসের তোমার দুঃখ,—মহিম তোমার, শুধু তোমারই।

মহামায়ার কণ্ঠস্বর নিকটেই শোনা গেল। অনুরূপার স্বপ্ন-বিহ্বলতা কাটিয়া যায়। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন কে তাহার মধ্যে আসিয়া এত কথা কহিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রাণপণে সংযত করিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। এমন সময়ে মহামায়া দরজার কাছে আসিয়া বলিয়া গেলেন, বেয়ানদিদি, আমি এখুনি আসছি, মনে করবেন না কিছু।

অনুরূপা বলিলেন, সোমনাথ, সাবিত্রীকে আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা না করেই গ্রহণ করেছে। আমরাও বিয়ের পরেই জেনেছি। ছেলেমেয়েরা নিজেদের বুঝেছে, উভয়ে উভয়কে জেনেছে। তাদের বিয়ে সিদ্ধ না ব'লে আমরা যদি আশীর্বাদ না ক'রতাম, আমাদের সবখানি দৈন্যই যে ওদের কাছে ধরা প'ড়ে যেত। দুর্বলতার দম্ভ বড় করুণ।

উত্তরে মহিম কহিলেন,—লজ্জা দিয়ে জীবনের সত্যকে ওরা ঢেকে রাখেনি। তা আমি বুঝতে পেরেছি বেয়ানদিদি। জীবনের দায়িত্ব ওরা ভালবাসায় সুন্দর ক'রে তুলবে, সাবিত্রীর কথায়, কাজে, আমি তার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এসব কথা ব'লব কার সঙ্গে? 'দুর্বলতার দম্ভ বড় করুণ'—এ কথার মানে বুঝবে কে? আর আমার কথা যদি বলেন,—আমি একা, সঙ্গীহীন, যা বুঝি নিজেই বলি, নিজেই শুনি। তবু আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলে মনে হ'চ্ছে, আপনি এমন একজন পরমাত্মীয়, যাঁর কাছে মনের সব কথা উজাড় ক'রে দেওয়া যায়।

না না, কি এমন মানুষ আমি, বলিলেন অনুরূপা, তবু এইটুকু জেনে খুব আনন্দ পেলাম যে আমার কণ্ঠে আপনার আত্মীয়কে আজ আপনি খুঁজে পেয়েছেন।

—শুনবেন তাঁর কথা?

—কার কথা? কাঁপিয়া উঠিল অনুরূপার গলা।

—তার,—

অনুরূপা উঠিয়া জানলার ধারে চলিয়া গেলেন। রুদ্ধ-অশ্রু কোন-মতেই আর শাসন মানিতে চাহে না। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আপনাদের বাসাটি বেশ। আচ্ছা,—

—কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবেন?

—সোমনাথ সাবিত্রীর এই বিয়ে—

আমার খুব ভাল লেগেছে। তাই ত' আমি ওদের আশীর্বাদ ক'রেছি। নাই বা হ'ল ঢোল্ পিটিয়ে সকলকে জানান। ঢোল্ পেটালেই কি দেবতার পূজা হয়,—না তাঁকে পাওয়া যায়? মনের দেবতা বড় জাগ্রত। সেই দেবতা খুশী হ'লেই আসল পাওয়া,—এই বলিয়া মহিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনুরূপা বুঝিলেন মহিম কি বলিতে চান। বুঝিলেন, তাহার মন অতীতের স্মৃতিভারে আর যেন চলিতে পারিতেছে না। প্রতিটি কথার মধ্যে জীবনের পরম সত্যকে অস্বীকার করিবার গ্লানি, যেন পারার বিষের মত সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনুরূপা কথা কহিলেন না, কথা কহিতেও পারিতেছিলেন না। আজ শুধু তাঁহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল,—মাঝে মাঝে কাঁদিয়াও ফেলিতেছিলেন। জীবনের পথে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। সে পরিবর্তন কেহ মানিবে, কেহ মানিবে না। কিন্তু তবু সত্যকে প্রকাশ করিতে পারা যাইবে না। সত্য,—সংসারে এমনই সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপা এই কথাই চুপ করিয়া ভাবিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অনুরূপাই বলিলেন, ভাবছিলাম আপনার কথাগুলি। আপনি ঠিকই বলেছেন, মনের দেবতাকে অতৃপ্ত রেখে কোন কাজই কল্যাণকর হয় না।

—কল্যাণ?—তাই বটে।

মহিমের দীর্ঘনিশ্বাসে ঘরখানি যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী, সোমনাথ ও রাজু বাসায় ফিরিয়া আসিল। দেখিল, অনুরূপার সামনে বসিয়া মহামায়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—

—না না, লুচি ক'খানা খেয়ে নিন্।

—সত্যি আমি আর পারি না বেয়ানদিদি।

—সাবিত্রী অনুরূপার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আনন্দ-আতিশয্যে।

—সোমনাথ ডাকিল, বড়মা।

—সাবিত্রী ডাকিল, বড়মা।

—রাজু ডাকিল, বড়মা।

—আহার শেষে বড়মাকে ঘিরিয়া কত কথা হইল, হইল কত গল্প।

—আচ্ছা বড়মা, কাশীতে তোমাকে একদিন 'মা' বলে, জড়িয়ে ধরে ছিলাম,—মনে আছে,—বলিল রাজু।

—রাজহংসীকে তখন ত' জানিনি।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সাবিত্রী অনুযোগ করিল, এতদিন চিঠি দাওনি কেন বড়মা। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, মেসোমশাই কেমন আছেন। সেদিনের সন্ধ্যা বড়মাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দ-মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। শুধু এই কথা অনুরূপা ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, অনুরূপা তাঁহার জীবনের পরম-জনকে এত কাছে পাইয়াও, কোন কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাইতেছেন না।

সাবিত্রী ও সোমনাথ, অনুরূপার অনুরোধ—আদেশ মনে করিয়াই, তাঁহার অন্য কোন পরিচয় এখানে দেয় নাই। সাবিত্রীর মাসিমা,—অনুরূপা তাঁহার নাম, এইটুকুই সকলে জানেন।

পরদিন সকালে অনুরূপা মহিমকে বলিলেন, চলুন না, একবার দিল্লী বেড়িয়ে আসবেন।

—আমি?

—কোন কষ্টই হবে না আপনার। মহামায়ার আদর-যত্নের সঙ্গে হয়ত' পারব না, কিন্তু অনুরূপার সেবাও ফেলে দিতে পারবেন না, এই বলিয়া অনুরূপা উচ্চহাসি হাসিলেন।

কিন্তু ছাই দিয়া কি মনের আগুন চাপিয়া রাখা যায়? তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। জানলার দিকে মুখ ঘুরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন অনুরূপা।

মহিম অনুরূপার কথার উত্তরে বলিলেন, আপনি যেতে বলেছেন, তাই হ'য়েছে আমার যাওয়া। আপনি সাবিত্রীকে আর সোমনাথকে কয়েকদিন নিজের কাছে নিয়ে যান। ওদের নতুন জীবন। দিল্লীতে থেকে আসবে কয়েকদিন,—সেই ভাল হবে।

এমন সময়ে রাজু আসিয়া অনুরূপাকে টানিতে টানিতে তাহাদের ঘরে লইয়া গেল।

তুমি কি শুধু বাবার সঙ্গেই গল্প ক'রবে বড়মা? শোন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

—অনুরূপা হাসিয়া বলিলেন, কি কথা রে?

—ব'স, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না কি?

—অনুরূপা বসিলেন।

—আচ্ছা বড়মা, দিল্লী এখান থেকে কতদূর?

—খুব বেশি দূর নয়।

—আমি যাব তোমার সঙ্গে।

—সেই কথাই ত' তোমার বাবার সঙ্গে ব'লছিলাম।

সেদিনের কথায় তাহাই ঠিক হইয়া গেল, সোমনাথ, সাবিত্রী ও রাজুকে লইয়া অনুরূপার সঙ্গে দিল্লী যাইয়া কয়েকদিন ঘুরিয়া আসিবে।

কিন্তু যাহা ঠিক হইয়া থাকে তাহাকে বেঠিক করিতে আর একজনের বিলাস আছে। যাহা ভাবিলাম, হয়ত' তাহার বিপরীতই সেই বিলাস-বিহারী করিয়া বসিলেন। সোমনাথের দিল্লী যাওয়াও তেমনই হইল সেইদিনই সোমনাথের ছুটি লইবার কথা ছিল।

কিন্তু অফিসের কাজে তাহাকে বোম্বাই যাইতে হইবে, অফিসে যাইয়া তাহা সে জানিল। সাহেবী কোম্পানী, সোমনাথকে বোম্বাই-এর কাজে অপরিহার্য মনে করিয়াছে। সোমনাথের দিল্লী যাওয়া হইবে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিতে পারিল।

বাসায় ফিরিয়া সোমনাথ একথা সকলকেই বলিল। আগামী কালই বোম্বাই রওনা দিতে হইবে। দুই মাস বোম্বাইতে থাকিতে হইবে। দিল্লীর ট্রেণ একেবারে বোম্বাইএর দিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিবে, একথা কেহ কল্পনাই করিতে পারে নাই।

সোমনাথ বলিল, সাবিত্রী আর রাজুকে নিয়ে তুমি বরং দিল্লী যাও বড়মা। আমি বোম্বাই থেকে ফিরে এসে ওদের নিয়ে আসব।

সাবিত্রী উত্তরে কহিল, তুমি বরং ফিরেই এস, তারপরে আমরা যাব।

অনুরূপা বলিলেন, সেই ভাল, তুমি ফিরেই এস' বাবা।

রাজু আসিয়া সংবাদ দিল, মহিম অনুরূপাকে ডাকিতেছেন। অনুরূপা রাজুর সঙ্গে উঠিয়া গেলেন।

—সোমনাথ সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা কবিল, যাবে নাকি বোম্বাই ?

—তোমার কতদিন দেরী হবে ?

—দু'মাস।

—না আমি আর যাব না। তুমি থাকবে না বাসায়, আমি কেমন ক'রে যাব ?

—বোম্বাই চমৎকার শহর।

—তুমিই দেখে এস।

—তোমার কষ্ট হবে না ?

—আচ্ছা এ তোমার কেমন কথা। কষ্ট হবেনা জিজ্ঞাসা ক'রছ —কিন্তু—

আবার আসিল রাজু। সোমনাথ ও সাবিত্রীকে মহিম ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

মহিম অনুরূপা ও মহামায়াকে বলিতেছিলেন, আমি বলি কি

সাবিত্রীও সোমনাথের সঙ্গে যাক। বিদেশ জায়গা, তবু সাবিত্রী সঙ্গে থাকলে, একেবারে নিঃসঙ্গ মনে ক'রবে না। আপনি কি বলেন বেয়ানদিদি ?

—সাবিত্রী কি যেতে চাইবে ?—বলিলেন অনুরূপা।

—মহামায়া কহিলেন, আমারও তাই মনে হয়।

—জানি সে হয়ত' যেতে চাইবে না, তবু সবদিক বিচার ক'রে দেখতে হবে বৈ কি নতুনবৌ।

মহামায়া বলিলেন, বাসার জন্য অবশ্য ভাবি না। বেশ তুমি যা ভাল মনে কর, ওদের ত' ডাক্তে পাঠিয়েছি, বলে দাও, বেয়ানদিদিও রয়েছেন।

সাবিত্রী ও সোমনাথ ঘরে আসিল।

রাজু বলিল, বৌদি এসেছে বাবা।

মহিম স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন সাবিত্রীকে, সোমনাথকে বোম্বাই যেতে হবে তা হয়ত' তুমি শুনেছ। আমি এই কথাই তোমার মাসিমা আর মায়ের সঙ্গে আলোচনা ক'চ্ছিলাম। তুমি সোমনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাও, এই আমার ইচ্ছা।

সাবিত্রী কহিল, দু'মাস পরেই ত' ফিরে আস্‌বেন, বাসায় আপনাদের ফেলে আমার যেতে মন চায়না বাবা।

সোমনাথকেও একা পাঠাতে আমার মন চায়না মা। তুমি ওর সঙ্গে যাও।

—বেশ, যাব।

—তবে বেয়ানদিদিকে একলা দিল্লী ফিরে যেতে হবে এই যা। তা বেশত', সোমনাথ বোম্বাই থেকে ফিরে আসুক, আমরা সকলে মিলেই না হয় দিল্লী গিয়ে লালকেল্লা দেখে আসব।

এই বলিয়া নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনুরূপা শুধু একবার তাঁহার কাতর চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইলেন।

যাত্রার সময় আসিল। সাবিত্রী ও সোমনাথ,—মহিম, মহামায়া ও অনুরূপাকে প্রণাম করিল। রাজু কাঁদিতেছিল।

সোমনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল, বোম্বাই থেকে তোর জন্য কি আনব' বল্ দেখি রাজু ?

রাজু কোন কথা কহিল না, শুধু ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সাবিত্রী আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইল রাজুকে।

—রাজু, কাঁদিসনে বোন।

অনুরূপা বলিলেন, আয় আমার কাছে, তোকে আমি দিল্লী নিয়ে যাব। তবু রাজু কাঁদিতেছিল। সাময়িক বিচ্ছেদ-বেদনা সকলকেই অশ্রুপ্লুত করিয়া তুলিল। সকলের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া উহারা স্টেশনে যাত্রা করিল। রাজু তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

২২

সোমনাথ, সাবিত্রী বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। রাজুকে সান্ত্বনা দিতে অনুরূপাকে দুই একদিন আগ্রায় থাকিতে হইল। অনুরূপার কাছে কাছে থাকে রাজু। অনুরূপারও ভাল লাগে। রাজু সামান্য ক'দিনেই অনুরূপাকে আপন করিয়া লইয়াছে।

রাজুকে সঙ্গে করিয়া অনুরূপা মহিমের ঘরে আসিলেন।

—কে ? পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহিম।

—আমি আর বড়মা, বলিল রাজু।

—বসুন।

—আজ আমি যাব বেয়াই মশাই।

—আজই ?

—না, আজ না, আর ক'দিন থাক'না বড়মা, রাজু অনুরূপার মুখের দিকে তাকাইয়া আবদারের সুরে বলিল। অনুরূপা চুপ করিয়াই রহিলেন।

মহিম অনুরূপার মুখের দিকে অন্ধ চোখ দু'টি উঠাইয়া বলিলেন, সোমনাথ, সাবিত্রী চলে গেছে, বাসা একেবারেই যেন ফাঁকা হ'য়ে গেছে। আপনিও চলে যাবেন, কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছে না।

—আমি তোমাকে যেতে দেবো না বড়মা, বলিল রাজু।

মৃদু হাসিয়া মহিম বলিলেন, রাজু যদি তার বড়মাকে যেতে না দেয়, তাহ'লে আমি যেন কত সুখী হই। অবশ্য দিল্লীতে রাধামোহন-বাবু একা আছেন, বেশী দিন আপনাকে ধ'রে রাখতেও পারব না। তবে থাক্‌তে যদি পারেন, রাজুর সঙ্গে আমিও দু'দিন থেকে যেতে অনুরোধ করি।

অনুরোধ? অনুরোধই বটে! মহিম অনুরোধ করিয়াছেন অনুরূপাকে, শুধু দু'টি দিন থাকিয়া যাইতে। মাত্র দু'টি দিন!

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছ' বড়মা?

—অ্যা, না, কিছু নয়, আচ্ছা আমি আর দু'দিন থেকেই যাব, বলিলেন অনুরূপা।

আনন্দে উৎফুল্ল রাজু, দৌড়াইয়া রান্নাঘরে মায়ের কাছে এই সংবাদ দিতে গেল।

নির্জন ঘর। ঘরে শুধু মহিম আর অনুরূপা। কত কথাই বুঝি দু'জনার মনে তোলপাড় করিতেছে। দু'জনেই নিস্তব্ধ, ঘরও নিস্তব্ধ। মহিম ভাবিলেন, কেন ইহার কণ্ঠস্বর নিয়ত 'রমার' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়? কোথায় রমা, কোন্ মানসলোকে? কত অতীত কথা মুহূর্তে মহিমের মনে ভাসিয়া উঠিল। সেই চৈত্র মাসের মেলায়, বহুরূপীর নাচ দেখিতে যাইয়া রমা হারাইয়া গিয়াছিল, মহিম তাহাকে কত করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। রাগ করিয়া একটি চড়-ও মারিয়াছিল। সেদিনের রমা বলিয়াছিল, তুমি আমাকে মারলে মহিমদা'? মহিম কত যে বেদনা পাইয়াছিল। সেই হিজল গাছে উঠিয়া বাবুই পাখীর বাচ্চা পাড়িতে যেদিন মহিম ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল,—কত যে কাঁদিয়াছিল রমা। কিন্তু কেন 'রমার' কথা তাঁহার এত করিয়া আজ মনে পড়িতে লাগিল?

আর অনুরূপা—

বিবাহের কয়েকমাস আগে স্নান করিয়া, ছাদের উপরে এলোচুল শুকাইতে ছিল রমা, দূরের জাম গাছের আগ্‌ডাল হইতে জাম ছুড়িয়া ছুড়িয়া দিয়াছিল মহিম, সে কথা মনে পড়িল অনুরূপার।

মনে পড়িল বর্ষার নূতন জলে সাঁতার দিতে দিতে হঠাৎ ডুবিয়া যাইতেছিল রমা, মহিম তাহাকে কেমন করিয়া সেই ঘূর্ণীপাক হইতে বাঁচাইয়াছিল। মনে পড়িল মহিমের এক মামার মেয়ের বিবাহে, মহিমদের বাড়ী গিয়াছিল রমাদের বাড়ীর সবাই, কয়েক দিন থাকিতেও হইয়াছিল। মহিমের পিসিমার ভাসুরের মেয়ে, ময়না, তাহাকে দেখাইয়া পিসিমা কতজনকে বলিয়াছিলেন, আমার মহিমের সঙ্গে ময়নার বিয়ে দেব, কেমন মানাবে। মহিমের পড়ার ঘরে বসিয়া, রমা এই কথা শুনিয়া কত কাঁদিয়াছিল সেদিন। বিয়ে বাড়ী—কত লোকজন, তাহার মধ্যেও মহিম রমার জন্য সন্দেশ চুরি করিয়া আনিয়াছিল, তবু থামে নাই রমার কান্না।

বুঝি চোখে জল আসিয়াছিল অনুরূপার,—চোখ মুছিলেন অনুরূপা, এবং সেই মুহূর্তে দু'টি দীর্ঘনিশ্বাস একই সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল! কোন্ অনন্ত শূন্য তাঁহাদের মিলন অনুরাগে দীপ্ত হইয়া উঠিল?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহিম বলিলেন, আমি লক্ষ্য ক'রেছি, আপনি বেশী কথা বলেন না। তবু এ ক'দিন আপনার সঙ্গে কথা ব'লে কত যে তৃপ্তি পেয়েছি। সাবিত্রীকে আপনি মানুষ ক'রেছেন শুনেছি। সাবিত্রীকে এমন ক'রে তৈরী যিনি করেন, তাঁকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু চোখ দু'টি একেবারে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ব'সে আছে।

চুপ করিলেন মহিম। ম্লান হাসিরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। অনুরূপা কোন কথা বলিবার আগেই মহামায়া রাজুর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি, আরও দু'দিন থাকবেন শুনে কত যে আনন্দ পেলাম বেয়ানদিদি। রাজু আপনাকে যেতে দিল না, সে কথা রাজু আমাকে ব'লতে ছাড়ে নি,—বারবার ব'লেছে।

অনুরূপা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ,—রাজুই আমাকে যেতে দিল না। ওর জন্যই ত' যেতে পারলাম না।

শুধু জানিল একজন, আর জানিলেন ভগবান যদি কেহ থাকেন, কাহার জন্য কে যাইতে পারিল না।

দু'দিন কাটিয়া গেল। আজ অনুরূপার যাত্রার দিন। মহামায়া বিশেষ যত্ন করিয়া অনুরূপার আহারের আয়োজন করিলেন। রাজুকে সঙ্গে করিয়া অনুরূপা আহারে বসিলেন। রাজু বারবার বলিতেছিল, আবার কবে আস্‌বে বড়মা ?

ক্রমে যাত্রার সময় হইল। সামান্যই জিনিষপত্র, গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। মহিম বাহিরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। অনুরূপা মহিমকে বলিলেন, আমার ট্রেনের সময় হ'য়েছে বেয়াইমশাই।

—জিনিষপত্র সব উঠেছে ত', বলিলেন মহিম।

—মহামায়া উত্তরে বলিলেন, হ্যাঁ, উঠেছে।

—অনুরূপা বলিলেন, কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার কাঁপিতেছিল, আবার কবে দেখা হবে ভগবান জানেন। ওরা ফিরে এলে রাজুকে, বেয়ানদিদিকে সঙ্গে ক'রে নিশ্চয় যাবেন দিল্লীতে, আমার সাদর আমন্ত্রণ রইল।

নিশ্চয়, নিশ্চয় যাব। কিন্তু আপনিও ত' অবসর মত আবার আগ্রা বেড়িয়ে যেতে পারেন, বলিলেন মহিম।

—এবারে যে আপনাদের পালা।

—তা বটে।

আপনি হাজার হ'লেও আমার বয়সে বড় বেয়াইমশাই। তাই যাবার সময় আপনাকে একটা প্রণাম ক'রে যাব।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মহিমকে প্রণাম করিলেন অনুরূপা। হয়ত' তপ্ত অশ্রু মহিমের চরণ স্পর্শ করিয়াছিল। মহিম শিহরিয়া উঠিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনুরূপা।

—এবারে যাই বেয়াইমশাই।

—যাই বলতে নেই, আসুন। আপনি সত্যি চলে যাবেন ভাবতে পাচ্ছি না যেন। আচ্ছা আপনি—বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন মহিম।

কি যেন বলিতে চাহেন অথচ বলিতে পারিতেছেন না। কেন যেন তাঁহার সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কেমন যেন সব এলোমেলো হইয়া গেল। তাঁহার মনে যেন ভাসিয়া উঠিল, দেশের বাড়ীর বিজয়া-দশমীর বিষাদ মুহূর্ত। প্রতিমার কপালে সিঁদুর পরাইয়া সকলে বিদায় লইতেছে। পূজামণ্ডপে শেষ দর্শনেচ্ছুরা ভীড় করিয়া আছে। সকরুণ সুরে নহবৎ বাজিতেছে—চলিয়াছে ভাসানের নৌকা—তীরে তীরে নরনারী অশ্রুজলে যেন অন্তরের ধনকে শেষবার দেখিয়া লইতেছে। ব্যথিত বিসর্জনের অন্তিম আকুতি বুঝি কাঁদিয়া উঠিতেছে—'সোনার কমল জলে ভাসাইল কে—'। বিদায়—সত্যই কি বিদায়! মহিম নিজেকে রাখিতে পারিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহামায়া আমায় ধর—আমায় ধর।

মহিম পড়িয়া যাইতেছিলেন। অনুরূপা ও মহামায়া দু'জনেই তাঁহাকে ধরিলেন। মহিমের তখন কোন জ্ঞান ছিল না। দু'জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অনুরূপার সেদিন যাওয়া হইল না।

* * * *

অনুরূপা দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছেন। মেয়ে জামাইকে আনিতে গিয়াছিলেন কিন্তু ফিরিলেন কি লইয়া? কিশোর কালের অব্যক্ত বেদনা, যৌবনের মিথ্যা কলঙ্কভার, কিছুই ত' তিনি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেদনার অনুস্মৃতি বারবার বাজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাই সব কিছু বুকের মধ্যে চাপিয়া আবার দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন অনুরূপা।

শুধু দেখিয়া গেলেন, বুঝিয়াও গেলেন, মহিমের মনে রাবণের চিতা আজও জ্বলিতেছে। সেই শঙ্কর, সেই মহিম, সেই রমা,—একটি মুহূর্তও কি এই অতীত ছবি তাঁহার মনে ভাসিয়া ওঠে নাই? সারা ট্রেন যে সেই কথাই ভাবিয়াছেন, সারা রাত্রি বিছানায় শুইয়া যে সেই কথাই চিন্তা করিয়াছেন, আর কাঁদিয়াছেন। অন্ধ মহিমকে তিনি কল্পনাও করেন নাই, তবু সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই কথা-

বলার ভঙ্গিমা, সবইত' আছে। এত কাছে আসিয়া তবু সবচেয়ে কাছের পরিচয়টুকু দিতে পারা গেল না। মহিমের মনে, অনুরূপার কণ্ঠস্বর বিভ্রম জাগাইয়াছিল, কিন্তু বেয়ানদিদিকে ছাপাইয়া তাহা সত্য হইয়া উঠিতে পারিল না। বড় হইয়া উঠিল না, চলিয়া আসিবার দিনের মহিমের মনের বিক্ষুব্ধ-বেদনা। আজ সে বয়স নাই, সে পরিস্থিতি নাই, কত পরিবর্তন আসিয়াছে। তবু এই কয়েকটি দিন অনুরূপার মনে অক্ষয় হইয়া রহিল। তীর্থক্ষেত্র দেখিতে আসিয়াছিলেন, তীর্থের ঠাকুরকে প্রণাম জানাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। পথের সম্বল রহিল তীর্থ-পুষ্প অশ্রুজল।

২৩

বোম্বাই আসিয়া সাবিত্রী আগ্রায় ও দিল্লীতে চিঠি দিয়াছে। বোম্বাই শহর দেখিতে কেমন তাহাও লিখিয়াছে রাজুর কাছে।

উহারা তাজমহল হোটেলে উঠিয়াছে। হোটেলের সম্মুখেই সমুদ্র। অনতিদূরে মালাবার হিলস্, সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদ বুকে লইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছে। বোম্বাইএর এই সমুদ্র উপকূল সত্যই সুন্দর। দূরগামী জাহাজগুলি সাজিয়াছে নানা রংএর পতাকা সজ্জায়। সন্ধ্যাসমাগমে 'ম্যারিন ড্রাইভে' সংখ্যাহীন মোটর গাড়ী—বিচিত্র তাহাদের রূপ—বিচিত্র তাহাদের গতি-সৌন্দর্য, আরোহীরাও বিচিত্র। 'হেড্‌লাইটস্' এর অপূর্ব সমাবেশে মনে হয় যেন চলন্ত মুক্তার মালা হইতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তারপর আছে জুহুর সমুদ্রতীর। মনের সাগরে ডুবিয়া যাহারা মাণিক কুড়াইতে চায়, তাহাদের মণি-মেলা বসে এই বালুকা-বেলায়। বোম্বাইএর রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সব সাজান। নিতান্ত গরমের সময়েও পশ্চিমঘাটের অতর্কিত মৌসুমী-মেঘ স্নিগ্ধ বর্ষণে ইহাকে সুনির্মল করে। সুন্দরী নগরী বোম্বাই,—লোকে বলেও তাই।

তাজমহল হোটেলে কয়েকদিন থাকিয়া অফিসের কাছে অন্য আর

একটি হোটেলে উঠিয়া আসিল সোমনাথ। বিবাহের পর নবদম্পতির এই বন্ধন-বিহীন মধু-পরিবেশ, মিলন-মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। অফিসের পরে সোমনাথ ফিরিয়া আসে হোটেলে। বৈকালিক চা-এর আসর বসে দু'জনার। তারপর বাহির হইয়া পড়ে উহারা কোনদিন সিনেমায়, কোনদিন মার্কেটিংএ, কোনদিন ট্যাক্সীতে ম্যারিন-ড্রাইভে, কোনদিন বা সাগর-বেলায়।

এমন করিয়া একমাস কাটিয়া গেল। আগ্রার চিঠি আসিয়াছে, দিল্লীরও—সকলেই কুশলে আছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে জুহু-সৈকতে আসিয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সাগর-তরঙ্গ-ভঙ্গে তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি চলিতেছে। অনন্ত নীলাকাশের নীচে, সুনীল জলরাশির বিক্ষুব্ধ বিস্তার, কোন্ রহস্য-লোকের অনন্ত পটভূমিকা রচনা করিয়াছে! কথা কহিতে কহিতে উপকূল ধরিয়া উহারা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। এই জায়গাটিতে জন-সমাগম নাই বলিলেই হয়। পাশাপাশি দাঁড়াইল সাবিত্রী আর সোমনাথ। জনবিরল সাগর-সৈকত তরঙ্গের মদির-চুম্বনে উচ্ছল।

তাহার দুরন্তপনা সোমনাথ ও সাবিত্রীকে অস্থির করিয়া তুলিল। চুম্বন-সিক্ত ওষ্ঠ দু'খানি সরাইয়া লইয়া একটু দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল সাবিত্রী। সোমনাথ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু মুহূর্তে সাবিত্রী আরও দূরে সরিয়া গেল। সোমনাথ বুঝিল সাবিত্রী ইচ্ছা করিয়া ধরা দিবে না। সোমনাথের অনুমান মিথ্যা নয়। সাবিত্রী ক্ষীণ-চন্দ্রালোকে হাসি-বক্র-কটাক্ষে ছুটিয়াছে,—মুগ্ধা কুরঙ্গিনী যেন, পিছনে ছুটিয়াছে নিষাদ-শিকারী সোমনাথ,—"মা নিষাদ"—বলিয়া বাধা দিবারও কেহ নাই। সুঠাম নিষাদ তীক্ষ্ণ নয়ন—শরাঘাত করিতেছে আর ছুটিতেছে, হরিণী তবু দেয় না ধরা।

ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সাবিত্রী যেন দেখিতে পাইল তাহার সম্মুখে অকূল অস্থির সমুদ্র তাহার দিকে ঘোর গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সোমনাথকে আর দেখিতে পাইল

না। শুনিতে পাইল যেন সোমনাথ আতঙ্কে চীৎকার করিতেছে সাবিত্রী—সাবিত্রী—

দুপুরে আহারের পর সাবিত্রী সেদিন ঘুমাইয়াছিল। ঘুমের ঘোরে উপরের ঘটনা সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের মধ্যে সোমনাথের চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সত্যই সে শুনিতে পাইল সোমনাথ বাহির হইতে ডাকিতেছে, সাবিত্রী—সাবিত্রী—

বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখে সত্যই সোমনাথ। চোখমুখ তাহার লাল। সে কথা কহিতে পারিতেছিল না। শুধু অস্পষ্ট স্বরে কহিল, আমি শোব।

সাবিত্রী দেখিল সোমনাথের গায়ে ভীষণ জ্বর। সে তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। চাকরকে ডাকিয়া বরফ ও আইস্-ব্যাগ আনাইতে দেরী হইল না। হোটেলের ম্যানেজার মিঃ কাপুর সংবাদ পাইয়া আসিলেন। সোমনাথের জ্বর খুবই বেশী মনে হইতেছিল।

মিঃ কাপুর বলিলেন, আমাদের সেকেণ্ড ব্লকে একজন ডাক্তার থাকেন, আমি তাঁকে ডেকে আনছি। আপনি কিছু ভাববেন না মিসেস্ চক্রবর্তী।

সাবিত্রীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মিঃ কাপুর চলিয়া গেলেন।

সাবিত্রী সোমনাথের কপালে এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কেন এত জ্বর হ'ল ?

সোমনাথ কোন কথা কহিতে চাহিল না, শুধু সাবিত্রীর হাতখানি লইয়া নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল।

সাবিত্রী আরও একটু ঝুঁকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, খুব কষ্ট হ'চ্ছে তোমার ?

—একটু জল দাও।

সাবিত্রী জল লইয়া আসিল। এমন সময়ে মিঃ কাপুর ডাক্তার-বাবুকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারবাবু সাবিত্রীকে দেখিয়া

থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি—সাবিত্রী-দেবী! নমস্কার।

—অশোকবাবু?—নমস্কার, আমার স্বামী বিশেষ অসুস্থ।

আমি দেখছি, এই বলিয়া তিনি সোমনাথের পাশে বসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রুদ্ধ নিশ্বাসে সাবিত্রী সোমনাথের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ কাপুর শুধ্ একবার সাবিত্রী ও অশোকের মুখের দিকে তাকাইলেন।

২৪

অশোক কিছুদিন আগে তাহার এক বন্ধুর অনুরোধে বোম্বাইতে 'প্রাক্‌টিস্' সুরু করে। হোটেলে থাকে। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সে গ্রহণ করে নাই, কেন করে নাই তাহা আমরা জানি না।

লাক্‌নৌ ছাড়িয়া বোম্বাইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই অশোক বেশ সুনাম করিয়াছে। তাহার প্রাক্‌টিস্ 'রোরিং' না হইলেও, স্থানীয় অনেক চিকিৎসকের চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা-দেশের বাহিরে বাঙ্গালী চিকিৎসক ও আইনজ্ঞের বিশেষ আদর আছে। অশোকের চিকিৎসার সুনাম তাই অল্পদিনের মধ্যেই বোম্বাই শহরে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি অশোক একটি নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ডাঃ চাটার্জী অশোকের বিশেষ বন্ধু, এই নার্সিং হোম দেখাশুনা করেন।

রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল, সোমনাথ টায়ফয়েড ও নিউমোনিয়ায় একসঙ্গে আক্রান্ত হইয়াছে। সাবিত্রীকে আশ্বাস দিয়া অশোক সেদিন বৈকালে সোমনাথকে তাঁহার নার্সিং হোমে লইয়া আসিল। ডাঃ চ্যাটার্জীকে ও নার্স বনমালাকে ডাকিয়া সোমনাথের চিকিৎসা ও সেবার সমস্ত ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিল।

নার্সিং হোমে সাবিত্রীকে উৎসাহ দিয়া বলিল অশোক, আপনি ভাববেন না সাবিত্রীদেবী, আমি দিল্লীতে কাকাবাবুর কাছে চিঠি দিয়েছি, আপনিও আগ্রায় চিঠি লিখে দিন, কেউ যেন ব্যস্ত না হন।

আমরা ত' সোমনাথবাবুকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রেছি, আর এখন যেসব ওষুধ বেরিয়েছে, এসব রোগে কোনই ভয় নেই। চিঠি দিন, কাউকে আসতেও হবে না, আর কেউ যেন উতলাও না হন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি সাবিত্রীদেবী, আপনার স্বামীকে আমি তিন সপ্তাহে ভাল ক'রে দেব।

সাবিত্রী কোন কথা কহিল না, শুধু শ্রদ্ধায় সে একবার অশোকের মুখের দিকে চাহিল।

বনমালা আসিয়া সংবাদ দিল, সোমনাথ বোধ হয় একটু ভুল বকিতেছে। ডাঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ অশোকের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। বনমালার সঙ্গে তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

অশোক বলিল, চলুন আমরাও যাই।

অশোক ও সাবিত্রী দু'জনেই উঠিয়া সোমনাথের কেবিনে গেল। সাবিত্রী শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল,—এই দুঃসময়ে অশোকের আবির্ভাব, দেবতার অসীম করুণা ছাড়া কি করিয়া সম্ভব হয়।

আগ্রায় ও দিল্লীতে চিঠি দিয়াছে সাবিত্রী। শ্রীরাধামোহন অশোকের চিঠিও পাইয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর অসুস্থ, বিদেশে সাবিত্রী একা, অনুরূপা কেমন করিয়া শান্ত থাকিতে পারেন? কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে এই বিপদে অনুরূপা উহাদের কোন কাজেই লাগিলেন না। আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনুরূপা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। ক্রমাগত মানসিক দ্বন্দ্বের চাপে কিছুদিন হইতেই শরীর তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এইবার দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার পর একদিন হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। রক্তের চাপ বৃদ্ধি,—এই দুর্ঘটনার কারণ। ডাক্তার বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যে অনুরূপার সমস্ত দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। শয্যা-গ্রহণ ছাড়া তাঁহার আর কোন উপায় রহিল না। এমন সময়ে সাবিত্রীর চিঠি আসিল। নিজেও যাইতে পারিলেন না, সাবিত্রীকে আসিতেও লিখিতে পারিলেন না। বিপদ বুঝি মানুষের এমন করিয়াই আসে।

শ্রীরাধামোহন, সাবিত্রীকে ও অশোককে দীর্ঘ চিঠি দিয়াছেন। আগ্রা বা দিল্লীর জন্য তাহারা যেন চিন্তা না করে। সোমনাথের চিকিৎসা ও সেবার যেন ক্রটি না হয়। আর এই কথা বার বার তিনি সাবিত্রীকে লিখিয়াছেন,—অশোক যখন আছে, আমরা নিশ্চিন্ত আছি। তুমিও নিশ্চিন্ত থেক। এই সময়ে অশোকের সঙ্গে তোমাদের আকস্মিক দেখা ভগবানের পরম কল্যাণেই হ'য়েছে। পরিশেষে তিনি অনুরূপার অসুস্থতার কথাও জানাইয়াছেন।

নার্সিং হোমে সোমনাথের অসুখ বাড়িয়া উঠিল। ষোল দিনের দিন আসিল এক 'ক্রাইসিস্ টাইম'। সোমনাথকে লইয়া যেন যমে মানুষে টানাটানি। নিঃশব্দ-চারিণী সাবিত্রী, সোমনাথের সেবার অচল অটল। এই ষোলদিন ধরিয়া চলিয়াছে তাহার নিশি জাগরণ; ভ্রুক্ষেপ নাই নিজের দেহের ক্লান্তিতে,—কণ্টকের পথ ধরিয়া খিন্ন শরীরে চলিয়াছে যেন যমরাজের পিছনে পিছনে—বলিতেছে যেন,— স্বামীর জীবন আমি তোমাকে লইতে দিব না।

সংজ্ঞাহীন অসাড় সোমনাথ পড়িয়া আছে বিছানায়,—ঘরে অশোক, ডাঃ চ্যাটার্জী, সাবিত্রী আর বনমালা। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। ডাঃ চ্যাটার্জী কি যেন একটি ইনজেকসান দিলেন। অশোক একবার সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল সাবিত্রী নির্নিমেষে চাহিয়া আছে সোমনাথের দিকে। অশোক সোমনাথের 'পালস্' দেখিল এবং কি যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল ডাঃ চ্যাটার্জীকে।

—ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন, ইজ ইট্?

অশোকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। পূবের জানালা দিয়া ভোরের আলো তখন ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রাইসিস্ কাটিয়া গেল।

অশোকের সুনিপুণ চিকিৎসায় ও সাবিত্রীর সেবায় সোমনাথ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। দীর্ঘ বাইশদিন পরে সোমনাথের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

অশোক সেদিন তাহার চেম্বারে ডাঃ চ্যাটার্জীকে বলিতেছিল, কথাটা সাবিত্রীদেবীকে বলাই ভাল।

কি ক'রে বলা যায়, আমি ত' ভেবে পাইনে অশোকবাবু, উত্তর করিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

—আপনি সাবিত্রীদেবীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, মনে মনে যেটা সত্য বলে জানছি, তাকে গোপন ক'রে রাখলে দুঃখ বেড়ে যাবে ডাঃ চ্যাটার্জী। আপনি ওঁকে পাঠিয়ে দিন, আমিই না হয় ব'লব ওঁকে সব কথা।

অশোক চুপ করিল। ডাঃ চ্যাটার্জী চেম্বার হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরে সাবিত্রী অশোকের চেম্বারে আসিল।

—আমাকে ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, বসুন। খুব ঝড় গেল আপনার উপর দিয়ে।

—আপনিও বাদ যাননি সে ঝড়ের দাপট থেকে, বলিল সাবিত্রী।

অশোক বলিল, ঝড়ের দাপটকে ভয় আমরা অবশ্য কেউ করি না, করিও নি। এই ক'দিন দেখেছি আপনাকে, বিপদে ধৈর্য বুঝি এমন ক'রেই ধরতে হয়। সোমনাথবাবু এখন ভাল হ'য়ে যাবেন, আর কোন ভয় নেই।

—আপনার দয়াতেই হয় ত' তাঁকে ফিরে পেলাম।

—একথা কেন বলছেন? এ আমাদের দায়িত্ব। আপনার এত কাছে কাছে থাক্‌ছি আজ কিছুদিন ধরে, জানতে পেরেছি আপনাকে আরও বেশী করে, তাই একটা কথা আজ আপনাকে না ব'লে থাকতে পারব না।

—কি?—সাবিত্রীর সারা মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। স্থির নেত্রে সে অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অশোক শান্তকণ্ঠে বলিল, কথাটা ডাঃ চ্যাটার্জীকে দিয়েই বলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বলতে রাজী হ'লেন না তিনি।

—কি কথা অশোকবাবু, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সাবিত্রী।

—বসুন, খুব শান্ত হ'য়েই একথা আপনাকে শুনতে হবে।

—কি কথা,—তাই বলুন অশোকবাবু।

—কথা খুব সহজ নয় বলেই ত' বলতে পাচ্ছি না।

—সহজ নয়? কি সে কথা আপনার? ও বুঝেছি।

—না বোঝেন নি। হাতজোড় ক'রে মিনতি ক'রছি, উত্তেজিত হবেন না, বসুন। আচ্ছা এখন আপনি যান, পরেই ব'লব।

—না, যে কথা থাকে আপনার, আজই বলুন, আমি বসছি। চেয়ার টানিয়া বসিল সাবিত্রী।

—আমার কথা খুব সাংঘাতিক, আপনার ধৈর্যকে বোধ হয় অতিক্রম ক'রে যাবে, তবু বলছি।

একটু চুপ করিল অশোক। সাবিত্রী নিস্তব্ধ-নিশ্বাসে বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। অশোক যেন বলিতে পারে না, এমন করিয়াই বলিল।

—সোমনাথবাবুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—অশোকবাবু?—একটি নিদারুণ অসহায় চীৎকার মর্ম ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। সারা নার্সিংহোম যেন কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল যেন ডানাভাঙ্গা, রাতের অন্ধকারের পাখা, অকস্মাৎ শেষ চীৎকার করিয়া নার্সিংহোমের ছাদের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িল।

সোমনাথ চোখে দেখিতে পাইবে না—একথা সাবিত্রী যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না। মুহূর্তে সারা সংসারের রূপ তাহার কাছে বদলাইয়া গেল। কাতর কণ্ঠে সে অশোককে বলিল, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না অশোকবাবু।

—আমি সেই জন্যই ওঁর চোখে একটা গগলস্ দিয়ে রেখেছি এবং চোখ যথাসম্ভব না খুলতে ব'লেছি।

—হ্যাঁ, চোখ উনি খোলেন না। বলেন, ডাক্তারবাবু বারণ ক'রেছেন।

—সত্যি উনি চোখে আর দেখতে পাবেন না?

—কোনদিনই পাবেন না, একথা বলা কঠিন। তবে আপাততঃ

ভিশান্ হারিয়েছেন। দুর্ম্মুখের মত আমাকেই একথা আপনাকে জানাতে হ'ল।

চুপ করিল অশোক। কোন কথাই আর তাহার মুখে আসিতেছিল না। ভারাক্রান্ত মনে সে শুধু ভাবিতে লাগিল সাবিত্রীর কথা। নির্মম নিয়তি বুঝি এমন করিয়াই সব নিস্পন্দ করিয়া দেয়। জীবন-তরণী সাগর জলে একদিন চাঁদের হাসিতেই নাচিয়া ওঠে। কিন্তু সেই চাঁদের স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন জলের হিংস্র তাণ্ডবে সে তরণী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বানচাল হইয়া যায়। তারপর সেই ভগ্ন-তরণীর বিক্ষিপ্ত পাঁজরগুলি ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যায়,—কে তাহার ঠিকানা রাখে ?

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। অশোকই প্রথমে কথা বলিল, আপনি বুদ্ধিমতী, আপনি জানেন বিপদে কেমন ক'রে ধরতে হয় ধৈর্য। তাই আপনাকে একথা বলতে সাহস ক'রেছি। ওঁকে সুস্থ করে তুলুন, ওঁকে সাহস দিন। আপনি যদি বিচলিত হন—

—বিচলিত না হবার ত' কথা নয় অশোক বাবু। তবু আমি বিচলিত হব না। শুধু এই কথাই ভাবছি, ওঁকে একথা আমি কেমন ক'রে ব'লব !

—ওঁকে ব'লবেন না কিছুই, উনিই আপনাকে ব'লবেন।

—মুহূর্তে সাবিত্রীর মনে কত কথা ভাসিয়া উঠিল। সেই চোখ দু'টি,—সোমনাথের সেই চোখ দু'টি, জীবনের পাতায় পাতায় যাহার অযুত চিহ্ন, স্মৃতির মাধুরিমায় উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহা আজ তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া গেল ! সারারাত্রি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গৃহ বাঁচাইলাম, সূর্যোদয়ে দেখিলাম গৃহের শ্রেষ্ঠ বৈভব চোর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ম্লান হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল সাবিত্রীর মুখে।

অস্পষ্ট আলোকে অশোক যেন দেখিল সাবিত্রীর হৃদয়-সমুদ্র কি মর্মান্তিক উদ্বেগে তোলপাড় করিয়া উটিয়াছে। সেও কোন কথা কহিতে পারিল না। মদনভস্মের পর রতির শোক-বিহ্বলতা যেন সাবিত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অশোক সাবিত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—চলুন সোমনাথবাবুকে দেখে আসি। সাবিত্রী একবার অশোকের মুখের দিকে চাহিতেই হাত দু'খানির মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিমেষে সে কাঁদিয়া উঠিল।

—অশোকবাবু,—কেন আমার এমন হ'ল?

—কাঁদবেন না সাবিত্রীদেবী,—বলিতে বলিতে অশোকেরও গলা ভারী হইয়া আসিল। মনে হয় যেন এই ব্যথিত পরিবেশে তাহারও গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

২৫

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। সোমনাথ অন্নপথ্য করিয়া ভালই আছে। সে যে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে সে কথাও সে জানিয়াছে। সাবিত্রীর জীবনে ইহা এক নূতন পরিস্থিতি। কি হইল, কেন হইল, কেন সকলের মত সে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামীকে লইয়া সংসার করিতে পারিল না, তাহা লইয়া সে দেবতার কাছে মাথা কুটিল না, নিজের অদৃষ্টের দোষও দিল না। সোমনাথ চাকুরী করিতে পারিবে না, আগ্রায় কেহই থাকিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হইবে, কত কথাই ত' মনে আসে, কত রকমই ত' সমস্যা আসিয়াছে আজ।

সেদিন সন্ধ্যার পর সোমনাথ বিছানায় শুইয়াছিল। সাবিত্রী বসিয়া তাহার মাথার কাছে। বনমালা একগ্লাস দুধ হাতে করিয়া ঘরে আসিল।

সাবিত্রীদি',—ওঁর জন্য আরও দুধের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। অশোকবাবু আজই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

জানি, অশোকবাবু ব'লেছেন সে কথা। কিন্তু তিনি যে একবার আস্‌বেন বলেছিলেন।

—ব'লেছেন যখন, নিশ্চয়ই আসবেন। দেখি দুধটুকু খাইয়ে দেই।

সাবিত্রী কহিল, দাও ভাই, আমার কাছে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সাবিত্রী বনমালার হাত হইতে দুধের গ্লাসটি লইল।

—তোমাকে দুধটুকু খেতে হবে যে।

—উঠে বসি না?

—দাঁড়াও, আমি তোমাকে ধরি।

সাবিত্রীর হাতে ভর দিয়া সোমনাথ উঠিয়া বসিল। সাবিত্রী তাহার মুখে দুধের গ্লাস ধরিল। জলের গ্লাস আগাইয়া দিল বনমালা।

—একটু জল খাও।

—দাও।

জল খাওয়া হইয়া গেলে, তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া দিল সাবিত্রী। বনমালা গ্লাস ইত্যাদি গোছাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। এমন সময়ে অশোক ঘরে প্রবেশ করিল।

—কেমন আছেন সোমনাথবাবু?

অশোকের কথার জবাব দিল সাবিত্রী, ভালই আছেন। অশোকবাবু এসেছেন,—সোমনাথকে বলিল সাবিত্রী।

সোমনাথ অশোককে নমস্কার করিল। অশোক প্রতি-নমস্কার করিয়া সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, শরীরটা ক্রমশঃ সুস্থ মনে ক'রছেন ত'?

—হ্যাঁ, এখন অনেক সুস্থ মনে করি।

—কত চেষ্টা ক'রেও আপনার চোখ দু'টি বাঁচাতে পারলাম না।

সাবিত্রী অশোকের কথায় বলিল, জীবন ফিরে পেয়েছি সে কি কম ভাগ্যের কথা অশোকবাবু! আপনি ছিলেন তাই—বিপদের বন্ধু।

অশোক উত্তরে বলিল, না—না, সেকথা কেন ব'লছেন। এ ত' মানুষেরই কাজ। তবু ব'লতে পারতাম যদি চোখ দু'টি রক্ষা ক'রতে পারতাম।

সোমনাথ কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, চোখে কি সত্যই আর কোন দিনই আমি দেখতে পাব না?

উত্তরে অশোক বলিল, একথা সাবিত্রীদেবীও আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। তবে কোনদিন দেখতে পাবেন না, একথাও যেমন ব'লব না, আবার দেখতে পাবেনই তেমন কথাও বলা সহজ নয়। শরীর পুষ্ট হ'লে দৃষ্টি-শক্তি যে ফিরে আসতে না পারে এমন নয়।

সাবিত্রী অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের—এই একটি মাত্র ত' সমস্যা নয় অশোকবাবু।

জানি, আপনি ভাববেন না সাবিত্রীদেবী। সোমনাথবাবু আপাততঃ কিছুদিন নার্সিং হোমেই থাকবেন। অ্যাটেণ্ডিং নার্স বনমালাই থাকবে। আপনি শুধু আগ্রাতে চিঠি লিখে দিন, সোমনাথবাবু ভাল আছেন,—বলিল অশোক।

সোমনাথ অশোকের কথায় জবাব দিল,—কিন্তু ডাক্তারবাবু, সাবিত্রী ঠিক কথাই ব'লেছে, আমাদের এখন অনেক সমস্যা। আমার চাকুরী গেল, আগ্রার বাসার খরচ আছে। আমি অন্ধ এবং অসুস্থ।

অশোক সোমনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া উত্তর করিল, সবই সত্যি সোমনাথবাবু, কিন্তু যা কঠিন, তাকে কঠিন হ'য়েই গ্রহণ ক'রতে হয়। সমস্যা একদিন ছিল না, সমস্যা এসেছে, আবার একদিন হয় ত' থাকবে না।

সাবিত্রী কহিল, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কয়েকটি কথা আছে।

—বলুন।

—না এখানে হবে না। আপনার চেম্বারে কখন যাবেন আপনি?

—বেশ, সময় মত একদিন যাবেন।

—কেন, আজ?

—আজ? বেশ যাবেন।

অশোক চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী অশোকের চেম্বারে গেল। সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত অনেক গল্প করিল সোমনাথ আর বনমালা।

* * * *

পরদিন সকালে সোমনাথের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সাবিত্রী কহিল, তোমাকে ত' আগেই ব'লেছি অশোকবাবুর কথা। তিনি আমাদের পরম বন্ধু। মেসোমশাই, মাসিমা, অশোকবাবুকে ভাল ক'রেই চেনেন। অশোকবাবুর একজন মহিলা কর্মচারী দরকার, মাইনেও মন্দ নয়, গ্রাজুয়েট্ হওয়া দরকার, নার্সিং হোমেই হবে তার কাজ। তুমি যদি বল, চাকুরীটা আমি ক'রতে পারি। তোমার চাকুরী রইল না, তোমার চোখের কথা এত তাড়াতাড়ি বাবাকে জানাতেও চাই না। চাকুরীটা নিলে, টাকাও মাসে মাসে পাঠাতে পারব বাড়ীতে।

সোমনাথ উত্তরে বলিল, বেশ ত' ভালই হবে। নাও তুমি চাকুরী। আমার মত কেন বলত', তুমি যা ক'রবে তা কি এমন কিছু হবে যার জন্যে আমার মতের দরকার আছে ?

সাবিত্রী বলিল, তোমাকে না জানিয়ে কোন কাজ ক'রতে ইচ্ছে করে না, করিও না। বেশ আমি অশোকবাবুকে ব'লব।

এমন সময়ে বনমালা ঘরে আসিল। সে সাবিত্রীকে বলিল, জানেন সাবিত্রীদি' সোমনাথবাবু আপনার কথায় ত' পঞ্চমুখ, কাল রাত্রে কত যে গল্প ক'রলাম দু'জনে।

সাবিত্রী হাসিয়া উত্তর করিল, তাই নাকি, সব কথা ব'লে দিয়েছ না কি ? হ্যাঁ ভাই বনমালা, অশোকবাবু এসেছেন দেখলে ?

—হ্যাঁ এসেছেন ত', কহিল বনমালা।

—তুমি একটু ওঁর কাছে ব'স ভাই, আমি অশোকবাবুর সঙ্গে একটু দেখা ক'রব।

সোমনাথ কহিল, এখুনি যাবে ?

—হ্যাঁ এখুনি যাই, কাজ ত আমাদেরই।

—এস।

তাহা ছাড়া অশোকও আজ সাবিত্রীকে দেখা করিতে বলিয়াছিল। সাবিত্রী চলিয়া গেল।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, সাবিত্রী চলে গেছে বনমালা ?

—বনমালা বলিল, হ্যাঁ,—গেলেন এইমাত্র।

সোমনাথ বলিল বনমালাকে, আমি এখন তোমাদের সকলেরই গলগ্রহ হ'য়ে পড়লাম। আমার জন্যই ত' সাবিত্রীকে চাকুরী ক'রতে হবে।

—কোথায় হ'ল চাকুরী সাবিত্রীদি'র ?

—অশোকবাবুর নার্সিং হোমের জন্য একজন মহিলা কর্মচারীর দরকার হ'য়েছে। সাবিত্রী সেই চাকুরীই ক'রবে। ভালই ত' হ'ল, —কি বল ?

হ্যাঁ, ভাল হ'ল বৈ কি। অশোকবাবুর মত লোক দেখা যায় না,—বলিল বনমালা।

কিন্তু আজ যাহা ভাল বলিয়া মনে করা যায়, আগামী দিনের আর্শিতে যে সে তেমন ভাবেই প্রতিফলিত হইবে, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। সে কারণে অশোকের নার্সিং হোমের চাকুরী গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী ভাল করিল কি মন্দ করিল, তাহা আমরা এখন বলিতে পারিব না। প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীর জন্য এই চাকুরীর ব্যবস্থা অশোককে করিতে হইয়াছে। অশোকের 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারী' অবশ্য আগে কেহ ছিল না। সাবিত্রীই এই পদে প্রথম বহাল হইল।

প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কাজ। প্রায়ই সাবিত্রীকে অশোকের সান্নিধ্যে দিন কাটাইতে হয়। সোমনাথের সেবা করে বনমালা, আর অশোকের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় সাবিত্রীকে। এমন করিয়া নার্সিং-হোমে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

সেদিন হঠাৎ মৌসুমী বাতাস বোম্বাই শহরে হানা দিয়াছে। এক পসলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতেই সেদিন সাবিত্রীর দেখা নাই—বনমালাও বলিতে পারিল না। ডাঃ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, অশোকবাবু ও সাবিত্রী খুব ভোরেই বিশেষ কাজে বাহির হইয়াছেন।

সন্ধ্যায় সাবিত্রী ফিরিয়া আসিল। সোমনাথকে আসিয়া বলিল, তুমি ঘুমিয়েছিলে তাই ডাকি নি, বিশেষ কাজে বেরিয়ে যেতে হ'য়েছিল

খুব ভোরে। জানলাগুলো বন্ধ করে দাওনি কেন বনমালা, নতুন মৌসুমী হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

বনমালার অপেক্ষা না করিয়া জানালাগুলি নিজেই বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী। নতুন মৌসুমী হাওয়া সোমনাথের পক্ষে অনুকূল নয়।

* * * *

কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইহার পরে সাবিত্রীকে সোমনাথের কাছে বিশেষ দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়েই নার্সিং হোমের কাজে অশোকবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতে হইত।

—ক'দিন হ'ল তোমার কাছে আসতেই পাচ্ছি না, কেমন আছ আজ,—বলিতে বলিতে সাবিত্রী সোমনাথের ঘরে প্রবেশ করিল।

সোমনাথ বলিল, ভালই আছি। কই—তুমি কই, একটু ব'স আমার কাছে। তোমার বুঝি খুব কাজ প'ড়েছে ?

—হ্যা, অশোকবাবু নতুন একটা 'এন্টারপ্রাইজে' মন দিয়েছেন, সব সময় প্রায় তাঁর সঙ্গেই থাকতে হ'চ্ছে। বনমালাকে নিজের বোনের মতই পেয়েছি, তাই হয় ত' এমন ক'রে ঘুরতে পাচ্ছি। এই ত' এক্ষুনি আবার অশোকবাবুর নতুন মোটরটা দেখতে যেতে হবে।

—তুমি কি এখনি চলে যাবে নাকি ?

—অশোকবাবু নতুন গাড়ী কিনবেন, গতকাল আমরা গিয়েছিলাম, আজও একবার যেতে হবে।

সোমনাথ কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে অশোক নিজেই প্রবেশ করিল ঘরে।

—সোমনাথবাবু ত' অনেক ভাল আছেন, বলিল অশোক। কি বনমালা, তোমার রোগী ভালর দিকেই ত' ?

সোমনাথ হাসিয়া নমস্কার জানাইল অশোককে এবং বলিল, আপনার নিপুণ চিকিৎসা ও ব্যবস্থা আমাকে এবারে নব-জীবন দিয়েছে। সাবিত্রী, আমি—সব সময়েই তা মনে করি।

—ডাক্তারে কি আর সুস্থ করে তুলতে পারে সোমনাথবাবু,—সে

কথা বলেন ত' ধন্যবাদ দিতে হয় সাবিত্রীদেবীকে, বনমালাকে। কিন্তু সাবিত্রীদেবী, আমরা ত' আর দেরী ক'রতে পারব না। এই বলিয়া সে হাতঘড়ি দেখিল।

—চলুন, আমি অনেকক্ষণ আগেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি,—কহিল সাবিত্রী।

জানেন সোমনাথবাবু, কহিল অশোক, সাবিত্রীদেবীর অদ্ভুত পছন্দ, নতুন গাড়ীটা ওঁরই পছন্দ মত কিনব ঠিক ক'রেছি।

—চলুন,—আমি যাচ্ছি, এই বলিয়া সোমনাথের গায়ের উপরে পাতলা চাদরটা টানিয়া দিয়া সাবিত্রী অশোকের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

অশোকের নূতন গাড়ী কেনা হইয়াছে। সুন্দর, মনোরম গাড়ী—সাবিত্রী পছন্দ করিয়া দিয়াছে। ম্যারিণ ড্রাইভে চলিয়াছে নূতন গাড়ী,—অশোকের পাশে সাবিত্রী।

—সাবিত্রী বলিল, আমাকে ড্রাইভিংটা এবারে শিখিয়ে দিন।

—অশোক উত্তর করিল, বেশ ত' কাল থেকেই সুরু করুন। সকাল সকালই বেরিয়ে পড়া যাবে মাঠে।

—ড্রাইভিংটা আমার শেখা দরকার।

—খুব তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেব।

পরদিন সকাল হইতে চলিতে থাকে মোটর ড্রাইভিং শিক্ষা। মোটর চালান'র নেশা আছে—গতিবেগের নেশা। সাবিত্রীকে সেই নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। সোমনাথের কাছে সে আসিতেই পারে না। অশোকের সঙ্গে কাটে তাহার সমস্ত দিন, সন্ধ্যা, কখন কখন রাত্রিও। মাঝে মাঝে সে যে সোমনাথের খোঁজ না লয় এমন নহে, তবে তাহার মধ্যে যেন কোন প্রাণ নাই, একেবারেই মামুলী, না লইলে নয়—তাই।

অল্প দিনের মধ্যেই সাবিত্রী মোটর চালান শিখিয়া ফেলিল। বৈকালে মোটর লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, কখনও অশোক থাকে

পাশে, কখনও বা থাকে না। ফিরিবার সময় অশোককে পাশে দেখা যায়। যে মৌসুমী হাওয়া একদিন মৃদু বহিতে সুরু করিয়াছিল হঠাৎ তাহার গতিবেগ যেন বাড়িয়া গিয়াছে। মাতাল হাওয়া নিজেকে আর যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। গাছের পাতায় লাগিয়াছে রঙ, মৌসুমী-ফুলের বাড়িয়াছে বাহার—চারিদিকে যেন নাচের মাতন লাগিয়াছে।

* * * *

হঠাৎ, সেদিন বৈকালে, সাবিত্রী ঝড়ের মতই সোমনাথের ঘরে প্রবেশ করিল এবং সোমনাথের বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কাছে আসতেই পারি না। কেমন আছ?

—কে—সাবিত্রী? ভালই আছি, কহিল সোমনাথ।

—মোটর ড্রাইভিং শিখেছি, জান। এত তাড়াতাড়ি এত সুন্দর ভাবে অশোকবাবু শেখাতে পারেন—।

মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

সাবিত্রী বলিল, আমি যাই—কেমন, অশোকবাবু গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছেন।

সোমনাথের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সাবিত্রী চলিয়া গেল।

কোথা হইতে একটি উলটা স্রোত আসিয়া বুঝি সাবিত্রীকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে, সোমনাথ তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারিল। সে তাহার কাছে আসে না, আসিলেও চকিত-বিদ্যুতের মত —বেশী কথা বলিতে চাহে না। যেটুকু বলে তাহাও যেন অশোকের গুণগানে ভরপুর। সোমনাথ ভাবিল, এই অশোকের সঙ্গেই ত' সাবিত্রীর প্রথম বিবাহের কথা হইয়াছিল। সাবিত্রীর মুখেই অশোকের গুণকীর্তন শুনিয়াছে সোমনাথ। তাহার মন বিদ্রোহ করিতে চায়, কিন্তু তবু ভাবে—তাই কি হয়, সাবিত্রীকে অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? ক্লান্ত হৃদয়ে যখন কোন সান্ত্বনাই সে খুঁজিয়া পায় না তখন সে বনমালাকে ডাকে। তাহাকে কাছে বসাইয়া বলে কত কথা, শোনেও।

—বনমালা ?

—বলুন।

—আচ্ছা বলত, না থাক—।

—কি সোমনাথবাবু ?

—কিছু নয়।

—আপনার মনটা যেন আজ ভাল নেই সোমনাথবাবু।

—কেন, ভালই ত' আছি।

রাত্রি গভীর হইয়া আসে। বনমালা আর সোমনাথের গল্প চলিতে থাকে,—অতীত জীবনের গল্প।

এদিকে সিনেমা হাউসের 'ব্যালকনীতে' পাশাপাশি বসিয়া আর দুইজন জীবনের কথা বলিয়া যায়। অদ্ভুত সে জীবনের কাহিনী। এমন করিয়া গল্প বলার পালা চলে।

সেদিনও সন্ধ্যায় যথারীতি বনমালা ও সোমনাথ বসিয়া কথা বলিতেছিল। এমন সময়ে বিশেষ ব্যস্ততা সহকারে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, ভালই ত' আছ ?

বনমালা বলিল, হ্যাঁ ভালই আছেন।

—কে সাবিত্রী, ব'স। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার, কহিল সোমনাথ।

সোমনাথের কথার উত্তরে সাবিত্রী বলিল, বসতে এখন পারব না। তোমাকে ব'লে যেতে এলাম,—আমি আজই দশটার গাড়ীতে মাদ্রাজ যাচ্ছি।

—মাদ্রাজে ? কেন ?

—অশোকবাবুর বিশেষ একটা কাজে। তিনিও যাচ্ছেন, আমরা একসঙ্গেই যাব।

বনমালা স্তব্ধ নিশ্বাসে সাবিত্রীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

সোমনাথ কেন যেন আজ সাবিত্রীর কথায় বিচলিত হইল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, সে নীরস-কণ্ঠে কহিল, ও—তা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন ?

—জিজ্ঞাসা কচ্ছি না, জানিয়ে যাচ্ছি।

—জানান কি খুবই প্রয়োজন ছিল?

—প্রয়োজন মনে ক'রেছি ব'লেই এসেছি। আস্‌তে যদি দেরী হয়,—

—মনে ক'রব না কিছুই।

সোমনাথের কথার উত্তর দিল না সাবিত্রী। শুধু নির্নিমেষ নয়নে সোমনাথের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। পরে বনমালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, বনমালা, তুমি ত' র'য়েছই, ডাঃ চ্যাটার্জীও রইলেন। তাছাড়া ওঁর শরীরও এখন সুস্থ হ'য়ে গেছে। তবু তোমাদের উপরেই সব ভার রইল, দায়িত্বও রইল। আমি আর দেরী ক'রতে পাচ্ছি না। মোটরে অশোকবাবু অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

সাবিত্রী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সোমনাথ, বনমালা, কেহই কোন কথা কহিল না। একটু পরেই মোটর ষ্টার্টের শব্দ শোনা গেল। দিনের বেলা হইলে হয় ত' দেখা যাইত অনেকখানি কালো ধোঁয়ায় পশ্চাতের যবনিকা তৈয়ারী করিয়া মোটর দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। দেখা না গেলেও এ কথাটি অস্বীকার করা যাইবে না, ধোঁয়ার কালো যবনিকা রাতের অন্ধকারেও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। সোমনাথের অন্ধ আঁখির উপর তাহার কি কোনই ছায়াপাত হয় নাই?

সাবিত্রীর হঠাৎ মাদ্রাজ যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত হইলেও, সোমনাথের কাছে অঘটন বলিয়া মনে হয় নাই। কেননা সাবিত্রী ও অশোককে লইয়া অনেক কথাই সে কিছুদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিল। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু পরে এই দৃঢ় ধারণাই তাহার মনে হইয়াছে, সাবিত্রার জীবনে তাহার আর প্রয়োজন নাই। তাই সে কিছুদিন হইতেই মনকে তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সাবিত্রীর সঙ্গে এমন কঠিন ব্যবহার সে পূর্বে কোন দিনই করে নাই।

কিন্তু সাবিত্রীর এত তাড়াতাড়ি এতখানি অধঃপতন আমরাও যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। অশোককে ভাল লাগিলেও, এমন করিয়া অন্ধ স্বামীকে একা ফেলিয়া রাখিয়া বোম্বাই হইতে মাদ্রাজে

চলিয়া যাইবার মূলে কোন যুক্তিই নাই। অশোকের কোন কাজই আজ সাবিত্রী ছাড়া হয় না। কিন্তু এমনই বা কি বিশেষ কাজ মাদ্রাজে, যাহার জন্য এমন নির্মম সে হইতে পারিল ?

জীবনের স্রোত কখন্ কেমন করিয়া বাঁকাইয়া বসে—কে তাহার সন্ধান রাখে ? কোথা হইতে আসিল অশোক, কোথা হইতে আসিল বনমালা ! কেমন করিয়া কে কাহার মন অধিকার করিয়া লইল। সোমনাথের জীবন হইতে আজ বনমালাকেই কি বাদ দেওয়া চলে ?

বনমালা সেবা করে সোমনাথের। কাছে কাছে থাকে। প্রাণ দিয়া যত্ন আত্তিও করে। সাবিত্রী যখন চলিয়া গেল, তখনও বনমালা ছিল সোমনাথের ঘরে। সাবিত্রী তাহা দেখিয়াও গিয়াছে। ঘরের মধ্যে এতবড় ঝড় বহিয়া গেল, বনমালা একটি কথাও বলে নাই, শুধু চুপ করিয়া ভাবিয়াছে,—সোমনাথ, সাবিত্রীর, আজ এ কি রূপ দেখিলাম ! তবে কি সংসারে কিছুই সত্য নয় ? দেখিয়াছে সে সাবিত্রীর সেবারত ক্লিষ্ট মুখখানি, দেখিয়াছে কঠিন রোগের সঙ্গে দিনরাত্রি জীবনপণ যুদ্ধ করিতে, কিন্তু আজ—?

সাবিত্রী চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। বনমালা কিছুতেই যেন কথা কহিতে পারিল না। সোমনাথ বনমালাকে ডাকিল। নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল বনমালা সোমনাথের কাছে।

২৬

অথ বনমালা কথা।

অশোকের নার্সিংহোমের নার্স বনমালা। ফর্সা রং, সুডৌল চেহারা, দেখিলে ভাল লাগে। দীর্ঘ টানা চোখ দু'টি, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। তবু তাহার হাসির অন্তরালে কি যেন গোপন ব্যথা কথা কহিয়া ওঠে। সেবা-ধর্মে-অকুণ্ঠ এই মেয়েটি নিজের মনে নিজেই কাজ করিয়া যায় নিঃশব্দে, কেহ কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই তাহার সম্বন্ধে। বনমালার সাহচর্য সোমনাথকে সান্ত্বনা দেয়। বনমালাও অবসর পাইলে কাছে বসিয়া অফুরন্ত কথার ভাণ্ডার খুলিয়া

বসে। কেহ কোনদিন বনমালার জীবনের কোন কথাই জানিতে চাহে নাই।

কিন্তু কেন যেন সেদিন সোমনাথ হঠাৎ বনমালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—বনমালা, কেন তুমি এই সেবা-ধর্ম বেছে নিলে জীবনের পাথেয় ক'রে, মন শুধু আমার এই প্রশ্নই করে বারবার ; এমন সুন্দর যে, সে কেন তার স্বামীর ঘর সুন্দরতর ক'রে গড়ে তুলল না ?

সোমনাথের কথায় বনমালা বিচলিত হইল। সে সোমনাথের কথার জবাবে বলিল, সোমনাথবাবু সে কথা আমি ব'ল্‌তে পারব না, আপনি শুন্‌তে চাইবেন না সে কথা—আমাকে ক্ষমা করুন।

বনমালার আঁখিপ্রান্তে বুঝি জল জমিয়াছিল। সে আর কোন কথা না কহিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

সকরুণ বনমালার অতীত কাহিনী—।

বনমালার বয়স তখন আঠার বছর। সবে মাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল বনমালার। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হিসাবে তাহার নাম অনেকেই করিত। মাসিক পত্রিকায় তাহার রচনা প্রকাশিতও হইয়াছে। মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়া পড়িল—বনমালার বাবা তাই যথাসম্ভব বিবাহ-উদ্যোগ করিতে লাগিলেন বনমালার। কিছুদিনের মধ্যেই হাজার তিনেক টাকা খরচ করিয়া নমো নমো করিয়া গরীব মধ্যবিত্ত পিতা কন্যাদায় মুক্ত হইলেন।

বনমালা স্বামীর ঘরে আসিল নববধূ সাজিয়া। বনমালার শ্বশুর বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, পুত্রকে পাঠশালার পাঠ অপেক্ষা ব্যবসায়ের পাঠ শিক্ষা দিয়াছেন বেশী। কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া ছেলের স্বভাব বিপথগামী হইতেছে জানিতে পারিয়া শ্বশুর মহাশয় বনমালাকে পুত্রের রক্ষাকবচ স্বরূপ ঘরে আনিলেন।

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই বনমালা শ্বশুরালয়ের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। শ্বাশুড়ী ও বিধবা ননদ বাড়ীর কর্ত্রী। সে বুঝিতে পারিল, যে সাংসারিক পরিবেশে তাহারা মানুষ হইয়াছে, এ সংসার তাহার

বিপরীত-ধর্মী। মদ্যপ স্বামী প্রতিদিনই অধিক রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া আসেন। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই স্বামী-দেবতার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় বনমালার—তাহার নৈশ-ভোজের থালা সাজাইয়া। স্বামীর জড়িত কণ্ঠের অসংলগ্ন প্রলাপে ভীত হইয়া পড়িত বনমালা। তবু বাংলাদেশের মেয়েদের নাকি সবই চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়—ইহা তাহাদের সনাতন শিক্ষা। সে শিক্ষার ব্যতিক্রম বনমালার বেলাতেও দেখা গেল না—বনমালা মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতে লাগিল।

কয়েক মাস পরে বনমালা তাহার ননদকে স্বামীর স্বভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের বাড়ীর পুরুষদের ওটা দোষ নয়। তা'ছাড়া পুরুষ মানুষ,—ওদের আবার দোষ কি? বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু ফূর্তি ক'রবে না?

বনমালা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলে, সে কি কথা দিদি?

ননদ ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, তুমি ত' দেখছি অবাক ক'রলে বৌ;—এই উনি মরে সগ্‌গে গিয়েছেন, মিথ্যে কথা ব'লব না বৌ, এক আধ জন নয়, তিন তিন জন রেখেছিলেন। কিন্তু আমাকে এতটুকু কষ্ট কখনও দেন নি,—শাড়া, গহনা যখন যা চেয়েছি একেবারে হুজুরে হাজির।

বনমালার মুখে কোন কথা ফোটে না। শুধু চুপ করিয়া এই কথাই তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তোলে, এ কি হইল, কোথায় আসিয়া পড়িলাম!

মানসিক অশান্তি ও অস্বস্তিতে দিন কাটিতেছিল বনমালার। বাপের বাড়া কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর বৌ বেশীদিন বাপের বাড়া থাকিবে,— ননদ বা শাশুড়ীর কাহারও তাহা ইচ্ছা নয়। আর তা'ছাড়া বাপের বাড়ীতে বেশীদিন থাকিলে বৌ পোষ মানে না, সে কারণে অল্প কয়েকদিন থাকিয়াই বনমালাকে 'পোষমানান খাঁচায়' ফিরিয়া আসিতে হইল।

কিন্তু এইবারে বিপদ আসিল নূতন করিয়া অন্যদিক হইতে।

হঠাৎ বনমালার শ্বশুর মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল কিন্তু অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। উপলক্ষ বনমালা। অলক্ষণে নূতন বৌ বনমালার জন্যই যে শ্বাশুড়ীকে থান কাপড় পরিতে হইয়াছে, এই কথা যাহাকে পান, তাহাকেই বলেন তিনি। পাশের বাড়ীর রাঙ্গা দিদি আসিয়া শ্বাশুড়াকে বলেন, আ হা হা, এখনও যেন চেহারা টল্‌টল্ ক'চ্ছে, তোমার দিকে যে তাকাতে পারিনে বৌমা। বলি এখনি কি ওর যাবার সময় হ'য়েছিল ?

রাঙ্গা দিদিও কাঁদেন, শ্বাশুড়ীও কাঁদেন। চোখ মুছিতে মুছিতে শ্বাশুড়ী বলেন, তাই বল না দিদি এখনই কি ওঁর যাবার সময় হ'য়েছিল ? কার্তিক আমার অল্প বয়সের ছেলে। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে কি অলক্ষণে বৌ যে ঘরে এনেছি দিদি। ছেলেটার মনে সুখ নেই, রাক্ষুসী আমার নোয়া সিঁদুর কেড়ে নিলে। ওর মুখ দেখলে আমার সর্বশরীর জ্বলে যায়। হতভাগী এসেছে অবধি দেখেছ সংসারে একটু বাড়বাড়ন্ত ? উনি সারাদিন বিবি সেজে বেড়ান,—বাড়ীর খড়কুটো ভেঙ্গে যদি দু'খানা করেন বড়লোকের মেয়ে ?

পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন ননদ, তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকেন, বছর ঘুরলে না গা—বাবাকে খেল রাক্ষুসী। তখনই ব'লেছিলাম, মা নেকাপড়া বিবি ঘরে এনোনি। তা শুন্‌লে আমার কথা। তুমি যে ইলিশ মাছ খেতে কত ভাল বাসতে মাগো, ইত্যাদি।

মানুষ মরিয়া গেলে শ্রাদ্ধ হয়, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের শ্রাদ্ধের নায়িকাও এমন বহু বনমালাকে হইতে হয় আজিও।

বনমালার স্বামীর মামার ছেলে নিশানাথ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে। এই বাসাতে থাকিয়া বি-এ পড়ে। একমাত্র ভাইএর একমাত্র ছেলে নিশানাথকে শ্বাশুড়ী বিশেষ স্নেহ করিতেন। বনমালার সামান্য বড় হইবে নিশানাথ। তবে সম্পর্কে বনমালা নিশানাথের বৌদি—প্রণম্যা। নিশানাথের সঙ্গে কথা বলে না বনমালা—ইচ্ছা থাকিলেও ননদের বারণ অমান্য করা সহজ ছিল না। আর তা'ছাড়া স্বামী-দেবতাও পছন্দ করিতেন না যাহার তাহার সঙ্গে কথা বলা।

শ্বাশুড়ী অবশ্য একথা জানিতেন না। শ্বাশুড়ীর কি প্রয়োজনে সেদিন বনমালাকে বলিলেন তিনি,—বৌমা, নিশাকে একবার ছাদের ঘর থেকে ডেকে দাও ত'।

—আমি ত' ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলি না।

—কেন?

—দিদি বারণ ক'রে দিয়েছেন যে।

ননদ কাছেই ছিলেন, তিনি গর্জিয়া উঠিলেন, কি ব'ল্লে বৌ, আমি বারণ ক'রে দিয়েছি। কেন, দুধের ছেলে নিশা তার সঙ্গে কথা ব'ল্লে কি তোমার মুখ খসে যেত? রাম রাম, একমাত্র মামাত ভাই নিশা আমাদের, কলেজে বি-এ পড়ে,—তার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে মানা ক'রব আমি?

—কেন আপনি যে ব'ল্লেন, বৌ, নিশার সঙ্গে কথা ব'ল না—ওর স্বভাব চরিত্র খুব ভাল নয়। আর দাদাও তা পছন্দ করেন না।

—আমি—আমি ব'লেছি? যে মুখে মিথ্যে কথা ব'লছ বৌ, ঐ মুখে যেন পোকা পড়ে। কি দস্যি বৌ গো,—ব'লব ত' দাদাকে। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা,—ও মুখপুড়ীর মুখে কিছুই বাধবে না। মা-মা-মা—আমি ত' অবাক!

শ্বাশুড়ী গম্ভীর গলায় বলিলেন, শোন বৌমা, মেয়ে আমার মিথ্যে বলে না। তুমিই মিথ্যে কথা ব'লছ।

বিস্মিত হইয়া বনমালা বলে, আমি মিথ্যে কথা ব'লছি? ননদ চীৎকার করিয়া ওঠেন, একশ' বার মিথ্যে কথা ব'লছ।

বাগবিতণ্ডা তুমুল হইতেছিল। নিশানাথ গোলমাল শুনিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সব শুনিয়া সে তাহার পিসিমাকে বলিল, তোমরা থাম ত' পিসিমা। আমি যখন এই খণ্ড-প্রলয়ের মূলে,—তখন আমিই এর সমাধান ক'রে দিচ্ছি।

এই বলিয়া সে বনমালার সামনে যাইয়া দাঁড়াইল এবং জোর গলায় বলিল,—এরা সবাই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, ওদের কথায় কিছু মনে ক'র না বৌদি, কিন্তু আজ থেকে পিসিমার সামনে এ ব্যবস্থা পাকা

হয়ে গেল—এই ঠাকুরপোটির সঙ্গে তোমাকে অনর্গল কথা ব'লতে হবে যখন তখন। এস ত' আমার সঙ্গে।

কথা শেষ করিয়াই সে বনমালাকে সঙ্গে করিয়া স্থানত্যাগ করিল।

ননদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বুঝলে মা?

শ্বাশুড়ী উত্তর করেন, কেন, কি বুঝব?

ননদ বল্লেন, নিশা ব'ল্‌তে তুমিত' অজ্ঞান, ওদের কথাবার্তা হ'য়ে থাকে—বুঝলে?

তোর যত সব কথা, বলিয়া শ্বাশুড়ী উঠিয়া গেলেন এবং কি যেন কাজে নিশানাথকে ডাকিলেন।

* * * *

নিশানাথের সঙ্গে কথা কহিতে পারিয়া বনমালা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। সময় পাইলেই বনমালা নিশানাথের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত। নিশানাথ কোন কোন দিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা অথবা বিদেশী লেখকদের রচনা পড়িত, বনমালা শুনিত তাহার সামনে বসিয়া। বৌদির ফাই-ফরমাশটা হৃষ্টমনেই তামিল করে নিশানাথ। শ্বাশুড়ী-ননদের সংসার সারিয়া, স্বামীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া, বনমালা যতটুকু সময় পাইত ততটুকুই নিশানাথের সঙ্গে সাহিত্য কথা ও আলোচনায় কাটাইত।

বনমালা তাহার রচিত কবিতা দেখাইয়াছিল নিশানাথকে। নিশানাথ কবিতা পড়িয়া বলিয়াছিল, চমৎকার হ'য়েছে বৌদি, আমি কাগজে ছাপিয়ে দেব।

বনমালা নিশানাথের কথায় লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলে, কি এমন পদ্য হ'য়েছে যে ছাপিয়ে দেবে? এক সময়ে লিখতাম, তাই তোমাকে দেখালাম।

—আমি ব'লছি সত্যিই ভাল হ'য়েছে, বলে নিশানাথ।

বনমালা হাসিয়া উত্তর করে, সত্যি যদি ভাল লাগে তোমার, ছাপিয়ে দিও।

এমন করিয়া চলিতেছিল বনমালার সংসার। সকলেই বলাবলি করেন বনমালার সন্তান সম্ভব হইয়াছে। নাতি আসিতেছে জানিয়াও শ্বাশুড়ী খুব খুশী হন নাই। কারণ তাঁহার শাঁখা সিঁদুর যে কাড়িয়া লইয়াছে, সেই 'ডাইনী' পুত্রবধূকে এই জীবনে মনের কোথাও আর স্থান তিনি দিবেন না,—ইহা তাঁহার কঠিন প্রতিজ্ঞা। আজিও শ্বাশুড়ী তাঁহার বিষ-দন্তের অভিশাপ বনমালাকে না দিয়া জলগ্রহণ করেন না। বনমালার তাহা অজানা ছিল না,--তবু করিতে হইবে এই সুখের সংসার।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতেই সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। নিশানাথ ছাদের ঘরে একাই থাকে, পড়াশুনাও করে। আজ কয়েক দিন হইল তাহার জ্বর। শ্বাশুড়ী বনমালাকে ডাকিলেন। বনমালা শ্বাশুড়ীর ডাকে তাহার কাছে আসিল।

—তুমি নাকি আজ তিনদিন উপবাসী র'য়েছ ?

—কে ব'লেছে ?

—যেই বলুক, র'য়েছ কিনা তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি।

হ্যাঁ, নিশাঠাকুরপোর জ্বর ছাড়ছে না, তাই ঠাকুরের কাছে মানৎ ক'রেছি।

নিশার জ্বর ছাড়ছে না, তাই তুমি পোয়াতি মানুষ হ'য়ে তিনদিন উপোস করে আছ ? ঢং দেখে আর বাঁচি না। পোড়ারমুখী, পেটের ওটা যে শুকিয়ে ম'রে যাবে। তার জন্য দরদ নেই, নিশার জন্য দরদ, নিশা তোমার কে ?

—মা ?

—তুমি আমায় ভয় দেখিও না বৌমা। আসুক কার্তিক বাড়ী, ব'লব সব।

বনমালা কোন কথা না বলিয়া, নিশানাথের পথ্য লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ননদ বাড়ীতে ছিলেন না। বাসায় আসিয়া সবই শুনিলেন। দুপুর বেলা, চীৎকার করিয়া লাভ নাই। মাকে লইয়া খাইতে বসিলেন ননদিনী।

নিশানাথ বিছানায় শুইয়া উপরের ঘর হইতেই পিসিমার কথাগুলি শুনিতেছিল। আর বনমালার কাতর নয়ন দু'টি মনে করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

পথ্য লইয়া বনমালা নিশানাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, নিশানাথ চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে।

—ঠাকুরপো, ওঠ ত' ভাই, দুধটুকু খেয়ে নাও—এই ঠাকুরপো।

—আঃ,—দিলে ত' ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে।

—হাতে বই, ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? তোমার না জ্বর, বই প'ড়তে কে ব'লেছে?

নিশানাথ ত্বরিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিল, আজ সত্যি জ্বর নেই বৌদি।

—সত্যি?

—দেখ কপালে হাত দিয়ে।

বনমালা তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, জ্বর নাই। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলে বনমালা, সত্যিই তোমার জ্বর নেই ঠাকুরপো।

তিনদিন না খেয়ে ঠাকুরের কাছে মানৎ ক'রলে, জ্বরের বাবা পর্যন্ত পালিয়ে যায়, তায় জ্বর।

—কে তোমার জন্য মানৎ ক'রেছে ঠাকুরপো?

—আমি বুঝি শুনিনি? কেন তুমি এত কষ্ট কর বৌদি?

—চলে যাব কিন্তু ঠাকুরপো,—দুধটুকু খেয়ে নাও।

নিশানাথ অল্পক্ষণের মধ্যেই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলিল।

—লক্ষ্মী ভাই। নাও এই দু'টো ভাজা মশলা, জ্বরের মুখে ভাল লাগবে। কাপড়ের খুট হইতে বাহির করিয়া নিশানাথকে মশলাটুকু দিল বনমালা।

—কি বই পড়ছিলে?

—ফরাসী লেখক 'সার্তার' একখানা নভেল।

—বি-এ তে প'ড়তে হয় বুঝি?

—না, এমনি পড়ছি।

হঠাৎ বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে লাগিল। বনমালাকে নিশানাথের ঘরে একটু দেরী করিতে হইল। বনমালা বলে, ঠাকুরপো, তুমি কত দেশ-বিদেশের বই পড়; সত্যি আমাকে একটু ভাল ক'রে পড়াও না কেন?

—বৌদি হবেন ছাত্রী?

—দোষ কি তাতে?

—দাদার কাছে শোন আগে।

—কারও কাছেই কিছু শুনতে হবে না।

হঠাং বনমালার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। সে বলিতে লাগিল, ব'লতে পার ঠাকুরপো, আমি কি নিয়ে বাঁচব? তুমি এসেছ তাই দু'টো কথা বলতে পারি। স্বামীর সঙ্গে সেই নিশীথ রাত্রে দেখা হয়, সারাদিন তাঁর কাজ, তারপর জান ত' তাঁর চরিত্র। বাড়ীতে ননদ, শ্বাশুড়ী সব সময়ে রেখেছেন মুখের উপরে, আমি এসেই নাকি শ্বশুরকে খেয়ে ফেলেছি। এ অপবাদ আজও আমার গেল না। তোমার জন্য ঠাকুরের কাছে একটু মানং ক'রেছি, তাতেও নাকি দোষ। দেখছ ঐ বাইরে—আষাঢ়ের আকাশ মরছে কেঁদে কেঁদে, আমিও মরছি ঠিক অমনি ক'রে ঠাকুরপো।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল বনমালা—স্কুলে পড়ার সময় দেখেছিলাম কত স্বপ্ন, কত ছিল আশা, কিন্তু গরীব বাবা, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িয়ে আর পড়াতে পারলেন না, বিয়ে দিলেন। কিন্তু সে যাক, তুমি ত' রবীন্দ্রনাথও ভাল জান, আমাকে একটু রবীন্দ্রনাথই পড়াও না কেন ভাই।

ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল বনমালার মুখে। নিশানাথ প্রথমে বনমালার কথার গুরুত্ব দেয় নাই, ভাবিয়াছে বুঝি ঠাট্টা। কিন্তু বনমালার অন্তঃগূঢ় বেদনা নিশানাথকেও কাতর করিয়া তুলিল। সে কোন কথাই কহিতে পারিল না।

একটু পরে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বনমালা নিশানাথকে জিজ্ঞাসা করে, কি, দুঃখ পেলে আমার কথা

শুনে ? মেয়েদের জীবনে কোন দুঃখ নেই। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আচ্ছা, নিশ্চয় পড়েছ তুমি রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশিওয়ালা,' মনে আছে ঐ লাইন কটা,— ?

"আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
স্বষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে,'—

এমন সময়ে ননদ ঘরে ঢুকিলেন, কোন কথা কহিলেন না। নিশানাথের পথ্য ছিল যে বাসনগুলিতে, নীরবে সেগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিশানাথ আর কোনদিন বনমালাকে শুনাইয়াছিল কিনা আমরা জানি না, তবে সেদিনের আষাঢ়ের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল—মুহুর্মুহুঃ হইয়াছিল বজ্রপাত,—গভীর রাত্রিতেও সে দুর্যোগের মত্ততা কমে নাই। দেখিলাম ভূলুণ্ঠিতা মাধবীলতার ন্যায় বনমালা পড়িয়া আছে ঘরের মেঝের উপরে। বিপুল বেগে রক্তস্রাব হইতেছে। মত্ত স্বামী-দেবতার পদাঘাত বুকে করিয়া তবু অভাগী বাঁচিয়া আছে !

সেই রাত্রেই নিকটে হাসপাতালে বনমালাকে ভর্তি করা হয়। বনমালা একটি মৃত পুত্র সন্তান হাসপাতালেই প্রসব করে। সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইয়া এমন অবস্থা হইয়াছে, ডাক্তারকে সেই কথাই বলা হয়। হাসপাতালে ক্রমে বনমালার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। দুই মাস তাহাকে হাসপাতালে থাকিতে হয়।

দুই মাস পরে সে যেদিন স্বামীর ঘরে প্রথম পদার্পণ করিল, দরজায় দাঁড়াইয়া শাশুড়ী বলিলেন, এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান হবে না বাছা, তুমি এ বাড়ীর কেউ নও। আমি ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছি।

একথা শুনিয়া ধরণী দ্বিধা হয় নাই, চন্দ্র সূর্যও ঠিক একই রকমে উঠিয়াছে, বধির ভগবানের শ্রবণশক্তি হঠাৎ ভাল হইয়া যায় নাই,— শুধু ঘটনা-স্রোত হতভাগিনী বনমালাকে বাংলা হইতে বোম্বাই-এর উপকূলে পৌছাইয়া দিয়াছে।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এমন সুন্দর যে, সে কেন স্বামীর ঘর সুন্দরতর করিয়া তুলিল না? সোমনাথ প্রশ্ন করিয়াছিল কিছু না ভাবিয়াই। সে ত' জানিত না বনমালার বিবাহ হইয়াছে। বনমালার সর্বকার্যে আছে প্রাণের স্পর্শ, আছে সুনিপুণ কুশলতা, অন্ধ অবস্থাতেও সোমনাথ তাহা বুঝিতে পারিত। তাই বনমালা কেন নার্স হইল, কেন সে কোন' পরিবারের বধূ হইল না, এই কথাই সোমনাথ জানিতে চাহিয়াছিল মাত্র।

কিন্তু বনমালা এ কথার জবাব দিবে কেমন করিয়া? সে বিবাহিত, তবু সে নার্স, তার স্বামী আজিও বাঁচিয়া আছেন, তবু তাহাকে নার্স হইতে হইয়াছে। তবে কেন সে স্বামীর ঘর করিতে পারে নাই, কেন তাহাকে নার্স হইতে হইয়াছে,—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য কাহার, কাহাদের কাছে? যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারা নির্বিকার চিত্তে দ্বিতীয়বার বনমালার স্বামীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শ্বাশুড়ী ননদের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন এবং পরিশেষে নিশানাথকে নিশাচরের পর্যায়ে ফেলিয়া বনমালার চরিত্র লইয়া সমুদ্র-মন্থন করিয়াছেন।

'বিচারের বাণী যেখানে নীরবে নিভৃতে ক্রন্দন করে,' সেখানে শত শত বনমালাকে এমন করিয়াই নির্মম নিয়তির সম্মুখীন হইতে হয়। মানুষের মূল্য যেখানে বর্বরতার তুলাদণ্ডে বিকৃত, পাশবিকতার পরিমাপে যেখানে অনুষ্ঠিত হয় মনের মারণ-যজ্ঞ, সেখানে অবমানিত, লাঞ্ছিত বনমালাদের নার্সই হইতে হয়, সমুদ্র-মন্থনের হলাহল তাহাদেরই পান করিতে হয়।

বনমালা বাহিরে চলিয়া গেল, সোমনাথ তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার প্রশ্নের অন্তরালে বনমালার এক করুণ-কাতর মূর্তি যেন সোমনাথের অন্ধ চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। বনমালাকে আর কোনদিন কোন কথা সে জিজ্ঞাসা করিবে না, মনে মনে এই বলিয়া বনমালার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। একটু পরেই বনমালা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

২৭

দুইমাস পরে। সোমনাথ এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে। ডাঃ চ্যাটার্জী প্রায়ই আসেন, দেখাশুনা করেন। গল্প হয় সন্ধ্যাবেলায়,—সোমনাথ, ডাঃ চ্যাটার্জী ও বনমালা। সোমনাথ শুধু চোখে দেখিতে পারে না, আর কোন অসুস্থতা তাহার নাই। বনমালা মাঝে মাঝে তাহাকে বাহিরের বারান্দায় লইয়া যায়। কখনও বা বসিয়া দুইজনে গল্প করে, কখনও বা পায়চারি করে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এই দুই মাসের মধ্যে একখানাও চিঠি সাবিত্রী সোমনাথকে দেয় নাই। সোমনাথের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সাবিত্রীকে আর সে বিশ্বাস করিতে চায় না। সোমনাথ ভাবে, হয় ত' অশোকই তাহাকে অন্ধ করিয়াছে। তাহাকে নার্সিং হোমে আবদ্ধ রাখিয়া সাবিত্রীকে সে পাপ পথে টানিয়া লইয়াছে। বিদ্রোহ করিয়া ওঠে সোমনাথের মন। সে ভাবে, অন্ধ কি সে আজ হইয়াছে? সাবিত্রী তাহাকে অন্ধই করিয়াছিল। প্রকৃত অন্ধ হইয়াই বুঝি সে কথা সে আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিল। ধিক্কার ছাড়া কোন সম্বলই ত' আজ তাহার নাই। সাবিত্রীর চিন্তাও আজ তাহার কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃষ্টিশক্তির মতই সাবিত্রী চিরকালের জন্য তাহার জীবনে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

সেদিন আকাশ ভরা মেঘ। সারাদিনের মধ্যে সূর্যের মুখ দেখা যায় নাই। ইজি চেয়ারে শুইয়া সোমনাথ। পাশে বনমালা। অনেকক্ষণ আগে, সোমনাথ একটি সিগারেটে ধরাইয়াছিল, কিন্তু কি যেন ভাবিতেছিল সে, হাতের সিগারেট হাতেই পুড়িয়া যাইতেছিল, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। বনমালার নজর পড়িল সেই দিকে।

—কই, সিগারেট খাচ্ছেন না যে? অমনি অমনিই পুড়ে গেল যে।

—অ্যাঁ—ও—।

সোমনাথ কি যেন ভাবিয়া সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলিয়া দিল।

—আপনি কি যেন ভাবছিলেন, জিজ্ঞাসা করিল বনমালা।

—না, ভাবছি না কিছুই।

—ভাবছেন না মানে, গোটা একটা সিগারেট অমনি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। কেন অত ভাবেন বল্‌তে পারেন?

—কেন ভাবি? সে অনেক কথা, অনেক, অনেক—

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কর।

—কিছু মনে করবেন না?

—না।

—সাবিত্রীদি'কে আপনি কি বিশ্বাস করেন না?

এ প্রশ্নের জবাব সোমনাথ তাড়াতাড়ি দিতে পারিল না। দিতে পারাও কি খুব সোজা? যাহাকে লইয়া জীবনে কত স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করিয়াছে সোমনাথ, জীবনের প্রথম প্রেম যাহাকে কেন্দ্র করিয়া একদিন স্বর্গ রচনা করিয়াছিল, তাহাকে বিশ্বাস করে না,—এই নিদারুণ কথা কেমন করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবে? সাবিত্রী যাহা করিয়াছে, আর আজ যাহা করিতেছে—তাহার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যই নাই। অসুস্থ স্বামীকে কাহার উপরে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল? ইহা তাহার কোন্ বিশ্বাসের নিদর্শন? এই সব কথা ভাবিয়া সোমনাথ চুপ করিয়াই রহিল। অন্তরের পীড়া তাহার সারা মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বনমালা বুঝিতে পারে, এই প্রশ্ন তাহার না করাই শ্রেয় ছিল। কারণ, সোমনাথের পক্ষে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাহার সারা জীবনের সাধনা আজ বুঝি মিথ্যা হইতে বসিয়াছে। ইহা যে তাহার কত বড় দুঃখের ইতিহাস, তাহা সে কেমন করিয়া বর্ণনা করিবে? তাহার অন্তরের কাতর ক্রন্দন যেন শুনিতে পাইল বনমালা। তাহার চোখে জল আসিল, তাই সে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া

গেল। শুধু বলিয়া গেল, সে একবার ডাঃ চ্যাটার্জীর বাসায় যাইবে। তিনি ডাকিয়াছেন।

বনমালা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। ইজি চেয়ারে শুইয়া শুইয়া কত কথাই সোমনাথের মনে হইতে লাগিল। সে ভাবিল, সাবিত্রীকে সে চিনিতে পারে নাই; সাবিত্রী যে এমন বিশ্বাসহীনতার কাজ করিতে পারিয়াছে,—ইহা তাহাদেরই প্রকৃতি। নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, তাহারা যখন তখন যাহা ইচ্ছা করিয়া বসিতে পারে, একথা আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, এমন কথাও সোমনাথ চিন্তা করিয়া বসিল। কিন্তু তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া মন যেন তাহার সাবিত্রীকেই খুঁজিতে চায়। সাবিত্রীকে সে কি সত্যই চিনিতে পারে নাই,—এই প্রশ্নও আবার তাহার মনকে পাইয়া বসে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের চেনার কথাই যদি উঠিয়াছে, তবে বলিতে পারি সংসারে কে কাহাকে চেনে? সংসারে এই চেনা—না-চেনার করুণ ইতিহাস আছে। জীবন ভরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঘর করিতে দেখিলাম। স্বামী বলেন, গাধার মত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিলে, চিন্‌তে পারলে না। স্ত্রী বলেন,—হাড় মাটি ক'রে দিলাম তোমার সংসারে, আমি বলে তাই—চিন্‌লে কোন দিন? মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইহা একটা সহজ—সোজা কথা। সংসার হইতেছে, পুত্রকন্যার মুখ দেখাও বাদ পড়িতেছে না, শাড়ী গহনাও হইতেছে কিন্তু সত্যিকারের চেনা, স্বামী না চেনে স্ত্রীকে, স্ত্রী না চেনে স্বামীকে।

—"এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান' রাণী,
তবু এ তোমার রাজধানী।"—

মর্মন্তুদ কাহিনী ইহার চাইতে আর কিছু আছে কিনা জানি না।

তবে একথা ঠিক, সংসারে, সমাজে কেহই কাহাকে পুরোপুরি চিনিতে পারে না। যদি কেহ বলে আমি তোমাকে জানি, চিনেছি তোমাকে, সে মিথ্যা বলিবে। নর-নারী সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। কোন পুরুষের পক্ষে কোন নারীর সব কিছু জানা সম্ভব নয়। কোন নারীও কোন পুরুষের সব জানিতে পারে না। দু'জনেই দু'জনার

কাছে সমান দুর্জ্ঞেয়। নৈকট্য সে সমস্যার সমাধান করে না। একটি পুরুষের মনে সহস্র স্বাধীন ইচ্ছা জাগে, সামর্থ ও সুযোগের অভাবে হয়ত' তাহার কয়েকটি ইচ্ছা মাত্র রূপ পায়। একটি নারীর মনেও ঠিক ইচ্ছার সহস্র পদ্ম ফুটিতে পারে, সেখানেও সামর্থ ও সুযোগে সেই ইচ্ছার কয়েকটি কুঁড়ি হয়ত' ফুল হইয়া ওঠে। সে কারণে শুধু নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ফতোয়া জারী করিলে মানিয়া লইতে রাজী থাকিব না, সংগে সংগে একথাও বলিব, পুরুষ চরিত্র ততোধিক দুর্জ্ঞেয়। আর মন জানাজানির কথা? উহা লইয়া মারামারি না করাই ভাল। কারণ উহা মানসাঙ্কের প্রশ্ন—সমীকরণের পদ্ধতিই সম্পাদ্যের বিষয়।

আমরা সোমনাথের নার্সিংহোমে ফিরিয়া আসি। বনমালা ডাঃ চ্যাটার্জীর বাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বনমালার মুখমণ্ডল বাহিরের প্রকৃতির মতই মেঘাচ্ছন্ন। সোমনাথ তাহা অবশ্য দেখে নাই। যাহা শুনিল তাহাতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। মেঘের মতই গর্জন করিয়া উঠিল সোমনাথ।

—না, না, এসব মিথ্যা কথা। কে ব'ল্লে আমি তোমাকে ভালবাসি?

বনমালা উত্তর করিল, আস্তে কথা বলুন।--ভালবাসা এমন অপরাধের কিছু নয়। কেন, আমি কি আপনাকে ভালবাসতে পারি না? আপনিও কি আমাকে ভালবাসতে পারেন না? খুব পারেন। ভালবাসার কথা শুনেই শিউরে ওঠার কিছু নেই, চীৎকার করারও কিছু নেই। শুনুন, ডাঃ চ্যাটার্জী ব'লেছেন, আপনাকে নার্সিংহোমে আর রাখা যাবে না।

—তবে কোথায় আমি যাব?

—সে ভার ত' আমিই নিয়েছি সোমনাথবাবু। ডাঃ চ্যাটার্জী অবশ্য ব'লেছেন, যতদিন অন্য বাসা ঠিক না হয়, নার্সিংহোমে আপনি থাকতে পাররেন। আমি বলছি কি, আমার ত' একটা ছোট্ট বাসা আছে, সেখানে আমার যদি কুলোয়, আপনারও অকুলান হবে না। আপনি ভাববেন না সোমনাথবাবু।

ডাঃ চ্যাটার্জী তাতেও যদি অমত করেন,—জিজ্ঞাসা করিল সোমনাথ।

—কেন ?

—তুমি এখানে চাকুরী কর।

—চাকুরী এদের, কিন্তু বাসা আমার নিজের। তার উপরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অশোকবাবুরও নেই।

অশোকবাবু কোথায়, জান বনমালা ?

—না।

সোমনাথ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আমাকে তোমার বাসাতেই নিয়ে চল, আজই, এই মুহূর্তে, আমাকে বাঁচাও।

বনমালা সোমনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কপালে হাতখানি বুলাইয়া বলে,—আপনাকে আমি আগামী কাল সকালেই নিয়ে যাব আমার ওখানে।

সোমনাথ আর কোন কথা না কহিয়া, চুপ করিয়াই রহিল।

পরদিন সকালেই বনমালা ডাঃ চ্যাটার্জীকে বলিল, সোমনাথ আজই চলিয়া যাইতে চায়। তাহার ব্যবস্থা ডাঃ চ্যাটার্জী করিয়া দিবেন বলিলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী সোমনাথকে কহিলেন, আপনি এখন সুস্থ হ'য়ে গেছেন সোমনাথবাবু, অশোকবাবু আমাকে জানিয়েছেন,—আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া অন্য রোগীর জন্য কেবিনটা ভাড়া দিয়েছেন তাও আমাকে জানিয়েছেন। বনমালা আপনার ভার নিয়েছে জেনে সুখী হ'য়েছি। বেশ ত,' আপনি বনমালার বাসাতেই থাকুন, আমি বরং মাঝে মাঝে দেখে আসব। আর বনমালার কাছেই ত' পাব আপনার দৈনন্দিন সংবাদ।

সোমনাথ উত্তর করিল, আপনারা সকলেই আমার উপকারী বন্ধু, যদি মনে রাখেন, ধন্য হই।

ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, না না, উপকার কি বলছেন, এ আমাদের

কর্তব্য। আপনার চোখ হু'টি বাঁচাতে পারিনি, তার জন্য সব সময়েই মনে বেদনা অনুভব করি।

সোমনাথ উত্তর করে, ধন্যবাদ দিয়ে কতটুকু ঋণ আপনাদের আমি শোধ ক'রব। তবে সময়ে সময়ে মনে হয় অন্ধ হ'য়ে বোধ হয় ভালই হ'য়েছে। কত কিছুই ত' চোখের সামনে দেখতে হ'ত।

ডাঃ চ্যাটার্জী কোন উত্তর করিলেন না,—শুধু চাহিলেন একবার বনমালার মুখের দিকে।

২৮

বনমালার বাসায় সোমনাথ। বাইরে সেদিনও বৃষ্টি। নার্সিং হোমের বাহিরে আসিয়া সত্যই যেন সোমনাথ আজ নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে। সর্বদাই ওখানে সাবিত্রীর চিন্তা তাহাকে নিশির-ডাকের মত যেন পাইয়া বসিত। ভাবিয়া ভাবিয়া কত বিনিদ্র রজনী যে তাহাকে কাটাইতে হইয়াছে!

বনমালার বাসায় আসিয়া সে যেন এক নূতন জীবনের সন্ধান পাইল। বনমালার সেবা, বনমালার যত্ন, এক অপূর্বতার আবেশ সৃষ্টি করে মনে। মনে মনে ভাবে, কি বিচিত্র মানুষের জীবনের গতি। ঘাটে ঘাটে কি বিচিত্র ইহার বিকিকিনির ইতিকথা। আবার ভাবে, সকলে একদিন তাহাকে জানিত, কবি সে, সাহিত্যিক সে, আজ হয়ত' সে কথা কাহারও স্মৃতিতে নাই। কত কথা জমা হইয়া আছে মনে—প্রকাশ হইতে চায়। কেমন করিয়া সে আজ তাহার মনের কথা প্রকাশ করিবে? বাহিরে অঝোর বৃষ্টি পড়িতেছে। সে ডাকে বনমালাকে।

—বনমালা—বনমালা।

পাশের ঘরে ছিল বনমালা। সোমনাথের জন্য কয়েকটা সার্ট নিজেই তৈয়ারী করিতেছিল। সোমনাথের ডাক শুনিয়া উঠিয়া আসে বনমালা।

—ডাক্লেন?

—ব’স ত’ আমার পাশে, হ্যাঁ, একটা খাতা আর ফাউণ্টেনটা নিয়ে ব’স।

বনমালা চিঠির প্যাড্ ও কলম লইয়া বসিল সোমনাথের কাছে।

—চিঠি লিখবেন ?

—না।

—তবে ?

—কয়েকটি কথা লেখ ত’—লেখ।

সোমনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে বনমালা। কি যেন চিন্তা করিয়া, সোমনাথ বলিতে সুরু করে, লিখিয়া যায় বনমালা।

অশ্রান্ত বর্ষণ-ব্যপ্ত সন্ধ্যার আকাশ।
মাঝে মাঝে অশান্ত বাতাস,
জানালার গায়ে,
কাঁচের পাত্রের মত ভেঙ্গে গুড়ো হ’তে চায়।
শূন্য ঘরে চেয়ে হায়,—
আকাশের পানে, ভাবি মনে মনে,
জমাট মেঘের চোখে এত জল কেন ?
উন্মাদ বাতাস,
কি হারাল’, কি পেল’ না
তাহার হিসাব চায় কার কাছে ?
আছে—আছে,—সব আছে সব তোর আছে।
প্রেম সে ত’ মিথ্যা কভু নয়,
সর্ব ত্যাগ তার পরিচয়।
যা আসিল, যাহা গেল, সে ত’ ক্ষণিকের,
সাগরে ডুবিলে খোঁজ মিলে মাণিকের।

চুপ করিল সোমনাথ।

বনমালা লিখিতে লিখিতে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। এমন কবিতা রচনা করিতে পারে সোমনাথ ? আনন্দে আত্মহারা হইয়া

বনমালা বলে, আপনি এমন সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেন? পড়ি—কি চমৎকার যে হ'য়েছে।

কবিতা পড়িল বনমালা। পড়িতে পড়িতে তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল। শ্রদ্ধায় সে সোমনাথকে প্রণাম করিল।

—ওকি,—ওকি ক'রছ বনমালা!

—আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে সোমনাথবাবু, আপনি আমার অতিথি—এমন অতিথি কার ভাগ্যে জোটে!

—হ্যাঁ, সংসারের আবর্জনা। তুমি ঠাঁই দিয়েছ,—তাই।

—ওকথা ব'লবেন না। আপনার কবিতার বাণীতে বাণীতে আপনার অন্তরের কথা ফুটে উঠেছে।

সোমনাথের হাত ত্'খানি ধরিয়া বনমালা আবার বলে, আপনি কি সোমনাথবাবু,—আপনি কি!

—তুমি কাঁপছ বনমালা?

বনমালা উত্তর করিল, না।—সোমনাথের হাত ধরিয়া তখনও অব্যক্ত আনন্দ-উল্লাসে চাহিয়া রহিল অন্ধ চোখ ত্'টির দিকে। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার ত্নই গণ্ড অশ্রু প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছিল। বাহিরের আকাশে অশ্রান্ত বর্ষণ, সোমনাথের কাব্য-রচনা, অতীত স্মৃতি-ভার,—সব মিলাইয়া বনমালাকে আজ কোথায় আনিয়া ফেলিল?

সে যখন পড়ে স্কুলে, সে লিখিতে পারিত, সেও পারিত কাব্য-রচনা করিতে। বাংলার কবিদের সঙ্গে তাঁহাদের রচনার ভিতর দিয়া কত ছিল তাহার পরিচয়, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ,—কত পড়িয়াছে সে। কত লিখিয়াছে গল্প, কবিতা। জীবনের খরস্রোতে কোথায় সব ভাসিয়া গেল?

মনে পড়ে, প্রথম যেবার মাসিক পত্রিকায় তাহার লেখা বাহির হইয়াছিল;—বনমালার কি সে আনন্দ! বাসায় যে আসিতেছে, তাহাকেই দেখাইতেছে তাহার লেখা। কতজনে বলিয়াছে, তুমি ত' বেশ লেখ', লেখ' লেখ' আরও লেখ'—নাম করতে পারবে তুমি।

কতজনের আশীর্বাণী আছে খাতায় লেখা। কিন্তু সবই খাতায় লেখা আছে, খাতায় লেখাই থাকিবে।

মনে পড়ে বিবাহের কথা, শ্বশুর বাড়ীর কথা, নিশানাথের কথা। নিশানাথ যেন ছিল, স্বামীর সংসার-সমুদ্রের একটি দ্বীপ। নোঙর-হারা অর্ণবতরী বুঝি তাহার কূলে ঠাঁই পায়। নিশানাথ কত পড়িত দেশ-বিদেশের লেখকদের রচনা, বনমালা শুনিত, হয়ত' ভালই লাগিত। ভাবিত, তবু ভাল, নিশানাথের কাছে ব'সে একটু নিশ্বাস ফেলা যায়, আর পারি না বাবা। নিশানাথ বলিয়াছিল, বৌদি তোমার লেখা চমৎকার, ছাপিয়ে দেব আমি পত্রিকায়।

আকাশে একটি বজ্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, বনমালাও হঠাৎ জোরে হাসিয়া উঠিল।

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বনমালার হাতে ঝাকি দিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বনমালা?

বনমালা হাত সরাইয়া লইয়া দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিয়া দ্রুত নিজের ঘরে ছুটিয়া যায়—বলে, না, না আমার কিছু হয় নি, কিছু আমার হয় নি। বিছানার উপরে সে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে। তখনও বলিতে থাকে, না—না, আমার কিছু হয় নি, কিছু আমার হয় নি। বাহিরের বৃষ্টি তখনও থামে নাই।

* * * *

আবার রৌদ্র উঠিয়াছে। স্বচ্ছ নীল আকাশ। কোথাও এতটুকু ছিন্ন মেঘের টুকরাও দেখা যায় না। আকাশ যেন নূতন আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। বনমালা নিজের কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসে, বনমালার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে সোমনাথ। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সোমনাথকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয় বনমালা। বনমালা জানিয়াছে সোমনাথ কবি, সোমনাথ জানিয়াছে বনমালা গান গাহিতে পারে, মধুর তাহার কণ্ঠ। বনমালা গান গায়, নির্জন সন্ধ্যা মুখর হইয়া ওঠে। সোমনাথ কোন কোন দিন আবৃত্তি করে তাহার কাব্য-কথা,

নিস্তব্ধ রাত্রি কথা কহিয়া ওঠে। এমন করিয়া সোমনাথের অন্ধ আঁখির অন্ধকারে বন-জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া যায়।

দিন কাটে—শুধু দিন নয়, বৎসরও কাটে।

নির্জন শান্ত সন্ধ্যা সেদিন। বনমালার ছোট্ট বাসাটির পূবের বারান্দায়, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ আসিয়া পড়িয়াছে। অলিন্দের ছু'ধারে ছু'টি ঝাউগাছের টব, আর মাঝে অনেকগুলি গোলাপের চারা। মৃদু বাতাস, ঝিরঝির করিতেছে ঝাউ-পাতাগুলি। একটি গোলাপ ফুটিয়াছে, মস্ত বড় গোলাপ, ভারী আনন্দ বনমালার। তাই সোমনাথকে লইয়া আসিয়াছে বারান্দায়।

সোমনাথের হাত ধরিয়া, গোলাপটি তাহার হাতের মধ্যে আনিয়া দিয়া বলে বনমালা, দেখুন কত বড় গোলাপ।

পাশে দাঁড়াইয়া সোমনাথ বলে, তাইত', বেশ'ত বড়। আর গন্ধও চমৎকার। কি রং তোমার গোলাপের?

একেবারে শাদা, চাঁদের আলোতে কি সুন্দর যে হ'য়েছে দেখতে।

—তাই নাকি, আর তুমি?

দাঁড়ান, ঝাউগাছটাকে একটু সরিয়ে দিয়ে আসি, চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে, এই বলিয়া বনমালা ঝাউগাছটি সরাইয়া রাখিল।

সোমনাথ বলিল, কিন্তু কি কোমল তোমার শাদা গোলাপ। এই যে ছু'হাতে পাচ্ছি এর স্পর্শ, এতটুকু কাঁটা কোথাও নেই।

বনমালা হাসিয়া বলে, চাঁদের আলোর গোলাপ কিনা তাই কাঁটা নেই।

সোমনাথ শিহরিয়া উঠিল যেন, একটু পরে বলিল, কি ব'ল্লে, চাঁদের আলোর গোলাপ? একথা কেন ব'ল্লে?

—কেন?

—না কিছু নয়,—বনমালা কোথায় তুমি?

—এই ত' আপনার পাশেই আছি দাঁড়িয়ে।

—বনমালা, পার না চিরদিন আমার পাশে দাঁড়াতে?

—ঘরে চলুন,—হঠাৎ হাওয়াটা যেন জোরে বইতে সুরু ক'রেছে।

সোমনাথ কিছু বলার আগেই, বনমালা তাহাকে ঘরে লইয়া আসিল। সোমনাথকে ইজিচেয়ারে বসাইয়া, নিজেও তাহার পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।

আপনার মনটা যেন হঠাৎ কেমন হ'য়ে গেল, জিজ্ঞাসা করে বনমালা।

সোমনাথ উত্তর করে, হ্যাঁ, কেমন যেন লাগল। মনে হ'ল সাবিত্রীর মত তোমাকেও বুঝি হারাতে হবে। সর্বনাশা ঐ চাঁদ, ঐ চাঁদকে আমার ভারি ভয়। চাঁদের গোলাপে কাঁটার ভয় নেই, তুমি হয়ত' বলবে আছে কলঙ্কের আশঙ্কা, কিন্তু তার শাদা রংএ নেই ত' কোন কালিমা।

বনমালা নীরবে সোমনাথের মাথায় হাত বুলাইতে থাকে, কোন সাড়া দেয় না। গভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া যায় সারা ঘর।

সোমনাথ ডাকে, বনমালা?

—বলুন।

—তুমি কত কষ্ট কর আমার জন্য। সাবিত্রী যতদিন চলে গেছে, এক মুহূর্ত তুমি আমাকে ছেড়ে যাওনি। আমাকে নিয়েই চলেছে তোমার সব। সাবিত্রী গেল, চাকুরী থাকল না, মা বাবার খোঁজ জানি না, রাজুকে ভুলেছি, মাসিমার সংবাদ নেই—কিছু আমার নেই, কেউ আমার নেই, তবু তুমি কেন এত ক'রে আমাকে ভালবাসলে বনমালা?

ভালবাসা,—একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে অর্ধ-উচ্চারিত কথাটি বনমালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সোমনাথ বলে, না না, তুমি চুপ করে থেক না বনমালা। বল।

বনমালা কি বলিবে বুঝিতে পারে না। সে যে তাহাকে অন্তরের সর্বস্ব উজাড় করিয়া দিতে পারে।

কিন্তু সে কথা প্রকাশের বেদনা যে প্রচুর—বনমালা তা জানে; তাই নিজেকে হারাইয়া ফেলিল না সে,—নীরবেই রহিল।

সোমনাথ একটু পরে বলিল, বুঝেছি, তুমি হয়ত' পার না আমাকে ভালবাসতে, হয়ত' আমার সব ধারণাই ভুল।

বনমালা সোমনাথের কথার উত্তরে বলিল, এ ত' খুব সহজ কথা সোমনাথবাবু। সেবা-ধর্ম আমাদের,—মানুষের সেবা করি, তাকে যদি ভালবাসা বলেন, ভালবাসি আপনাকেও।

সোমনাথ কেন যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল বনমালার কথায়। সে বলে, জানি জানি, তোমাদের দয়ার প্রাণ, তোমরা সবাইকে দয়া কর, আমরা তোমাদের কৃপার পাত্র। ব'লতে পার, আমি তোমাদের কি ক'রেছি, কেন আমাকে নিয়ে এমন খেলা কর তোমরা?

—খেলা?

—খেলা নয়ত' কি? সান্ত্বনা-বিহীন এই জীবনের কি মূল্য আছে ব'লতে পার? তার চেয়ে আমাকে তোমরা মেরে ফেল।

বনমালা কাঠের পুতুলের মত বসিয়া থাকে, নিথর—নিঝুম। ধীরে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় আসে বনমালা। সোমনাথের নির্ম্মম আঘাতে বনমালা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। চোখ মুছিয়া অতিকষ্টে আবার সে সোমনাথের কাছে বসিয়া বলিল, সোমনাথদা', তোমাকে কষ্ট দেই, একথা আমি কল্পনাও করি না।

এই সর্ব্বপ্রথম বনমালা সোমনাথকে 'দাদা' ও 'তুমি' বলিল।

সে আবার বলে, সোমনাথদা', সর্ব্বংসহা ধরণীর সর্ব উপাদানে গঠিত এই নারী দেহ আর তার মন। তোমরা যত কঠিন আঘাতই কর না কেন, আমরা সহজেই সে আঘাত সহ্য ক'রতে পারি।

বনমালা থামিল। কিন্তু সোমনাথ তাহার কথার কোন জবাবই দিল না।

বনমালা তবু বলে, আমার কথায় তুমি হয়ত' ব্যথা পেয়েছ। কিন্তু ব্যথা যে দেয়, তার ব্যথার হিসেব কেউ ত' রাখে না। মাটি খুঁড়লে হয়ত' জল পাওয়া যায়, কিন্তু সব সময়েই কি সে জল ভাল হয়? হয় না। কোন্ মাটির নীচে কি জল আছে তাও ত' জানতে হবে? সোমনাথদা'—আমি যে নোনা জলের মাটি।

একটু থামিয়া কি যেন ভাবে বনমালা, আবার বলে, নার্সিংএর কাজ করি। এই একটি কথা 'নার্স' আমাদের দেশে আজও কতই না

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে ভরা। দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচারে দুশ্চরিত্রা আখ্যা নিয়েই এই নার্স আমাকে হ'তে হ'য়েছিল। সোমনাথদা', তোমাকে যতটুকু পারি কাছে রেখে সেবা ক'রতে দাও, আর কিছু প্রশ্ন আমায় ক'র না।

বনমালা রুদ্ধকণ্ঠে আর কিছু বলিতে পারিল না। সোমনাথের অন্ধ আঁখিপ্রান্তে জল জমিয়াছিল। বনমালার শেষের কথাগুলিতে, তাহাও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নিজের বস্ত্রাঞ্চলে সোমনাথের গণ্ড মুছাইতে মুছাইতে বলে বনমালা, জানি তোমার মন আজ আমাদের উপরে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। সাবিত্রী নেই বলে কি কেউ তোমার নেই? জান ত' আমরা মায়ের জাত, নার্স হ'লেও যতটুকু করি, ভাল না বাসলে ক'রতে পারি না। তাকে তোমরা কর্তব্যই বল আর দয়াই বল। তুমি আমাকে ভালবাস জানি, কিন্তু এও জানি, সে ভালবাসা সাবিত্রীকে ছাপিয়ে উঠবে না কোনদিন। সে ত তুমিও জান সোমনাথদা'। সাবিত্রী তোমার মনের মণি-কোঠায়, সেখানে কোন বনমালা কোনদিনও প্রবেশ অধিকার পাবে না। সাবিত্রীর আসন যদি আজ আমি জবর দখলও করি, তারপর কোনদিন সাবিত্রী যদি ফিরে আসে, সেদিন সে তুঙ্গ-মঞ্চ-চূড়া থেকে তুমিই সর্বপ্রথমে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবে। তাই আমার কোন লোভই নেই সাবিত্রীর সেই স্বর্ণাসনের উপর। পথের যাত্রীর মত এইত' আমাদের পরিচয়, পথ যেদিন ফুরিয়ে যাবে, নমস্কার জানিয়ে চলে যাব। আর কোন কামনা আমার নেই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় সারা ঘরখানি বুঝি দুলিয়া উঠিল। বারান্দা হইতে তখন চাঁদের আলো সরিয়া গিয়াছে। পরদিন সকালে দেখা গেল অস্থির-বাতাস সেই সাদা গোলাপের পাপড়িগুলি এলোমেলো করিয়া দিয়া গিয়াছে।

২৯

ডাঃ চ্যাটার্জী মাঝে মাঝে বনমালার বাসায় আসেন, খোঁজ খবর লইয়া যান সোমনাথের। আজও আসিয়াছেন। কিন্তু আজ আসিয়াছেন তিনি এক শুভ সংবাদ দিতে।

বনমালা ডাঃ চ্যাটার্জীকে বলে, বলুন না কি শুভ সংবাদ?

ডাঃ চ্যাটার্জী ব'লেন, এ এমন একটা শুভ সংবাদ, যা শুনলে লোকে পাগল হ'য়ে যায়, অর্থাৎ কিনা—যে হাসে না সে কাঁদে, আর যে কাঁদে না সে হাসে।

—মানে? তীক্ষ্ণ হাসি চোখে তাকায় বনমালা, চ্যাটার্জীর দিকে।

—ভুল ব'ললাম নাকি? দেখ, দেখ, শুভ সংবাদ দিতে আমার পর্যন্ত কেমন বিভ্রম ঘ'টে যাচ্ছে। না আমি বলছিলাম কি,—যে হেসে বেড়ায় সে উচ্চরোলে কাঁদতে সুরু করে, আর যে কেঁদে বেড়ায় সে হিঃ হিঃ ক'রে হাসতে আরম্ভ করে।

—বনমালা হাসিয়া ব'লে, কাজ নেই বাবা এমন শুভ সংবাদ শুনে।

—কিন্তু না ব'লেও ত' উপায় নেই আমার।

—কিন্তু পাগল হ'য়ে যাই যদি?

—তার জন্য চা ও খাবার এনে ভাল ক'রে first aidএর ব্যবস্থা কর।

—তা না হয় ক'রছি, কিন্তু শুভ সংবাদটি বলবেন ত'? কি, সাবিত্রীদেবী এসেছেন?

—না, এই দেখ টেলিগ্রাম।

—কিসের টেলিগ্রাম।

—সোমনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল, এইবারে কথা কহিল।

—কি, সাবিত্রী মরেছে?

ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, না না, তা কেন হবে সোমনাথবাবু, সত্যি শুভ সংবাদ। আপনারা বোধ হয় ভুলে গেছেন নার্সিং হোমে থাকতে

আমার কাছ থেকে আপনার নামে আর বনমালার নামে দু'খানা লটারীর টিকিট কিনিয়েছিলাম।

বনমালা চীৎকার করিয়া বলে, কি,—লটারীতে টাকা উঠেছে?

—হ্যাঁ, সোমনাথবাবুর নামে, ঘোড়া উঠেছে, ঘোড়া যদি দৌড়োয় —বহু টাকা পাওয়া যাবেই।

—বনমালা জিজ্ঞাসা করে, সত্যি—সোমনাথদা' বহু টাকা পাবে?

—হ্যাঁ, ঘোড়া যদি দৌড়োয়। আর নন্-স্টার্টার হ'লেও পাওয়া যাবে কিছু। টিকিটখানা আছেত'? ননডিপ্লুম—হোয়াইট-রোজ, দেখ ত'।

বনমালা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলে, নিশ্চয় আছে, আমি উঠিয়ে রেখেছি, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

যাইবার পথে সে আনন্দ-আতিশয্যে সোমনাথের মুখখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলে, সোমনাথদা' তুমি অনেক টাকা পাবে। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। অনেক টাকা তুমি পাবে—অনেক।

ডাঃ চ্যাটার্জী হাসিয়া বলেন, দেখেছ ত', ব'লেছিলাম কিনা, এ সংবাদ শুনলে লোকে পাগল হ'য়ে যায়। পাগল হ'তে তোমার আর বাকি কি বনমালা!

—বা—রে, আনন্দ হবে না বুঝি? আমার সোমনাথদা' টাকা পাবে —তাই না সোমনাথদা'—বলত' কত টাকা?

সোমনাথের পাশে বসিয়া পড়িয়াছিল বনমালা। ভুলিয়াই গিয়াছে তাহাকে টিকিট আনিতে বলিয়াছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

ডাঃ চ্যাটার্জী একটু পরে বলেন, তা টিকিটটা আন বনমালা।

বনমালা জিব কাটিয়া তাহার লজ্জা প্রকাশ করিল এবং দ্রুত টিকিট আনিতে ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল।

সোমনাথ ডাঃ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আমার নামে টিকিট কেনা হ'য়েছিল?—আর সেই টিকিটে টাকা পাওয়া যাবে?

আমি আপনাকে নিয়ে রহস্য ক'রব না—এটা অবশ্য আপনি বিশ্বাস ক'রবেন, বলেন ডাঃ চ্যাটার্জী, টিকিট দু'খানা নার্সিং-হোমে থাকতেই কেনা হ'য়েছিল, আপনার মনে না থাকারই কথা। আপনার হ'য়ে

বনমালাই লিখে দিয়েছিল। টেলিগ্রামে লিখেছে ননডিপ্লুম 'হোয়াইট-রোজ', আপনার নামে এসেছে টেলিগ্রাম। আমি পরে যখন টিকিট পাই, আপনার আর বনমালার টিকিট তার কাছেই দেই।

এমন সময়ে বনমালা টিকিট দু'খানা লইয়া আসিল। ডাঃ চ্যাটার্জী বনমালার হাত হইতে টিকিট লইলেন।

এই ত' ননডিপ্লুম 'হোয়াইট-রোজ', টিকিট নম্বর A 99490; এই দেখ বনমালা টেলিগ্রাম,—আর এই দেখ টিকিট। একেবারে মিলে গেছে।

বনমালা জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে সোমনাথদা' টাকা পাবেই ?

উত্তর করেন ডাঃ চ্যাটার্জী, নিশ্চয়, টাকা পাবেন, ঘোড়া না দৌড়োলে কম পাবেন।

—কেন, সোমনাথদা'র ঘোড়া দৌড়োবে না কেন ?

—কি মুস্কিল, কে বল্‌ছে দৌড়োবে না। যদি না দৌড়োয়, তাই ব'লছিলাম। এই সব লটারীতে রেস হয় যে। রেসে সব ঘোড়াই কি দৌড়োয় ? ঠিক আছে, বাইশ তারিখে রেস ; এই নাও টেলিগ্রাম, টিকিট সাবধানে রেখে দাও। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না বনমালা, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আপাততঃ এক কাপ চা বেশ ভাল ক'রে খাওয়াও ত' দেখি।

তিন জনে বসিয়া চা পান চলিয়াছে তখন।

ডাঃ চ্যাটার্জী চায়ের চুমুকটি শেষ করিয়া বলিলেন, সোমনাথবাবু, আপনি ত' দেখ্‌ছি নির্বিকার, কোন কথাই বলছেন না। অবশ্য ভাবতে গেলে আজ কষ্ট বেড়েই ওঠে। আজ যদি সাবিত্রী দেবী থাকতেন,—চোখে দেখতে পেতেন আপনি,—আনন্দ রাখবার জায়গা রইত না। বুঝি, আজকের শুভ সংবাদের পরিপূর্ণ আনন্দ আপনি উপভোগ ক'রতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হয় দিনের নাগাল আপনি পাবেন।

দরজায় কে যেন কড়া নাড়িল। চ্যাটার্জী আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। একজন হিন্দুস্থানী—মাথায় পাগড়ী, কপালে চন্দন, গলাবন্ধ লম্বা কোট গায়ে, আত্ম-প্রকাশ করিল।

—ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন, কিস্‌কো মাঙ্‌তা ?

—সোমনাথ চক্রবর্তী, কোই হ্যায় কুঠীমে ?

—আপ্‌ কাঁহাসে আ রাহা হ্যায় ?

—ম্যায় গিয়াথা, অশোকবাবুকা নাসিংহোম্‌মে, সোমনাথবাবুকা সাথ কুছ্‌ বাৎচিৎ করনেকোবাস্তে। উহা এক দ্বারবাননে কহা, বাবুজীত' ইহাঁপর রয়তাহ্যায়।

—আইয়ে অন্দর মে।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করিল।

ডাঃ চ্যাটার্জী তাহাকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, বইঠিয়েজী, আপকা সামনে, এহই খুদ সোমনাথবাবু হ্যায়।

—রাম, রাম, নমস্তে বাবুজী, বলিয়া বসিল লোকটি, আরে মশাই আপনে লোকত' বাঙ্গালী আছেন। কোলকাতামে হামারা গদিভি আছে, হামি বাংলা বুঝতে পারে, বলতে ভি পারবে।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল, কি আপনার দরকার আমার কাছে ?

লোকটি উত্তর করিল, শুনিয়াছেন নিশ্চয়, আপনার নামে লটারীর টিকিট উঠিয়াছে। হামি বলতে চাই, আপনার নামের ঘোড়া দৌড়াতে পারে, নাও ভি দৌড়াতে পারে। যদি না দৌড়ায় বেশী কিছ্‌ পাবেন না। আর দৌড়ালে ভি কোতো পাইবেন ? হামি আপনার টিকিট কিনিয়া লইতে চায়। আপনাকে হামি দু'হাজার টাকা দিব।

বনমালা একটু আগে ডাঃ চ্যাটার্জীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—দু'হাজার ?

ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, কত ? দু'হাজার ? রাম রাম শেঠজী, আসুন আপনি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকা লইয়াই ত' আসিয়াছে।

—না বলছি কি, টাকা নিয়ে বাড়ী যাও। দু'হাজার টাকা,—এত বেশী দামে টিকিট আমরা বিক্রী ক'রব না !

—লেকিন, নন-স্টার্টার হোয়েগেলে ত', আটশ', নশ' জোর মিলতে পারবে।

—তাই ত বলছি,— দু'হাজার বড় বেশী ব'লেছেন!

শেঠজী বুঝিলেন এই দামে টিকিট কেনা যাইবে না। তিনি আরও তিন হাজার বাড়াইলেন। ডাঃ চ্যাটার্জী তাহাতেও রাজী হইলেন না। শেঠজী চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকজন টিকিট-ক্রেতার প্রাদুর্ভাব হইল। সর্বশেষে যিনি আসিলেন, তিনি দশহাজার টাকা বলিয়া গেলেন। ডাঃ চ্যাটার্জী বিচক্ষণ লোক, ইহাতে তিনি বিচলিত হইলেন না। সকলকেই যথারীতি ভদ্রতা সহকারে ফিরাইয়া দিলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী বনমালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, শোন বনমালা, আমি এখন যাচ্ছি, লোক হয় ত' আরও আস্‌বে। আজ রাত হ'য়েছে, তবু আস্‌তে পারে। আগামীকাল সকালে ত' আস্‌বেই। সকলকেই বলে দিও, টিকিট আগে থেকে বিক্রী ক'রব না আমরা, ঘোড়ার ফাইনাল রাণ পর্যন্ত দেখব।

সোমনাথ ডাঃ চ্যাটার্জীর কথার উত্তরে বলিল, টিকিট আপনিই নিয়ে যান ডাক্তারবাবু, যা হয় ব্যবস্থা আপনিই ক'রবেন।

—ব্যবস্থা ক'রলেই ত' হবে না সোমনাথবাবু, টাকা পয়সার ব্যাপার।

—কিন্তু বনমালা এ সব হাঙ্গামা ক'রতে পারবে কেন?

—একজনকে ত' ক'রতেই হবে। আমাকে কিছু ক'রতে হ'লে আপনার পাওয়ার-অফ্‌-এটর্নী দরকার।

—বেশ, তাই না হয় করুন। আপনি ছাড়া কে আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য ক'রবে?

আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি ক'রব সোমনাথবাবু। বেশ আমার এক বন্ধু এটর্নি আছেন, তাঁকে দিয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা সব আগামী কালই ক'রে ফেলব। আচ্ছা আজ যাই বনমালা, যাই সোমনাথবাবু।

বনমালা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নমস্কার জানাইল। ডাঃ চ্যাটার্জী চলিয়া গেলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী চলিয়া গেলে, বনমালা সোমনাথের হাত দু'টি ধরিয়া বলে, জান সোমনাথদা', একটা লোক দশ হাজার ব'ল্লে। তুমি কত টাকা পাবে, কত,—কত টাকা। তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি সোমনাথদা', এই টাকা দিয়ে আমি তোমার চোখের চিকিৎসা করাব।

—এ টাকা ত' আমার নয় বনমালা।

—কেন ?

—আমার নামে তুমিই কিনেছিলে টিকিট।

—সেই জন্যইত' তোমার।

—তোমার টাকা আমার কেমন ক'রে হবে ?

—আর তোমার টাকাই বা আমার কেমন ক'রে হবে ?

—আসলে টাকাত' তোমারই।

—আচ্ছা বেশ তাই হবে, আমার টাকা আমি যা ইচ্ছে তাই ক'রব কিন্তু। চল খেতে দেই তোমাকে। রাত্রি হ'য়ে গেছে অনেক।

আহারান্তে সোমনাথ শুইয়া পড়িল। তাহার গায়ে চাদরটা টানিয়া দিয়া বনমালা নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘরে আসিয়া নিজেও শুইয়া পড়িল।

*   *   *   *

লটারীর টিকিটে টাকা উঠিলে এবং তাহা পাইতে হইলে যে সমস্ত ব্যবস্থা সোমনাথের করা উচিত, ডাঃ চ্যাটার্জী সে সবই করিয়া দিলেন। সোমনাথ ডাঃ চ্যাটার্জীকে পাওয়ার-অফ্-এটর্নী দিয়াছিল।

যথাদিনে রেস হইয়া গিয়াছে। রেসে সোমনাথের ঘোড়া দৌড়াইয়াছে, টেলিগ্রাম আসিয়াছে এবং সোমনাথ সর্বসমেত ৪২০০০ হাজার টাকা পাইয়াছে।

অর্থ প্রাপ্তিতে বনমালার কি সে আনন্দ ! সন্ধ্যা লাগিতেই সেদিন ডাঃ চ্যাটার্জী বনমালার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনমালা তখন সোমনাথকে গান গাইয়া শুনাইতেছিল। ডাঃ চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকিতেই বনমালা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ডাঃ চ্যাটার্জী। অরগ্যান ছাড়িয়া উঠিল বনমালা।

—উঠলে কেন, চমৎকার লাগছিল তোমার গান, বল্লেন ডাঃ চ্যাটার্জ্জী।

—সোমনাথদা', ডাঃ চ্যাটার্জী এসেছেন।—বসুন, আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।

বনমালা অন্য ঘরে চলিয়া গেলে, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন আছেন ?

—ভালই।

—দেখুন ত' আজ আপনি ৪২০০০ হাজার টাকা পেলেন, টিকিটটা আগে বিক্রী ক'রে দিলে, এত কি পাওয়া যেত ? সোমনাথবাবু, আজ আপনার কাছে একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছি।

—বলুন।

আজ ক'দিন ধরে বার বার একথা আমার মনে হ'য়েছে। আপনাকে কেন যে ভাল লাগে জানিনা। আপনার চোখ দু'টি আমরা অসুখের সময় রাখতে পারিনি, তার জন্য মনে মনে বিশেষ পীড়া অনুভব করি। আজ শুধু এই কথাটাই ব'লব, ভগবান যখন এতগুলি টাকা আপনাকে দিয়েছেন, আপনার চোখের একটা ভাল চিকিৎসা আমি করাতে চাই।

—বনমালা বুঝি ব'লেছে আপনাকে ?

—না ত'—বনমালা আমাকে কিছু বলেনি।

—বনমালা আমাকে প্রথম দিনই ব'লে রেখেছে একথা।

—তাই নাকি ? বনমালা—সত্যি কত যে ভালবাসে আপনাকে ! একথা বনমালা প্রথম দিনই আপনাকে ব'লে রেখেছে ? সত্যিকারের যারা আপনাকে ভালবাসে, তারা ত' এই কথাই চিন্তা ক'রবে সোমনাথবাবু।

—আপনাদের জন্যই বেঁচে আছি আজও। আপনি, বনমালা, —আপনারাই আমার পরম আত্মীয়। কিন্তু ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, অন্ধ হ'য়েছি বলে সত্য-ধর্মের প্রতিও অন্ধ হব, এ কথা কেমন ক'রে মেনে নেব। এ টাকা আমার নামে উঠেছে মাত্র, এ টাকার অধিকারী ত' আমি নই।

আপনাকে ত' পাওয়ার-অফ্-এটর্নী দিয়েছি, আপনি আমার ও বনমালার পরম বন্ধু, এই সমস্ত টাকাটা আপনি বনমালাকে দেবার ব্যবস্থা করুন। ও বেচারীর কেই বা আছে আর কিই বা আছে, এ সব টাকা ওর, ওকেই দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

অবশ্য একথা আপনি ব'লতে পারেন, বলেন ডাঃ চ্যাটার্জী, তবে টাকাটা উঠেছে ত' আপনার নামে?

সোমনাথ বলে উত্তরে, উঠেছে মানি, কিন্তু টিকিটের জন্য একটা পয়সাও ত' আমি খরচ করিনি।

ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, আপনার অনিচ্ছায় অবশ্য কোন কাজ আমি অন্ততঃ ক'রব না।

'এই কথা বলিতে না বলিতে বনমালা ঘরে প্রবেশ করিল। চা ইত্যাদির সরঞ্জাম রাখিয়া মিশির চলিয়া গেল।

ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন, এত সব কি ক'রেছ?

—কি আর এমন ক'রেছি, বলিল বনমালা।

—এখন কি এত সব খাওয়া চলে?

—খুব চলে।

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, ওটা মেয়েদের মস্ত একটা গুণ, প্রিয়জনকে যখনই ওঁরা খাওয়ান, অল্প খাইয়ে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না ওঁদের।

বনমালা উত্তরে বলে, না কখনই আমরা বেশী খাওয়াই না। ওসব হবে না ডাঃ চ্যাটার্জী, ভারি ত' ক'য়েকটা অমলেট, আর দুটো সিঙ্গাড়া। সোমনাথদা', তোমাকে চা দিচ্ছি, তোমাকে আর কিছু এখন খেতে দেব না,—এই বলিয়া বনমালা চা ঢালিতে লাগিল।

ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, আমি একা এত কিছুতেই খেতে পারব না।

—খুব পারবেন, সোমনাথদা'র শরীরটা আজ তত' ভাল নেই তাই, উত্তর করে বনমালা।

চা-এর কাপে চুমুক দিতে দিতে, ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন বনমালাকে, —জান বনমালা, আমি ত' এক সমস্যায় প'ড়েছি।

—কি?

—আমি সোমনাথবাবুকে ব'ল্‌ছিলাম, এতগুলি টাকা যখন পাওয়া গেছে, তখন তাঁর চোখের একটা সুষ্ঠু চিকিৎসা করা উচিত।

—সে কি, আমিও ত' তাই ব'লব ব'লে আপনাকে ঠিক ক'রে রেখেছি! কি আশ্চর্য, আপনার মনেও এসেছে! তাইত' হবে, এ টাকা দিয়ে সোমনাথদা'র চোখের চিকিৎসাই হবে, এদেশে না হয় বিদেশে যেতে হবে।

—ঠিক কথা, আমি ভেবেছি কি জান, এদেশে হবে না, বিদেশেই যেতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে যে।

কিন্তু আবার কি, বলে বনমালা।

সোমনাথবাবু যে রাজী হ'চ্ছেন না, বলেন ডাঃ চ্যাটার্জী, তিনি বলেন, ও টাকা নাকি তাঁর নয়।

—তাঁর নয় মানে ?

—তিনি বলেন, তোমার।

আমার ?—হাসিয়া উত্তর করে বনমালা, বেশত' যদি আমারও হয়, তাতেও ত' কোন ক্ষতি নেই। আমিই সোমনাথদা'র চোখের চিকিৎসা করাব। ডাঃ চ্যাটার্জী, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জী সোমনাথের দিকে মুখ উঁচু করিয়া বলেন, কি বলেন সোমনাথবাবু, শুনলেন ত' বনমালা কি বলে ?

সোমনাথ উত্তর করিল, টাকাটা শুধু আমার নয় এই কথাটাই আমি শুন্‌তে চাই। আমাকে শুধু এই স্বস্তিটুকু আপনারা দিন, এই সমস্ত টাকাটার অধিকার আমার এতটুকু নেই, একথাটা যেন আমি ভাবতে পারি মনে মনে। তারপর বনমালা যদি তার সোমনাথদা'কে দৃষ্টিদান দেয়, সে তার কথা, আমার নয়,—এই বলিয়া সোমনাথ চুপ করিল।

ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন, বেশ, আপনার ইচ্ছামতই কাজ হবে সোমনাথবাবু, আমি সমস্ত টাকা বনমালার নামে আগামী কালই ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব।

ডাঃ চ্যাটার্জী চলিয়া গেলে বনমালা শুধু এই কথাই চিন্তা করিয়াছে,—সোমনাথের চোখের চিকিৎসার কথা তাহার এবং

ডাঃ চ্যাটার্জীর মনে এক সঙ্গেই আসিয়াছে,—শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয় সোমনাথদা' ভাল হইয়া যাইবেই—চোখ বুজিয়া সে এই প্রার্থনাই করিল।

যোগাযোগ শুভই হইল। বনমালার মনের কথা আজ রূপ লাভ করিতে বসিয়াছে। ডাঃ চ্যাটার্জীর ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় আজ সকলই সম্ভব হইতে চলিয়াছে। 'ভিয়েনার' এক চক্ষু-চিকিৎসালয়ে সোমনাথকে ভর্তি করান হইবে। ডাঃ চ্যাটার্জী চিঠি-পত্রাদি লিখিয়া সব ঠিক করিয়াছেন। অল্প কিছুদিন বাদেই বিমানযোগে 'ভিয়েনা' যাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ডাঃ চ্যাটার্জী ও বনমালা তিনমাসের ছুটি লইয়াছেন। 'পাসপোর্ট' হইয়া গিয়াছে। বিদেশ যাত্রার সময় আসন্নপ্রায়।

বনমালার ত' মরিবার সময়টুকু নাই। সোমনাথের এটা চাই—ওটা চাই, শীতের পোষাক, বেডিং, ওভারকোট, স্লিপিং-সুট্, জুতা কয়েক জোড়া, আরও কত কি, ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মার্কেটিং করিতে হইতেছে। নূতন কয়েকটি সুট্‌কেশ কেনা হইয়াছে, বিমানে যাতায়াত করার উপযোগী, সুন্দর দেখিতে। ডাঃ চ্যাটার্জী ও বনমালা ত্ব'জনেই যাইবেন সোমনাথের সঙ্গে, তাঁহাদেরও কিছু জিনিষপত্র দরকার, তাহাও কেনা হইল। শুভযাত্রার দিন আসিয়া পড়িল।

সব কিছুই গোছগাছ হইয়া গেল। আগামী কাল সকালের বিমানে রওনা হইতে হইবে। আজ সন্ধ্যায় ডাঃ চ্যাটার্জী আসিয়াছিলেন। কখন গাড়ী আসিবে, ঠিক কখন বাসা হইতে রওনা দিতে হইবে, সব বলিয়া গিয়াছেন। সামান্য টুকিটাকি জিনিষপত্র সব গোছান শেষ করিয়া, বনমালা নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুইয়া ছিল।

এ ক'দিন—কি না পরিশ্রম সে করিয়াছে। কেন যেন একটা উৎকণ্ঠা আজ তাহাকে পাইয়া বসিল। প্রায় ত্ব'বছর ধরিয়া এই ছোট বাসাটিকে সে কত করিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সোমনাথকে পাইয়া তাহার বুভুক্ষিত-অন্তর সংসার সাজাইয়াছিল। আজই হয়ত' তাহার

পরিসমাপ্তির যবনিকা পড়িয়া গেল। বনমালা আবার ভাবিল, না তাহা কেন, সোমনাথদা' ভাল হইবে, সেইত' তাহার সেবার পরম মূল্য। সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। একটা তৃপ্তির স্বাচ্ছন্দ্য তাহার মুখের উপরে খেলা করিতেছে যেন। বনমালা সোমনাথের কাছে গেল।

'সোমনাথদা',—ডাকে বনমালা।

এস বনমালা,—ব'স কাছে। কোথায় ছিলে এতক্ষণ, মনে হ'চ্ছিল তোমারই কথা, কেন যেন মন চাইছিল, তুমি কাছে থাক একটু, বলে সোমনাথ।

বনমালা সোমনাথের পাশে আসিয়া বসিল। সোমনাথের কথার জবাবে বলে, গোছগাছ সবইত' সারা হ'য়ে গেল, এ ক'দিন কাটল যেন এক মাদকতায়! ডাঃ চ্যাটার্জী চলে গেলেই ভেবেছি আসব তোমার কাছে। কেন যেন শুয়ে প'ড়েছিলাম, ভাবছিলাম হয়ত', এইত' আর ক'ঘণ্টা পরে, আমাদের বিমানরথ উঠ্‌বে অনন্ত আকাশের রাজপথে, কত নদনদী, পাহাড় পর্বত, পার হ'য়ে পৌঁছাবো আমরা 'ভিয়েনা।' ভাঙ্গা-দেউল পড়ে রইবে সেই সুদূরের প্রান্ত পথে চেয়ে, হয়ত' মনে ক'রবে,—তার দেবতার পদচিহ্ন আছে এই দেউলের অন্তরে অন্তরে।

সোমনাথ বনমালার কথায় বলে, তা কেন হবে বনমালা?

প্রশ্নের কোন উত্তর হয়ত' দিতে পারব না সোমনাথদা', বলে বনমালা, তবু একটা অভাবের দৈত্য মাঝে মাঝে যেন উঁকি মেরে উঠ্‌ছে এখানে আজ। যার জন্য চলেছি 'ভিয়েনায়',—তোমার দৃষ্টিশক্তি—ফিরে পাবেই তুমি, এ আমার বিশ্বাস। বিশ্বজগৎ আবার নতুন ক'রে উঠবে ফুটে তোমার চোখের সামনে। তবু তোমার দৃষ্টির অন্ধকারে, যাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'য়েছিল, তাদের কথা আজ কেন এত ক'রে আমার মনে হ'চ্ছে সোমনাথদা'?

সোমনাথ এই কথার কোন উত্তরই প্রথমে দিতে পারিল না। একটু পরে বলিল, বাইরের জগৎ অন্ধকার হ'য়েছে,—কিন্তু যে জগৎ আছে ভিতরে, সেখানে যে আলো ঝলমল্ ক'চ্ছে বনমালা। আমার

বাইরের অন্ধকার সেই দীপাবলীর আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল, সে কি আমার কম ভাগ্য! তাদের আমি ভুলব' কেমন ক'রে? তোমাকে চোখে দেখেছি বলে মনে হয় না কিন্তু দেখেছি সারা অন্তর দিয়ে, তুমি আমার জীবনদাত্রী,—তুমি কল্যাণী। জানিনা চোখে আবার দেখতে পাব কিনা, যদি দেখতে পাই, তোমার মুখখানাই যেন প্রথম দেখি।

এক ঝলক আনন্দে বনমালার সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। সে কাঁদিয়া ফেলিল। সোমনাথের হাতখানি দু'হাতে ধরিয়া বলে বনমালা, আমায় তুমি ক্ষমা কর সোমনাথদা', রাক্ষুসী মাঝে মাঝে বড় বেশী চেয়ে বসে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। বনমালার ক্ষুদ্র গৃহটি যেন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। সব আজ নিঝুম। নিস্তব্ধ রজনী প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় বুঝি প্রহর গুনিতেছে। মনে হইতেছে গৃহের প্রতিটি কক্ষ, ঐ যে ছোট অলিন্দ, যেখানে ফোটে সাদা ও লাল গোলাপ, আর ঝিরঝির করে ঝাউপাতারা, ঐ ঘড়িটা, ড্রেসিং টেবিল, ছবিগুলি, সব—সব যেন রূপ ধরিয়া সামনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা যেন বারবার বলিতেছে 'যেতে নাহি দিব'।

'তবু হায় যেতে দিতে হয়'। সোমনাথ বুঝি এই কথাই ভাবিতেছিল। সে বনমালাকে স্নেহ-কণ্ঠে বলে, বনমালা, যাচ্ছি আমরা, তুমিই নিয়ে চলেছ আমাকে। তোমার এই গৃহ, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ-ভূমি। দেখনা গৃহের সবাই আজ আমার চারিপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে, আমি নাকি আর আসব' না, ভুলে যাব, না না ভুলে যাব না, কখনও যাব না ভুলে। যখন ফিরে আসব, এই তীর্থভূমি আবার যেন আমাকে স্থান দেয়—বনমালা।

বনমালা,—নিঝুম বাড়ীটার মতই কোন কথা কহিতে পারিল না। আস্তে উঠিয়া গেল পাশের ঘরে।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। সোমনাথের চোখে ঘুম নাই, ঘুম আসিতেছিল না। ভোরেই যাত্রা করিতে হইবে, ভারত ছাড়িয়া

সুদূর 'ভিয়েনা' মহানগরীর উদ্দেশে। কে জানে উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না!

কত রকম চিন্তাধারার আঁকাবাঁকা গতি সোমনাথকে আজ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়ে হঠাৎ সাবিত্রীর কথা। কোথায় সে? কাহার জন্য, কিসের জন্য, সে অন্ধ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গেল? অশোকবাবু? তিনিই বা কোথায়? মাদ্রাজে?—না বোম্বাই? আজ প্রায় দু'বছর হইল সোমনাথ সাবিত্রীকে হারাইয়াছে। সত্যই কি কোনদিন সে সাবিত্রীকে পায় নাই?—এ প্রশ্ন সে আজ কাহার কাছে করিবে? মনে পড়ে,—এই ত' সেদিন সেই ট্রেনে সাবিত্রী সকলের মুখের উপরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল 'না, আপনাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না',—যেন কতবড় অধিকারের কথা। তারপর রাজুকে লইয়া তাজমহলে, আগ্রার হোটেলে, কুন্তল-সাবিত্রী রহস্য; তারপর কাশীতে মোহনলালের চিঠি, সেই গ্রামের শেষে শিব-মন্দিরে,—সবই এক এক করিয়া তাহার চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সাবিত্রী,—মা রাগ করিয়া মধুপুরে চলিয়া গেলে, সে নিজে মধুপুরে যাইয়া মাকে লইয়া আসিয়াছিল—এ কি সব মিথ্যা? এ কি সব কথার কথা? ভালবাসার কত মহার্ঘ-মুহূর্ত জীবনের কত স্মরণীয় কাহিনী রচনা করিয়াছিল, তাহার কি কোনই মূল্য নাই,—নাই কোন অর্থ? কোথা হইতে আসিলেন অশোকবাবু, সাবিত্রী মাতিয়া উঠিল তাহাকে লইয়া। এই অন্ধ অবস্থায় নার্সিং হোমে ফেলিয়া, সাবিত্রীর চলিয়া যাইতেও বাধে নাই। আশ্চর্য! মনে পড়ে, স্নেহময়ী প্রেম-ফল্গু বনমালার কথা। বনমালা যদি এমন করিয়া কাছে না টানিয়া লইত, যদি এমন করিয়া ভাল না বাসিত, কোথায় দাঁড়াইতাম আজ? বনমালাই টিকিট কিনিয়াছিল, তাহারই জন্য আজ 'ভিয়েনাতে' যাইতে পারিতেছি। কত করিয়া সেবা-যত্ন করিয়াছে বনমালা। আজিও 'ভিয়েনা' পর্যন্ত সঙ্গে যাইবে। জীবনে এমন বন্ধু সত্যই কি সম্ভব? বনমালার বাসা ছাড়িয়া যাইতে মন যেন চায় না। বাসার প্রতিটি জিনিষ যেন কথা বলে। মনে পড়ে অন্ধ বাবার কথা, রাজুর কথা,

'রাজহংসী' নাম রাখিয়াছিলাম,—মৃদু হাসি-রেখা ফুটিল মুখে, আবার তৎক্ষণাৎই মিলাইয়া গেল।

উৎকণ্ঠিত রজনী কখন ভোর হইল, সোমনাথ জানিতে পারে নাই। শেষ রাত্রিতে বুঝি চোখে একটু ঘুম আসিয়াছিল। বনমালা ঠিক সময়েই উঠিয়াছে। সোমনাথকেও ডাকিয়া উঠাইল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা প্রস্তুত হইয়া লইল। যথাসময়ে ডাঃ চ্যাটার্জীও আসিলেন।

সরাসরি বিমান ঘাঁটিতেই তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। বিমান ছাড়িতে আর বেশী দেরী নাই। কত লোক যাইতেছে, কতজন আসিয়াছে প্রিয়জনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাইতে। বনমালা ভাবিতেছিল, আমাদের জন্য কেহই ত' আসে নাই। আমরাও ত' কোন্ সুদূরের যাত্রী—।

বিমানে উঠিতে হইবে এইবার। ডাঃ চ্যাটার্জী সোমনাথকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে বনমালা। এমন সময়ে একটি যুবক, বিমান ঘাঁটির মধ্য হইতে 'বৌদি', 'বৌদি' বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। বনমালা একবার পিছন ফিরিল কিন্তু তৎক্ষণাৎই মুখ ফিরাইয়া বিমানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে জানিল না তাহারই একজন অত্যন্ত প্রিয়জন তাহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাইত—সে নিশানাথ।

৩১

যে নিশানাথকে বনমালার শ্বশুরালয়ে একদিন দেখিয়াছিলাম আমরা, তাহাকে আজ দেখিয়া চেনা সহজ নহে। সহজ হইত যদি,—বনমালা হয়ত' চিনিতে পারিত। মাথায় টুপী, চুড়ীদার পাজামা, লম্বা কালো শেরওয়ানী, নিশানাথকে বাঙ্গালী বলিয়া ভুল করিবার কোন অবকাশই দেয় না। আর,—বনমালাকে কবিতা পড়াইয়া শুনাইত' যে বি-এ ক্লাসের ছাত্র, তাহার সবই আজ বদলাইয়া গিয়াছে। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে সে বোম্বাই আসিয়া পড়ে। তারপর

ভাগ্যই তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাক, অথবা নিজের আপ্রাণ চেষ্টাতেই হোক—সে আজ প্রখ্যাত অভিনেতা 'অসীমকুমার'।

সারা ভারতে তাহার নাম,—শুধু ভারতে কেন ভারতের বাহিরেও। তাহার সহ-অভিনেত্রী সূর্যকুমারী। দুই জনের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে সকলের মুখে। একজনের নাম উঠিলেই লোকে অপরজনের নাম করিবেই। তাহারা বলাবলি করে, আরে মশাই এদের মত হিরো-হিরোইন হয় না। রয়েল-পেয়ার। আহা—কি অভিনয় করে দুইজনে। আর সূর্যকুমারীর নাচ, ওঃ ফাষ্ট-ক্লাস। কেন "দেওয়ানা বেহুলা"—ছবিটা,—মাইরি, কি গান সূর্যকুমারীর ? আর স্বর্গের দৃশ্যের নাচ ? দেখ্‌তে হবে না মশাই।

এমন কত কি আলোচনা দর্শকেরা করে। ঘটনাক্রমে কোন রাস্তায়, কোন মোটরে যদি উহাদের কেহ একবার দেখে,—এই সূর্যকুমারী আর অসীমকুমার—দ্যাখ্, দ্যাখ্। এক জন দুই জন করিয়া এমন ভীড় জমিয়া ওঠে যে রাস্তায় যান বাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। দেশের অধিনেতাকে দেখিতে হয়ত' এত লোকে ভীড় জমায় না, অভিনেতাকে দেখিতে যত হয়। সঙ্গে অভিনেত্রী থাকিলে ত' কথাই নাই। সূর্যকুমারী ও অসীমকুমারের নামেও লোকে এমনই অস্থির হইয়া ওঠে! তাহাদের কোথাও, কোন প্রসঙ্গে, এক ঝলক্ দেখিতে পাইয়া জীবন সার্থক করিতে যাইয়া, জীবন বিসর্জন দিতেও বহু দর্শন-প্রার্থী হয়ত' কুণ্ঠা করে না! এমন করিয়া সূর্যকুমারী আর অসীমকুমার দর্শকবৃন্দের চিত্ত জয় করিয়াছে।

ছায়াচিত্র সংক্রান্ত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা পড়েন মহামুস্কিলে। কেহ হয়ত' পত্রে জিজ্ঞাসা করিল, সূর্যকুমারী বাঙ্গালী না মাদ্রাজী ? কেহ হয়ত' চিঠির উপরে চিঠি লিখিতেছে, —সম্পাদক মহাশয়, কেন যে আমার প্রতি অকরুণ হইলেন বুঝিতে পারিতেছি না। এইখানা দিয়া আপনার কাছে এই মর্মে পনেরখানা চিঠি আপনাকে লিখিলাম। আশাকরি, এই পত্রের উত্তরে বঞ্চিত হইব না। আপনি হয়ত' জানেন না সূর্যকুমারী ও অসীমকুমার

অভিনীত 'সত্যবান কা জীবন' আমি একান্নবার দেখিয়াছি। সূর্যকুমারী কি অসীমকুমারের স্ত্রী? শুনিলাম উঁহারা সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণে যাইবেন,—কথাটি কি সত্য? আবার কেহ লিখিয়াছে, মহাশয় সূর্যকুমারী কি পাশ? অসীমকুমারের আসল নাম কি? ইঁহাদের পরবর্তী ছবি কি? আবার কেহ লিখিয়াছে, অসীমকুমার না কি ইনস্যুরেন্সের দালাল ছিলেন?—ইত্যাদি। এমন কত অবান্তর প্রশ্নের শরজালে পড়িতে হয় সম্পাদক মহাশয়দের।

যাহা হউক, এ হেন অসীমকুমার আমাদের নিশানাথ। বাংলা দেশের রাজধানীর কোন এক বাড়ীর ছাদের ছোট্ট ঘরে বসিয়া, যে বনমালাকে রবীন্দ্রনাথ পড়াইয়া শুনাইত, শুনাইত দেশ বিদেশের লেখকদের কত লেখা।

বনমালাকে ভুলিয়া যায় নাই নিশানাথ। তাহারই জন্য বনমালাকে একদিন জীবনের কঠিনতম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, সে কথা তাহার অন্তরে শেল-সম বিঁধিয়া আছে। সেই কিশোর বয়সের স্মৃতি আজিও তাহাকে পাইয়া বসে, তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তোলে। পরবর্তী জীবনে সে কত খুঁজিয়াছে বনমালাকে কিন্তু কোন সন্ধান পায় নাই।

সম্প্রতি একটি ছবি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল তাহাকে। বনমালা যখন ভিয়েনাগামী বিমান আরোহণ করিতেছিল, তাহার একটু আগেই কলিকাতার বিমান পৌঁছাইয়াছে। বিমান হইতে নামিয়া নিশানাথ বাহিরের দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ নজর পড়ায় মনে হইল, যেন বনমালা বিমানে উঠিতেছে। তাই সে 'বৌদি, বৌদি' বলিয়া ছুটিতেছিল। বনমালা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। বিমান গর্জন করিয়া আকাশে উঠিয়া গিয়াছে। নিশানাথ আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া দেখিল বিমানের ঊর্ধ্বগতি,—বিরাট গরুড়,—কোন্ অমৃতের সন্ধানে অনন্ত আকাশে পাখা মেলিয়াছে। ভাবিল নিশানাথ, হয়ত' বৌদি নয়, তবু কেন যেন মন বার বার বলে, কতদিন পরে বৌদিকে দেখিলাম।

অসীমকুমারের গাড়ী সোজা তাহার বাংলোর দিকে চলিয়াছে।

সারা পথ বনমালার চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। নিকষ-পাথরে সোনার রেখা পড়িল যেন। অন্ধকার অতীতের যবনিকা সোনার কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম জীবনের সেই নিদারুণ কাহিনী, মুহূর্তে যেন রূপ ধরিয়া নিশানাথের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। বনমালা বলিতেছে,—পড়েছ রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশিওয়ালা',

·········আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে,
স্রষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে·········

তীর বেগে চলিয়াছে গাড়ী, সেই গতিবেগে নিশানাথ দেখিতে পায়, রাস্তার ধারের বড় বড় গাছ, বাড়ী ঘর, দোকান পাট—সব পিছনে দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, শুধু তাহার মন্থর অন্তর-আবেগ, আবেশ-বিধুর হইয়া তখনও বনমালাকে লইয়া ঘোরপাক খাইতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া থামিল বাসার সামনে। সোফার গাড়ী হইতে নামিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া বলিল, সাব্ গাড়ী কুঠিমে আচুকী।

—ও।

কিসের যেন তন্দ্রাভাঙ্গিল নিশানাথের। সে গাড়ী হইতে নামিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বনমালা যখন বধূ, তখন তাহার নাম ছিল 'হাসি'। নিশানাথ 'বনমালা' নাম জানে না। সে হাসি বৌদিকেই জানিত। বোম্বাই আসিবার পর হাসি-বৌদি বনমালা হইয়াছে, তাহা অবশ্য নিশানাথের জানিবার কথা নয়।

যথাসময়ে বাসায় ফিরিয়াছে নিশানাথ। সুন্দর বাসাটি। শিল্পীর গৃহ। অপূর্ব গৃহ সজ্জা। মালাবার হিল্‌সের উপরে অনুপম পরিবেশে সাগর-নয়না গেহ-অঙ্গন। উন্মুক্ত দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিশানাথ সূর্যাস্ত দেখিতেছিল। সুদূর সাগর হাত বাড়াইয়া বুঝি সূর্যকে নিজের স্নিগ্ধ বুকে টানিয়া লইল। সূর্যের বড় জ্বালা,—সারাদিন পুড়িয়া মরিয়াছে বেচারী, এতক্ষণে বুঝি শান্তির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া একটু ঘুমাইতে পারিবে।

সকাল হইতেই নিশানাথ আজ যেন মনে শান্তি পাইতেছিল না। বনমালার কথাই থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়িতেছে। নিশানাথের আজ কিছুরই ত' অভাব নাই,—প্রচুর অর্থ, অযাচিত সম্মান সে পাইয়াছে। তাহার সহ-অভিনেত্রী সূর্যকুমারী, দেশে দেশে তাহাদের নাম। জীবনের কোথাও ত' এতটুকু প্রাচুর্যের অভাব নাই। তবু আজ সারাদিন সে যেন এই কথাই মনে করিয়াছে,—সে যেন সেই বি-এ ক্লাসের ছাত্র, জীবনের প্রথমের সেই স্নেহ,—সেই আদর, 'ঠাকুরপো, তোমার না জ্বর, আবার বই পড়ছ' ? কই—আজত' কেহ এমন করিয়া বলে না ? তিন দিন জ্বর হইয়াছে বলিয়া তিন দিন উপবাস করিয়া ঠাকুরের কাছে ঠাকুরপোর জন্য মানৎ কে আর এখন করিবে ? জীবনের পথে কত হইয়াছে নূতন নূতন পরিচয়, তাহাদের কলকণ্ঠে মুখর হইয়াছে জীবনের গতি। কিন্তু সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ, সেই স্নেহ-কোমলতা, কোথাও ত' কল্পনাও করিতে পারা যায় না। ছাদের সেই ছোট্ট ঘরখানি, বোম্বাই এর প্রাসাদোপম অট্টালিকাকেও যেন আজ পশ্চাতে ফেলিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাকুল বাদল সেদিন কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল। নিশানাথের নিভৃত অন্তর—সেই বাক্যাহত বেদনা, আজ অজস্র ধারা বর্ষণে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অমূল্য হীরার টুকরার জৌলসে, জীবনের বৃহৎ দুর্মূল্য বাস্তব, মুহূর্তে আজ যেন মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে।

সূর্য তখন ডুবিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত সাগর,—বিস্তীর্ণ শ্যাম-প্রান্তরের মত মনে হয়। দূরে জাহাজগুলিতেও দুই একটা করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল,—সন্ধ্যা আকাশের তারার মত। নিশানাথ তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোধূলির শেষের আস্তরণে কোন্ দীপালোকের সন্ধান সে করিতেছে ?

এমন সময়ে কলিং বেল বাজিয়া উঠিল। একটু পরেই বেয়ারা একখানা কার্ড লইয়া নিশানাথকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

নিশানাথ কার্ড দেখিয়া বলিল, বৈঠ্‌নে বোলো ; আবি যা রাহা হুঁ। কার্ড লইয়া বেয়ারা চলিয়া গেল। নিশানাথ, ফোনের রিসিভার উঠাইয়া ডায়েল ঘুরাইয়া নম্বর লইল।

হ্যালো, মেমসাহেব আছেন, বল আমি অসীমকুমার। আচ্ছা। হ্যালো, শুক্তিয়া, আমি। আজই এসেছি। হ্যাঁ, ক'লকাতার রিপোর্ট ভাল। আমি যেতাম একটু পরেই। শুনুন, কাগজের রিপোর্টার এসে ব'সে আছেন, নীচে। কেন? ওই যে শুনেছে আমরা ইউরোপে যাব। কবে যাব তাই জানতে চান আর কি। তা, মন্দ নয়, ওকে নিয়েই আপনার ওখানে চলে আসব। বেশ। আপনি একখানা চিঠির জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন? By the end of this week? হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা আছে। না হাঙ্গামা কি আর। পাসপোর্ট ত' করাই আছে। আচ্ছা।

ফোন রাখিয়া নিশানাথ অর্থাৎ অসীমকুমার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

৩২

কয়েকদিন হইয়াছে, ডাঃ চ্যাটার্জী, সোমনাথ ও বনমালা ভিয়েনা আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সোমনাথকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া লইয়াছে। তাহার প্রাথমিক পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। অল্প কয়েকদিন বাদেই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হইবে, এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন হাসপাতালের চিকিৎসকগণ।

ডাঃ চ্যাটার্জী ও বনমালা একটি হোটেলে রহিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া ত' খুব হুড়-হাঙ্গামায় কাটিয়াছে। সোমনাথকে লইয়া ব্যস্ততা এবং উৎকণ্ঠা কি কম গিয়াছে? জগতের অন্য সব কিছুর অস্তিত্বই ভুলিয়া গিয়াছিল বনমালা। সোমনাথের প্রাথমিক পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর অনেকটা স্বস্তিবোধ করিতেছে বনমালা।

সেদিন ডাঃ চ্যাটার্জী দুপুরের পূর্বেই বিশেষ কোন কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। হোটেলের নির্জন ঘরে বনমালা একা। হঠাৎ হোটেলের উপর দিয়া একটি বিমান উড়িয়া গেল। বনমালার মনে হইল, এইত' সেদিন আমরা বিমানে বোম্বাই হইতে রওনা দিয়াছিলাম,

কত অল্প সময়ে ভিয়েনা আসিয়া পড়িয়াছি। কেন যেন বনমালার মনে হইল, সেই দিন বিমানে উঠিবার সময় কে যেন কাহাকে—বৌদি, বৌদি, বলিয়া ডাকিয়াছিল। কণ্ঠস্বর খুবই পরিচিত মনে হইয়াছিল। পিছনে তাকাইয়া কোন পরিচিত লোকেরই ত' সন্ধান মিলে নাই। সেই কণ্ঠস্বর যেন আজিও কানে বাজিতেছে। 'বৌদি' বলিয়া ডাকিত নিশানাথ। দূরগামী বিমানের লঘুতর শব্দ মন-তরঙ্গে নিশানাথের কথা বুঝি ঝঙ্কার তুলিয়াছে আজ। তাই বুঝি ভিয়েনার নির্জন হোটেল ঘরে,—বনমালার অন্তর নিশানাথের অলক্ষ্য আবির্ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

নিশানাথের সঙ্গে বনমালার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে আজ অনেক দিন। স্বামীর পদাঘাতে মূর্চ্ছাগতা বনমালা কখন হাসপাতালে নীত হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে নাই। সেইদিনই নিশানাথের সঙ্গে শেষ দেখা। তারপর কোথায় গিয়াছে নিশানাথ, কোথায় আসিয়াছে সে। তবু সেদিনের সেই কণ্ঠস্বরে যে স্মৃতির মায়া রচনা করিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবনের কত মহার্ঘ মুহূর্ত যেন মূর্ত হইয়া উঠিতে চায়।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছে বনমালা। তবু যেন ভাল লাগে, তবু যেন দেখিতে ইচ্ছা করে। নিজে নিজে প্রশ্ন করে,—আর কোনদিনই দেখা হইবে না? সেই প্রথম যেদিন নিশানাথ মফঃস্বলের কলেজ হইতে পাশ করিয়া সহরে পড়িতে আসিয়াছিল। গলাবন্ধ কোট, কদমফুলের মত মাথাটি,—হাসিই আসিয়াছিল—হাসি বৌদির। বনমালা আজও হাসিল। প্রথম প্রথম ত' নিশানাথ কথাই বলিত না। তারপর দু'জনে কত হইয়াছিল সৌহার্দ, কত হইয়াছিল ভালবাসা। দুই অপরিচিত একই কঠোর পরিবেশে এমন করিয়াই বুঝি আপন হইয়া ওঠে। বৌদি না হইলে নিশানাথের কোন কিছুই হইত না। নিশানাথ বলিত, বৌদি, তুমি কপালে হাত দিলে জ্বর সেরে যায়,—বনমালা আবার মৃদু হাসে। সে সব দিন কাটিয়া গিয়াছে,—জীবন-মহাভারতের আদি পর্ব। তারপর কত পর্ব হইয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আচ্ছন্ন হইয়াছে গগন বাণে বাণে, মুষল-মুদ্গরে, কত বিকৃত

গর্জনে। তারপর এল নার্সিংএর কাজ, নার্সিং হোম, অশোকবাবু, সোমনাথ, সাবিত্রী,—কে কোথায় গেল আজ! কোথায় সেই বাংলাদেশ, আর কোথায় এই ভিয়েনা নগরী!—ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা নামিয়া আসে বনমালার চোখে।

তন্দ্রাজড়িত নয়নে বনমালা কোন্ স্বপনপুরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়? সে যেন দেখিতে পায়,—সোমনাথের চোখে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। অস্ত্রোপচারের নিপুণতায় ফিরিয়া আসিয়াছে সোমনাথের দৃষ্টি শক্তি। হাসপাতালের সিঁড়ি বাহিয়া সোমনাথের হাত ধরিয়া সে যেন তরতর করিয়া নামিয়া আসিতেছে। দু'জনের মুখে হাসি ধরে না। এমন সময়ে একজন রমণী—অপূর্ব বেশ-বিন্যাসে যেন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বনমালা বলিল, পথ ছাড়।

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, না।

—কেন?

—ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!

—কেন,—আমার কাছে?

—তোমার কাছে? কেন, কোন অধিকারে?

—অধিকার? অধিকার আছে বৈ কি, সোমনাথদা' আমার কাছেই থাক্‌বে।

—সোমনাথদা' হাঃ হাঃ হাঃ।

—তুমি অমন ক'রে হাস্‌ছ' কেন?

—হাস্‌ব না,—জান আমি কে?

—কে তুমি?

—আমি সাবিত্রী।

—সাবিত্রী? এ কি তোমার রূপ, এ কি তোমার বেশ?

—ভয় পেয়েছ?

—না। অন্ধ অবস্থায় স্বামীকে তুমি ত্যাগ ক'রে গেছ, আজ কেন এসেছ?

—অন্ধ অবস্থায় যাকে কাছে পেয়েছ, আজ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবার পরও কি তাকে কাছে রাখতে চাও ? সরে যাও, আমি ওকে নিয়ে যাবই।

বনমালা সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, না না, সোমনাথদা'কে আমি যেতে দেব' না,—কিছুতেই না। সোমনাথদা'—তুমি বল, তুমি যাবে না—তুমি যাবে না। কেন তুমি চুপ ক'রে থাক—কথা বল।

সাবিত্রী কোন কথা শুনিল না। সোমনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল।

অবাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে বনমালা। মর্ম্মন্তুদ কণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া ওঠে, সোমনাথদা'—সোমনাথদা'।

সেই ক্রন্দন ছাপাইয়া যেন সাবিত্রীর সূচী-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হাসি ভাসিয়া আসে,—সোমনাথদা'—হাঃ হাঃ হাঃ।

ছুই হাতে মুখ লুকাইয়া যেন উচ্চরোলে কাঁদে বনমালা।

এমন সময়ে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন বনমালা বালিশে মুখ গুজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ডাকেন, বনমালা—বনমালা।

বনমালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসে। চোখে তাহার তখনও অশ্রু টলমল করিতেছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী বলেন, এই দেখো, কারা এসেছেন ?

বনমালা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে আগুন্তক দ্বয়ের দিকে, কোন কথা কহিতে পারে না, আনন্দাশ্রু প্রবলতর হইয়া ওঠে।

যাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা কেহই আমাদের অপরিচিত নন,—সাবিত্রী আর নিশানাথ।

৩৩

মাঘ মাস। শীত পড়িয়াছে খুব। সবাই বলিতেছে বাংলাদেশে এমন শীত নাকি কখনও দেখা যায় নাই। কলিকাতার উপকণ্ঠে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় পাশের বাড়ীর নেপালবাবু, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই কথাই বলিতেছিলেন।

যাই কেন বলুন না দাদা, এমন শীত দেখেছেন কখনও, বলিলেন নেপালবাবু।

মহেন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন, তা যা ব'লেছ—বহুদিন এমন শীত পড়েনি। তবে শীত একটু পড়া ভাল। কথায় আছে—মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। হ্যাঁ, শীত পড়েছিল সেবারে, যেবারে পোড়ারমুখী বড় মেয়েটা হ'য়েছিল। ও মাঘ মাসেই হ'য়েছিল কিনা।

সন্ধ্যা লাগিয়া আসিয়াছে। উত্তর-বায়ু শীতের প্রকোপ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নেপালবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার পরে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় একবার করিয়া আসিতেন; মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া আবার বাসায় ফিরিয়া যাইতেন। আজিও যথারীতি আসিয়াছেন। শীত বলিয়া একটু আগেই আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই সারদাদেবী দু'জনের জন্য দু'কাপ চা লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, এইযে, তোমার ত' নিশ্চয়ই মনে আছে।

কি,—জিজ্ঞাসা করিলেন সারদাদেবী।

নেপালবাবুকে চাএর কাপ আগাইয়া দিয়া ও নিজে চাএর ডিসে চা ঢালিতে ঢালিতে মহেন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন শীত, পড়েছেত'—

—তাই নেপাল ব'লছিল, এমন শীত নাকি পড়েনি কখনও। যেবারে হতভাগী কুন্তলটা হ'য়েছিল, সে কি শীত, তোমার ত' মনে আছে!

হ্যাঁ, সেবারে এর চেয়েও শীত। একে মাঘ মাস, তারপর এর থেকে

ডবল শীত, পোড়ারমুখী কি কম জ্বালা দিয়েছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন সারদাদেবী।

নেপালবাবু বলিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, এই ক'বছরের মধ্যে কোন খোঁজই পাওয়া গেলনা মেয়েটার !

মহেন্দ্রবাবু উত্তরে বলিলেন, পাওয়া যাবে কি ক'রে—হয়ত' বেঁচেই নেই।

মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। তিনি বাধা দিয়া বলেন, না না, তা হবে কেন, বেঁচে কেন থাক্‌বে না। আমাদের ভুলে গেছে তাই বলো। বেঁচে নিশ্চয়ই আছে, বেঁচে নিশ্চয়ই আছে, বলিতে বলিতে সারদাদেবী চোখ মুছিতে মুছিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

শীতের সন্ধ্যার সকরুণ সান্ত্বনা, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। চাএর কাপ নীরবে নিঃশেষ করিয়া নেপালবাবু বলিলেন, আজ উঠি দাদা। মহেন্দ্রবাবু কোন কথা কহিলেন না। নেপালবাবু চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে নিদারুণ শীতের মধ্যেও বৈষ্ণব বাবাজীরা টহল দিয়া গিয়াছেন। সারদাদেবীর উঠিতে আজ একটু দেরীই হইয়াছে। গতকাল কুন্তলের কথা চিন্তা করিতে করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার চোখে ঘুম আসে নাই। উনানে কয়লা দিয়া, পাখার বাতাস করিতেছেন সারদাদেবী। উৎপলা চায়ের সরঞ্জামগুলি ঠিক করিতেছে। মিন্টু তখনও ওঠে নাই।

মহেন্দ্রবাবু উপর হইতে বলিলেন, কইগো,—চা হ'লো ? বেলা সাড়ে সাতটা বাজল, প্রত্যেক দিন তোমার দেরী হয়। সে পোড়ারমুখীও চলে গেল—সকালে আমেজ ক'রে যে একটু চা খাব, তাও আমার ঘুচে গেল।

সারদাদেবী চুপ করিয়াই রহিলেন। তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন, কিছুদিন ধরিয়া সব ব্যাপারেই মহেন্দ্রবাবু কুন্তলের প্রসঙ্গ টানিয়া আনেন। বুঝিতে পারেন,—পিতার দগ্ধ অন্তর কতই না কাঁদিয়া মরিতেছে। তাই কোন কথা বলেন না। কুন্তলের জন্য কিনা

করিয়াছেন মহেন্দ্রবাবু? কুন্তল তাঁহার প্রথম সন্তান। মহেন্দ্রবাবুর সব কিছু আনন্দ তাহাকে ঘিরিয়াই একদিন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কুন্তল পিতার মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়া চলিয়া গেল। 'রাক্ষুসী চলিয়া গিয়াছে—বাঁচিয়াছি', কতদিন বলিয়াছেন মহেন্দ্রবাবু। কিন্তু সত্যই কি বাঁচিয়াছেন? তবে আজ এত করিয়া কুন্তলের কথা তাঁহার অন্তর তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে' কেন?

সারদাদেবী সবেমাত্র চা লইয়া মহেন্দ্রবাবুর ঘরে আসিয়াছেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ীর নেপালবাবু, বৌদি,—বৌদি কই, বৌদি, বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিলেন।

—আমি ওপরে ঠাকুরপো।

ওপরে,—এই বলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে আসিয়া পড়িলেন নেপালবাবু।

—আরে বৌদি, দেখ—দেখ, তোমার কুন্তলের কাণ্ড-কারখানা। সারা পৃথিবী জুড়ে তার নাম! আর তোমরা নাকি চুপ ক'রে বসে আছ। হবে না? আমি কিন্তু বৌদি আগে থেকেই জানতাম। ছোটবেলা থেকেই ও একটু অন্য রকম, বলি, কোন্ কাজটি শেখেনি, আর কোন কাজ জানত' না? আমি বরাবর ওর গুণের আদর ক'রেছি। মেয়ে বটে—হ্যাঁ।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, কি হ'য়েছে নেপাল?

নেপালবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য, জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন—কি হ'য়েছে? কাগজ পড়েন নি, আজকের কাগজ? কি সর্বনাশ, শুনুন তবে, আমিই পড়ে শোনাই।

নেপালবাবু কাগজ লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

চিত্র-তারকা সূর্যকুমারীর বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী ও তাহার সাবিত্রী ব্রত।

নেপালবাবু বলিলেন—দেখেছেন, কতবড় অক্ষরে লিখেছে—আর এই যে ছবি, দেখুন ত' কার?

সারদাদেবী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি পড় ঠাকুরপো।

পড়িতে লাগিলেন নেপালবাবু।

বাংলা দেশের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে চিত্র-তারকা সূর্যকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। পিত্রালয়ে তাঁহার নাম ছিল কুন্তল। কলিকাতার উপকণ্ঠে তাঁহার পিতা মহেন্দ্রনাথ রায়, কোন সওদাগরী অফিসে কাজ করেন এবং সেইখানেই বসবাস করেন। মাতা সারদাদেবীর উৎসাহে কুন্তলদেবী যথাসময়ে বি-এ পাশ করেন। এই সময়ে তিনি সঙ্গীত ও নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শী হন। কুন্তলদেবী বি-এ পাশ করিবার পর তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে থাকে। কিন্তু বরপক্ষের নির্লজ্জ চাহিদা ও কন্যাপক্ষের অসহায় অসংস্থান, কোন প্রকারেই বিবাহের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে না। বার বার বহু বরপক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটিল বটে, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু কন্যা পাত্রস্থ করিতে পারিলেন না। প্রতিনিয়ত নিজেকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করিয়া কুন্তলদেবী আর গৃহের মায়া করিলেন না। 'সাবিত্রীর' মতই ভাগ্য-অন্বেষণে গৃহপ্রাঙ্গণ ছাড়িয়া বিশ্বের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্বামীকে তিনি নিজেই বরমাল্য-দান করেন, তখন তিনি সাবিত্রী নামে কাশীতে এক অধ্যাপকের গৃহে বাস করেন। স্বামী সোমনাথ চক্রবর্তী, এই সময়ে আগ্রায় কোন সওদাগরী দপ্তরে কাজ করিতেন। পরে সোমনাথবাবু অফিসেরই বিশেষ কাজে কিছুদিনের জন্য বোম্বাইএ আসেন, সঙ্গে আসেন সাবিত্রীদেবী।

বোম্বাইএ সোমনাথবাবু টায়ফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং অশোক চৌধুরী নামে এক বাঙ্গালী ডাক্তারের নার্সিং হোমে তাঁহার চিকিৎসা হইতে থাকে। অশোকবাবুর সঙ্গে সাবিত্রীদেবীর পূর্ব-পরিচয় ছিল। সোমনাথবাবু আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নিদারুণ ব্যাধি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। সোমনাথবাবুর পিতাও বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সোমনাথবাবুর এই সাংঘাতিক অবস্থা সাবিত্রীদেবী কাহাকেও জানাইলেন না। মাস

কয়েক পরে অশোকবাবুর বন্ধু ডাঃ চ্যাটার্জী বরং উঁহাদের নিরুদ্দেশের এক সংবাদ দিল্লীতে এবং আগ্রায় পাঠাইয়া দেন। কারণ কাশীর অধ্যাপক তখন থাকিতেন দিল্লীতে, আর সোমনাথবাবুর পিতা থাকিতেন আগ্রায়। পরে তাঁহারা আগ্রা হইতে মধুপুরে নিজ আত্মীয় হরলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসায় চলিয়া যান।

নিজের এই মর্মান্তিক বিপদে সাবিত্রীদেবী ধৈর্য হারান নাই। এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব কি না জিজ্ঞাসা করেন তিনি অশোকবাবুকে। প্রচুর অর্থ সাপেক্ষে এই বিপদ-মুক্তির প্রচেষ্টা হইতে পারে, অশোকবাবু বলেন। ভিয়েনাতে যাইয়া অস্ত্রোপচার করিতে পারিলে হয়ত' সোমনাথবাবুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে, প্রকাশ করেন অশোকবাবু এমন কথা।

সাবিত্রীদেবী সঙ্গীত জানিতেন, নৃত্যকলা তাঁহার আয়ত্ব ছিল, অভিনয় পটুতাও তাঁহার কম ছিল না। তিনি চিত্র-জগতে অবতীর্ণ হইয়া সম্ভাব্য অর্থ উপার্জনের উপায় মনস্থ করেন। অশোকবাবু প্রথমে এই প্রস্তাবে বিশেষ সায় দেন নাই। তাহাতে সাবিত্রীদেবী বলেন, পতিব্রতা 'বেহুলা,' স্বর্গে, নৃত্যে দেবতার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার স্বামী লখীন্দরের জীবন ফিরাইয়া আনিয়া যদি নারীসমাজের আদর্শ হইয়া থাকেন, যদি দুস্তর বন্ধুর পথ ধর্মবাজের অনুশরণ করিয়া কথা-কৌশলে 'সাবিত্রী' তাহার স্বামী 'সত্যবানের' জীবন ফিরাইয়া আনিয়া জগৎপূজ্যা হইয়া থাকেন, তবে স্বামীর নয়ন-জীবন ফিরাইয়া আনিতে, চিত্র-জগতে আত্মপ্রকাশে তাঁহার এতটুকু সংকোচ হইবে কেন? স্বামীর মঙ্গল কামনায়, ইহাই তাঁহার একমাত্র সুস্থ পথ বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন। অশোকবাবু সাবিত্রীদেবীর দৃঢ় সংকল্পে মুগ্ধ হন,—সর্ববিধ সাহায্য করেন তাঁহার ঈপ্সিত কর্মপন্থায়।

সোমনাথ এই কর্মপন্থা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া, বনমালা ও ডাঃ চ্যাটার্জীর উপরে স্বামীর সব ভার ন্যস্ত করেন সাবিত্রীদেবী। মাদ্রাজ চলিয়া যাইবার নাম করিয়া সোমনাথবাবুর সান্নিধ্য হইতেও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকেন এই সময়ে সাবিত্রীদেবী। অতি অল্পদিনের

মধ্যেই অশোকবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু স্বনামখ্যাত অসীমকুমারের সাহায্যে সূর্যকুমারী নামে, সাবিত্রীদেবী বোম্বাই-এর কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। বনমালা এ সংবাদ জানিতে পারে নাই, জানিতেন ডাঃ চ্যাটার্জী, অশোকবাবু ও তাঁহাদের বিশিষ্ট কয়েকজন বন্ধু। মাদ্রাজে সাবিত্রীদেবী কখনও যান নাই। চিত্র-জগতে অভিনেত্রী সূর্যকুমারীর অসাধারণ কৃতিত্ব, চিত্র-পিপাসুরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

খুব অল্পকালের মধ্যেই, চিত্র-তারকা সূর্যকুমারী প্রভূত অর্থের অধিকারিণী হইলেন। এই সময়ে সোমনাথবাবু বনমালার বাসায় থাকিতেন। মিথ্যা লটারীর নাম করিয়া বিয়াল্লিস্ হাজার টাকা ডাঃ চ্যাটার্জীকে দিয়া সোমনাথবাবুকে দেওয়া হয়। সব কিছুই করেন অশোকবাবু ও সাবিত্রীদেবী। তাঁহাদের বন্ধু অসীমকুমার, তাঁহার কয়েকজন অভিনেতা বন্ধুকে, 'শেঠজী' প্রমুখ টিকিট ক্রেতা সাজান এবং বনমালার বাসায় তাঁহাদের পাঠান। ডাঃ চ্যাটার্জী সবই জানিতেন। তাঁহার অভিনয়ও অনবদ্য।

সাবিত্রীদেবীর কার্যক্রম—সবই সোমনাথবাবুর কাছে গোপন রাখা হয়। ভিয়েনাতে প্রথমতঃ সোমনাথবাবুর জন্য এবং পরে তাঁহার পিতা মহিমবাবুর জন্য দুইটি স্থান সংগ্রহ করা হয় কোন প্রসিদ্ধ চক্ষু-হাসপাতালে। বনমালা, ডাঃ চ্যাটার্জী ও সোমনাথবাবু ভিয়েনা পৌঁছাইবার অল্প কয়েকদিন পরে, সাবিত্রীদেবী, অসীমকুমারকে সঙ্গে করিয়া ভিয়েনা আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে আসেন সোমনাথবাবুর পিতা মহিমবাবু। অশোকবাবু মহিমবাবুকে মধুপুর হইতে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি ভগবৎ কৃপায় ভিয়েনাতে অস্ত্রোপচার করিয়া পিতাপুত্র দু'জনেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

সাবিত্রীদেবীর এই একনিষ্ঠ সাধনা, এই তেজদীপ্ত পথ-পরিক্রমা—সারা ভারতের মুখোজ্বল করিয়াছে। বৈদেশিক সংবাদপত্রে সাবিত্রী-দেবীর ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই নগরী সাবিত্রীদেবীকে উপযুক্ত নাগরিক সম্বর্ধনা জানাইতে প্রস্তুত হইতেছে।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা বোম্বাই পৌঁছাইবেন। সাবিত্রীদেবী আজ আমাদের দেশের গর্ব—আমরা সকলের সঙ্গে তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

নেপালবাবু পড়া শেষ করিলেন। মুখ উঁচু করিতেই দেখিতে পাইলেন, মহেন্দ্রবাবু ও সারদাদেবী নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। নেপালবাবু বুঝিলেন, এই অশ্রুর কতখানি ভার। তাঁহার মুখেও আর কথা সরিল না। একবার শুধু সারদাদেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, কুন্তল তোমার পুরাকালের 'সাবিত্রীর' চেয়েও বড়—তাই নয় কি বৌদি?

নেপালবাবুর গণ্ড বাহিয়াও দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

৩৪

দিল্লীতে চিঠি আসিয়াছে, লিখিয়াছেন মহিম, লিখিয়াছে সাবিত্রী, লিখিয়াছে সোমনাথ, লিখিয়াছে অশোক। বোম্বাই হইতে লেখা চিঠি। ভিয়েনা হইতে কয়েকদিন আগেই মহিমকে লইয়া বোম্বাই পৌঁছাইয়াছে সবাই। বোম্বাই আসিবার পরই চিত্র-তারকা সূর্যকুমারীর নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেইখানেই অশোক নবতম সাবিত্রী উপাখ্যান বর্ণনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়।

সংবাদপত্রে শ্রীরাধামোহন, সাবিত্রী ও সোমনাথের সব কথাই জানিয়াছেন—রুগ্না অনুরূপাকে পড়াইয়াও শুনাইয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় চিঠি আসিয়াছে সাবিত্রীদের। রাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া পঙ্গু-শয্যায় শুইয়া সব চিঠিগুলি আদ্যোপান্ত পড়িলেন অনুরূপা।

সাবিত্রী লিখিয়াছে তাহার ব্রত উদ্‌যাপনের বিস্তৃত বিবরণ, লিখিয়াছে অশোকবাবুর অনুপম বক্তৃতার কথা, লিখিয়াছে বনমালার কথা। মধুপুর হইতে হরলালমামা, রাজু ও মহামায়াকে লইয়া বোম্বাই আসিয়াছেন, তাহাও লিখিয়াছে। হরলালের কাছে শুনিয়াছে

নয়নমামীকে আর ইহলোকে দেখা যাইবে না, মোহনলাল আসিয়াছিলেন কি না, কাহারও কথা লিখিতে বাদ দেয় নাই সাবিত্রী। দিল্লী কয়েক দিনের মধ্যেই রওনা হইবে এবং দিল্লী হইতে কলিকাতা যাইবে, সব জানাইয়া চিঠি শেষ করিয়াছে।

একাধিকবার পড়িলেন অনুরূপা সাবিত্রীর চিঠি। সে তাঁহার মন্ত্রকে আজ রূপ দিয়াছে। বিজয়িনী হইয়া সে আজ ফিরিয়া আসিতেছে, এ আনন্দ তিনি কোথায় রাখিবেন! গর্বে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল। সাবিত্রী তাঁহার অক্ষয়ব্রত সাধন করিয়াছে।

সোমনাথও দীর্ঘ পত্র দিয়াছে। সে লিখিয়াছে এই পত্রে—বড়মা, তোমাকে দেখাব বনমালাকে, দেখাব অশোকবাবুকে। দেবতার চেয়ে এঁরা বড়, এঁরা মানুষ। অশোকবাবু ভিয়েনাতে পর্যন্ত যান নি। তুমিত' অশোকবাবুকে চেন বড়মা। কোন্ পুণ্য ফলে সাবিত্রী এত বড় বন্ধু পেয়েছে তা আমি জানি,—সে তোমার আর মেসো-মশাইএর আশীর্বাদ। আমাদের আর দুইজন বন্ধু, ডাঃ চ্যাটার্জী ও প্রখ্যাত অভিনেতা অসীমকুমার, এঁদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। সকলেই তোমার পুণ্য-আশীষ প্রার্থী। তুমি এঁদের দেখে কত যে খুশী হবে বড়মা। আর বড়মা,—বাবাকে তুমি অন্ধ দেখেছিলে আগ্রায়, আজ সাবিত্রীর সাধনায়, বাবা আবার পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছেন। আমাদের দেশে এমন চোখের চিকিৎসা কবে হবে? বাবার চোখে এমন বিশেষ কিছুই হ'য়েছিল না, অথচ এমন সামান্য সামান্য কারণে আমাদের দেশে কতজনকে যে জীবন ভরে অন্ধতা বরণ ক'রতে হয়। আমরা এখানে বনমালার বাসায় আছি। তোমাকে দেখার জন্য মনটা যেন দিল্লী গিয়ে বসে আছে। ছোটমা, রাজু, হরলালমামা এসেছেন বোম্বাইএ। রাজু তোমার কথা বলে।

মোহনলালের সংবাদ বহুদিন পাই না। সাবিত্রী সব সময়েই তার কথা বলে, আর বলে নয়নমামীর কথা,—নয়নমামী মারা গেছেন।

আজ শেষ করি চিঠি বড়মা। তুমি আর মেসোমশাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ ক'রো।

এইবার অশোকের চিঠি হাতে উঠাইলেন অনুরূপা। চিঠি পড়া সুরু হইবার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সাবিত্রী ও সোমনাথ দুইজনেই লিখিয়াছে নয়নমামীর কথা। তিনি ইহলোকে নাই—এ কথাও উহারা লিখিয়াছে। সুনয়নীর কথা সাবিত্রী অনুরূপাকে বলিয়াছিল আগ্রায়। সুনয়নীকে চোখে না দেখিলেও, কেন যেন মনটা দরদে ভরিয়া গিয়াছিল অনুরূপার। তাই তাহার মৃত্যু সংবাদে তাঁহার মনটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

তবে একথা ত' কেহই জানে না, কেমন করিয়া সুনয়নীর মৃত্যু হইয়াছে। সাবিত্রী তাহাকে সুস্থই দেখিয়া আসিয়াছিল। সাবিত্রী চলিয়া আসিবার পর বোধ করি তাহার পূর্ব জীবন-কথা তাহাকে উতলা করিয়া তোলে। কেহ বলে গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া সুনয়নী ডুবিয়া মরিয়াছে। আবার কেহ বলে—গঙ্গাস্নান নহে, গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইয়াছে সুনয়নী। তবে হরলাল বলেন সহজ ভাষায়,—সুনয়নীর অপ্রাকৃত মৃত্যু হয় নাই। আমরাও তাহাই বিশ্বাস করি। মৃত্যু যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে সুনয়নীর পক্ষে যে মৃত্যু স্বাভাবিক, সে তাহাই বরণ করিয়া লইয়াছে।

অশোকের চিঠি।

কাকীমা,...সাবিত্রী আর সোমনাথবাবু কত কথা লিখেছেন। জানেন ত' আমাকে, ওঁরা কি আমার সম্বন্ধে খুব বেশী বলেন নি? কাকাবাবুর আদর্শ পেয়েছিলাম প্রথম জীবনে,—যদি তাঁর আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হই, তাতে দুঃখ পেতেন আমার স্বর্গগত পিতা। বাবা কাকাবাবুকে স্নেহ ক'রেছেন নিজের ভাই মনে ক'রে। সাবিত্রীর সাধনায় সাফল্য লাভ হ'য়েছে তারই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। কৃতিত্ব তাহার। চরম দুঃখকে কেমন ক'রে হাসি মুখে গ্রহণ ক'রতে হয়—সাবিত্রীর দৃঢ় চরিত্র আজ তার প্রমাণ দিয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা এমন কবে হবে, যেদিন দৈনন্দিন জীবনের লাঞ্ছনা, অপমান, তারা দুঃখের তপস্যায় জয় ক'রবে। পদে পদে অশ্রুজল আর অবিবেচনার অভিশাপ না কুড়িয়ে, এই রোমন্থ-মন্থর যুগের সীমরেখা টেনে দিয়ে, সাবিত্রীর মত

ক'রেই ব'লবে—আপন শক্তি জয় ক'রবার অধিকার আমরা অর্জন ক'রেছি। সেই অচিরাগত যুগ-বিধাতার বোধন-বাণী, সাবিত্রী যে আপনার কাছেই পেয়েছে কাকীমা।

আমি, বনমালা, ডাঃ চ্যাটার্জী, অসীমকুমার, খুব সামান্য সাহায্যই তাকে ক'রেছি,—চলন্ত ট্রেনের যাত্রীরা, কোন ষ্টেশনে নেমে-যাওয়া কোন যাত্রীর মালপত্রগুলি নামিয়ে দিতে যতটুকু সাহায্য করেন, ততটুকু। সাবিত্রী আমাদের সকলকেই নিয়ে যেতে চায়। যদি সময় হয়, আপনাদের দেখার পুণ্য লাভ হ'তে নিজেকে বঞ্চিত ক'রব না।

মহিম পত্র দিয়াছেন। "বেয়ানদিদি", বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'বেয়ানদি'—কথাটি উচ্চারণ করিয়া একটু হাসিলেন অনুরূপা। বেদনা-বিধুর এই হাসিটুকুর মধ্যে কত বিস্মৃত ইতিকথা যেন কথা কহিয়া উঠিল।

মহিম লিখিয়াছেন,—

বেয়ানদিদি,

আপনার সাবিত্রী—'সাবিত্রী' নাম সার্থক করিয়াছে। আমার কুললক্ষ্মী, আমাদের জীবন দান করিয়াছে। কোনদিন মনে করি নাই আবার চোখে দেখিতে পারিব। একদিন যে চোখে দেখিতে পারিতাম, আমার সেই চোখের প্রশংসা করিত যাহারা তাহারা আমার অন্ধ অবস্থা দেখে নাই। মাঝে মাঝে মনে হইত, অন্ধ হইয়া বুঝি ভালই হইয়াছে। যাহাদের দেখিতাম তাহারা দেখার বাহিরে চলিয়া গেল,—চোখ থাকিতেও চোখে দেখিতে পারিলাম না। শেষেত' অন্ধই হইলাম। যাক্ সে কথা।

আগ্রায় আপনার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত' অন্ধের দেখা। আপনার কথাগুলি এখনও মনে আছে। কথার সঙ্গে চেহারার একটা ধারণা আমার আছে, এবারে দিল্লী যাইয়া সেই মূর্তিই চাক্ষুস দেখিব এই আশা। মা সাবিত্রীর সাধনা শুধু এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—এই সুকন্যার শিক্ষা-দাত্রীর নাম অনুরূপাই ত' হইবে। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার কন্যা সাবিত্রী।

*　　　*　　　*　　　*

মহিম চিঠি দিয়াছেন—তাঁহার মহিম। মহিম আসিবেন—মহিম, মহিম—তাঁহার মহিম। আগ্রা হইতে আসিয়া ঐ যে অনুরূপা শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ভাল করিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ অঙ্গ তাঁহার পঙ্গু। তবু তাঁহার মহিম আসিবে, মহিম চোখ ফিরিয়া পাইয়াছে—সেই চোখ ছু'টি—নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়াও যে চোখ ছু'টি দেখা শেষ হইত না—সেই চোখ ছু'টি,—ভাবিতে ভাবিতে কি এক অপূর্ব আনন্দ-প্রবাহ সারা দেহে তাঁহার নব-চেতনা জাগাইয়া দিল।

তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে উঠিতে বারণ করিয়াছিল, তবু উঠিলেন,—তাঁহার মহিম আসিবে,—তাঁহারই মহিম। সেই নবগঙ্গার এপারেব আর ওপারের—রমা আর মহিম—যেন মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে আজ। নব বর্ষায় নবগঙ্গার কূলে কূলে, নূতন জল কলকল্লোলে বহিয়া চলিয়াছে, তবু যেন নির্নিমেষে চাহিয়া আছে রমা আর মহিম। শীতের শীর্ণ নবগঙ্গা যেন নির্জীব সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে, তবু ছুই কূলে দাঁড়াইয়া আছে রমা আর মহিম,—চাহিয়া আছে যুগ-যুগান্তরের সীমরেখা ছাড়াইয়া।

সেই নবগঙ্গা আজও ত' আছে। সিদ্ধেশ্বরীর পা ছুঁইয়া, বাটীকা ডাঙ্গার ডাঙ্গা দিয়া, আঠারখাদার ঘাট, দরিমাগুরার হাট, রাজবাড়ীর বাট বাহিয়া আজও সে কুমার নদের ত্রিমোহনায় মিলিয়াছে—কিন্তু তাঁহাদের মিলন-মোহনা—সারা জীবনেও ত' মিলিল না। অনুরূপা আর ভাবিতে পারিলেন না, আবার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে শ্রীরাধামোহন ঘরে প্রবেশ করিলেন।—তোমার চিঠি পড়া শেষ হ'ল অনু, রাত অনেক হ'য়েছে, বলিলেন তিনি।

অনুরূপা কোন কথা কহিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া শ্রীরাধামোহনকে কাছে আসিতে ইসারা করিলেন। শ্রীরাধামোহন কাছে আসিলেন। অনুরূপা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া নিজের বুকের উপরে রাখিলেন। শ্রীরাধামোহন বলিলেন, খুব কষ্ট হ'চ্ছে নাকি অনু?

অনুরূপা অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনুরূপা আবার বলিলেন, আমাকে ারিয়ে তোল'—আমার মেয়ে-জামাই আস্‌ছে। আমি কি এমন ক'রে াছানায় শুয়ে থাকব' নাকি ?

তুমি ত' অনেক ভাল হ'য়ে গেছ। ডাক্তার বলেছে, তোমার অসুখ ানেক কমে গিয়েছে, উত্তর করিলেন শ্রীরাধামোহন।

ছাই ক'মেছে, তবে আমাকে উঠ্‌তে দেয় না কেন ? ওরা এলে ামি কিছুতেই বিছানায় পড়ে থাক্‌তে পারব না, তা তোমাকে লে দিলাম কিন্তু।

অনুরূপা কাতর নয়নে চাহিলেন শ্রীরাধামোহনের দিকে, একটু ারে বলিলেন, তোমাকে জীবন ভরে কষ্টই দিলাম।

হঠাৎ একথা কেন অনু, কহিলেন শ্রীরাধামোহন, তোমার অক্ষয় াাবির্ভাব পুণ্যের স্পর্শে পবিত্র। তাই সুন্দরের দেবতার সম্মুখে যে র্ঘ্য রচনা একদিন ক'রেছিলাম তা আমাদের জীবনকে ক'রেছে ার্থক।

দুই হাতে অনুরূপা শ্রীরাধামোহনের হাতখানি নীরব-নিবিড়তায় াপিয়া ধরিলেন। চোখে বুঝি আসিয়াছিল জল।

দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত বারটা বাজিয়া গেল।

৩৫

গতকাল অসীমকুমারের বাংলোতে সূর্যকুমারীর সম্বর্ধনা উৎসব ইয়া গিয়াছে। অসীমকুমারই এই আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন রিয়াছিলেন। বোম্বাইএর চিত্র-শিল্পী, সুর-শিল্পী, গীত-শিল্পী, ত্য-শিল্পী এবং খ্যাতনামা কথা-শিল্পীরা, চিত্র-জগৎ সংশ্লিষ্ট বহু গণ্যমান্য লাক, চিত্র-জগতের অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা এই মহান শিল্পরাজ্য চনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই শুভ-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ইয়াছিলেন এবং সকলেই সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। মহিম,

রাজু, মহামায়া, সোমনাথ, হরলাল, বনমালা, অশোক এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধিত হন। সূর্যকুমারীর স্বজনেরা সকলেরই আত্মীয় হইয়া উঠিলেন যেন।

অশোকবাবুকে সকলেই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ সূর্যকুমারী তাহার নৃত্যের আগে, অশোক, ডাঃ চ্যাটার্জী, অসীমকুমার ও বনমালার কথা বহুভাবে উপস্থিত সুধীজনকে জানায়। শিল্পীরা অনেকেই নিজ নিজ মর্যাদায় নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। সর্বশেষে অসীমকুমার পরিচালিত "লটারী" নামে ছোট্ট একটি প্রহসন অভিনীত হয়। এইবারে অসীমকুমার নিজেই শেঠ্‌জী ও সূর্যকুমারী বনমালার ভূমিকায় অভিনয় করেন। সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন এবং মুগ্ধ হইয়াছিলেন এই আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজনে।

আনন্দ-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। হাসিবৌদি নিজের হাতে সব আয়োজনের ভার লইয়াছিলেন, নিশানাথকে তাই কোন চিন্তাই করিতে হয় নাই।

আগামীকাল সকলে দিল্লী রওনা হইবেন ঠিক হইয়াছে। সকালেই দিল্লীর বিমান।

বনমালার শরীরটা আজ ভাল ছিল না—হয়ত' মনও। বনমালা দিল্লী যাইবে না। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কারণ, উত্তরে সে বলিয়াছিল, গতকাল অনেক খাটুনি হ'য়েছে তাই শরীরটা ভাল নেই। আর তাছাড়া, এবার ত' নমস্কারের পালা সোমনাথদা'।—আর কিছু বলিতে পারে নাই বনমালা,—উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন তাহার বারণ মানে নাই। সে নিজের ঘরে চলিয়া যায়। সোমনাথের মনও বিষাদ-ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে।

সন্ধ্যা লাগিতেই বনমালা আজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গতকাল হাসিবৌদির এতটুকু অবসর ছিল না, আজ বনমালার অফুরন্ত অবসর। পূর্ণ অবসরের অলসতা আজ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। পরীক্ষার্থীর শেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সারা বিশ্বে আজ ক্লান্তির ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

রাত্রি হইয়াছে। বনমালাকে না দেখিতে পাইয়া সোমনাথ তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বনমালা ঘুমাইয়া আছে। ডাকিল সোমনাথ, সাড়া দিল না বনমালা। সোমনাথ ভাবিল,—গতকালের পরিশ্রম বোধ হয় বনমালাকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বনমালার কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের শয়নঘরে আসিয়া পড়িল। সাবিত্রী পূর্বেই ঘরে আসিয়াছে। সে কি যেন পড়িতেছিল।

—কি পড়ছ,—জিজ্ঞাসা করে সোমনাথ।

—এই প্যাডের মধ্যে পেলাম, বনমালার লেখা একটা কবিতা, বলে সাবিত্রী।

—হ্যাঁ বনমালা লিখেছিল, উত্তর করে সোমনাথ।

সাবিত্রী বলে, কবিতার শেষটুকু চমৎকার।

প্রেম সেত' মিথ্যা কভু নয়,
সর্বত্যাগ তার পরিচয়,
যা আসিল, যাহা গেল সেত' ক্ষণিকের।
সাগরে ডুবিলে খোঁজ মিলে মাণিকের।

সোমনাথ কোন কথা বলে না, তাহার মনে ভাসিয়া ওঠে সেই দিনের কথা, যেদিন বনমালা লিখিয়াছিল এই কবিতা আর সে বলিয়া গিয়াছিল। সেদিনের সেই পরম বন্ধুর পথ আজ ফুরাইয়া গিয়াছে। মনে পড়ে সেই কথা, বনমালা বলিয়াছিল, পথের যাত্রীর মত আমাদের দেখা, পথ যেদিন ফুরিয়ে যাবে—নমস্কার জানিয়ে চলে যাব।

—কি ভাবছ'—জিজ্ঞাসা করে সাবিত্রী।

—না, ভাবছি না কিছুই। মনে হয়, তোমাদের কাউকেই বুঝি জীবন থেকে বাদ দেওয়া চলে না। প্রেমের মূল্য যে কি, বুঝতে পারি অন্তরে, প্রকাশ ক'রতে পারি কবিতা লিখে কিন্তু তাকে জীবন দিয়ে রূপ তোমরাই দিতে পার।

সোমনাথের হাত দু'খানি ধরিয়া সাবিত্রী উত্তর করে, 'সাগরে ডুবিলে খোঁজ মিলে মাণিকের',—সত্যিকারের সাগরে ডুব কি দিতে

পেরেছি? আজ সবচেয়ে মনে হয় বড়মার কথা—মহাসাগরে যিনি ডুব দিয়েছেন। লোকে সতী-সাবিত্রীর পূজা করে, কিন্তু বড়মা যে মন্ত্র দিলেন তার রূপ মিলবে কবে? আগামীকাল আমরা সতীতীর্থ ই দেখ্‌তে যাব দিল্লীতে। মনে পড়ে আর দু'টি লোকের কথা, মোহনলালদা' আর নয়নমামী,—কোথায় তাঁরা আজ?

সোমনাথ কোন কিছুই বলিল না। অনুরূপা তাহারই মাসিমা তাহারই বড়মা। মায়ের মত স্নেহ দিয়া তিনিই মানুষ করিয়াছিলেন। সাবত্রীর দীক্ষাগুরু বড়মা, শ্রদ্ধায় মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল সোমনাথ। মনে পড়িল বন্ধু মোহনলালের কথা, নয়নমামীর মুখ-খানাও চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল।

সাবিত্রী সোমনাথের অঙ্গুলিগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আমি অশোকবাবুকে ভালবেসে তোমাকে ভুলতে পারলাম, একথা ভাবতে পারলে? তবে হ্যাঁ, একথা বলব, অশোকবাবুর মত পরম বন্ধু জীবনে দুর্লভ। পুরুষ বন্ধু আমাদের দেশে মর্যাদা পায় না, তেমনি পায় না পুরুষের বান্ধবী। এযে কত বড় নিকৃষ্টতম চিন্তাধারার প্রকাশ তা কল্পনা ক'রতেও লজ্জায় যেন মরে যাই। অশোকবাবু, বনমালা—রাখেননি এঁরা বন্ধুতার মর্যাদা? কোন্‌ নির্লজ্জ নিন্দুকের অভিশাপ এঁদের গাত্র স্পর্শ করবে? চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধা-পুষ্পার্ঘ রইবে তাঁদের জন্য। কিন্তু তুমি—

বাধা দিয়া সোমনাথ বলে, আর কিছু ব'লনা লক্ষ্মীটি। আমার চোখ ছিল অন্ধ, মনের হ'য়েছিল মৃত্যু। অশোকবাবু, বনমালা, সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করি ডাঃ চ্যাটার্জী ও অসীমকুমারকে, এঁরা সবাই আমাদের উপকারী বন্ধু—এঁদের অভিন্নহৃদয়তা জীবনের পরম সম্পদ হ'য়ে আছে আমাদের। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা বলি তোমাকে, তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই—তুমি আমায় ক্ষমা কর; এই বলিয়া করুণ নয়নে সাবিত্রীর সামনে দাঁড়ায় সোমনাথ।

ও কি, বেশ কিন্তু তুমি, এই বলিয়া—সাবিত্রী, সোমনাথের হাত

দুইটি দুইদিকে সরাইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল। সোমনাথ তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

ঠিক এই সময়ে রাজু ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বৌদি।

অতি সহজভাবে সোমনাথের বাহুবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কিরে রাজু।

একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া রাজু কহিল, কিছু নয়, মা বল্লেন কাল সকালেই দিল্লীর প্লেন, তাই বলে গেলাম।

সাবিত্রীর প্রতি মৃদু হাসিয়া রাজু চলিয়া গেল।

সাবিত্রী হাসিয়া সোমনাথকে বলিল, দেখলে ত', রাজহংসীর রঙ্গীন পাখা উঠেছে, ও উড়তে শিখেছে।

. সোমনাথ উত্তরে বলিল, যাই বল, রাজুই কিন্তু আমাদের মিলনের রাজহংসী। আজকের দিনের এই শুভমুহূর্তে রাজহংসী বুঝি সেই মিলন-স্মৃতিই বহন করে আনল'। সেই তুমি, আমি আর রাজু— মনে হ'চ্ছে যেন তাজমহলের চত্বরে আমাদের সেই প্রথম দেখা হ'ল, পাশে নিস্তরঙ্গ যমুনা—তার ওপর দিয়ে রাজহংসী উড়ে এল যেন—মধু-পূর্ণিমার বাণী বহন ক'রে।

নির্নিমেষে চেয়ে থাকে সোমনাথ সাবিত্রীর দিকে।

হাসিয়া সাবিত্রী বলে, তোমার হ'লো কি? চেয়ে আছ কেন অমন ক'রে?

সোমনাথ উত্তর করে, দেখছি তোমাকে, সমুদ্র মন্থন ক'রে বিষ্ণু পেয়েছিলেন কমলাকে। জীবন-সাগর মন্থনে, আমি বুঝি আমার কমলাকে আজ ফিরে পেয়েছি।

সাবিত্রী অবাক হইয়া সোমনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

গর্বে—বিস্ময়ে—বিহ্বল সাবিত্রী সোমনাথের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরে মৃণাল বাহুলতায়। এত আনন্দ কোথায় রাখিবে সে আজ। উদ্বেলিত বক্ষ-সাগরিকা বুঝি উর্মিবাহুমালায় মুহুর্মুহুঃ তটভূমিকে আলিঙ্গন করে।

বনমালা তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে।

যথাসময়ে গর্জন করিতে করিতে বিমান-রথ আকাশে উঠিতে লাগিল। বোম্বাই ত্যাগ করিয়া রাজধানীর সন্ধানে ছুটিল তীর্থ-যাত্রীর বিমান।

শঙ্কর ভাবিতেছিল, কতদিন পরে বড়মাকে দেখিতে পাইব। সাবিত্রী ভাবিতেছিল, কতদিন পরে আবার বড়মার কাছে ফিরিয়া যাইতেছি। একদিন তিনি আগ্রায় গিয়াছিলেন আমাদের লইয়া আসিতে, আজ আমরা সকলেই যাইতেছি। মহিম ভাবিলেন, বেয়ান-দিদিকে সেবারে চোখে দেখিতে পাই নাই, এবারে দেখিতে পাইব এবং অনেক করিয়া আলাপ করিতে পারিব। তারপরে বলিব, বেয়ানদিদি, চলুন লালকেল্লা দেখিয়া আসি, দেখিয়া আসি হুমায়ুনের কবর, কুতবমিনার, চাঁদনীচক্‌। দেখিলেন ত'—চোখ ভাল হইয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার হয়রানিও বাড়িয়াছে। রাজু তাঁহার পাশে বসিয়াছিল। সে ঘুমে ঢুলিতেছিল। মহিম তাহাকে হাত দিয়া জড়াইয়া রাখিলেন। আবার ভাসিয়া চলিলেন চিন্তাস্রোতে। ভাবিলেন, বেয়ানদিদিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কেমন করিয়া সাবিত্রীর মত মেয়ে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন।—কি তাঁহার শিক্ষা? আর কি তাঁহার মন্ত্র?

কিন্তু রমাকে তাঁহার শৈশব হইতে যিনি প্রেমের মহামন্ত্র দিয়াছিলেন, তিনি যে স্বয়ং চলিয়াছেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। প্রেমের মূল্য দিতে হয় বেদনার ঐশ্বর্যে। রমা সেই মন্ত্রে অনুরূপা, কুন্তল সেই মন্ত্রে সাবিত্রী।

তবে মন্ত্র হইলেই ত হইবে না, যোগ্যতা চাই সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবার। যাঁহাদের আত্মমর্যাদাবোধ নিয়মিত লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মাথা

তুলিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা দিয়াছে, তাঁহারাই হইবে এই মন্ত্রের অধিকারী। সেই মন্ত্র-গ্রহণের যোগ্যতা আজ তপশ্চর্যায় লাভ করিতে হইবে। তাহাতে যদি কুৎসার নগ্ন দুঃশাসনেরা বস্ত্র-হরণের আয়োজন করে, তবু জোড় হাতে 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' না করিয়া, বীরাঙ্গনা সুভদ্রার মত অশ্ববল্গা ধরিয়া, কৃপণ ও স্থবির সংস্কারের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিজয় রথ চালাইতে হইবে,—তিমির যুগান্তের পরপারে—উদার উষার উদয়াচলে।

পথে প্রাকৃতিক বাধায় প্লেন সরাসরি দিল্লী আসিতে পারিল না। নাগপুর নামিয়া কয়েকঘণ্টা সেখানে দেরী করিতে হইল।

শ্রীরাধামোহন পূর্ব হইতেই পত্র পাইয়াছিলেন। আজ সকলে আসিবেন। তাঁহাদের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন তিনি। ফোন করিয়া জানিলেন, প্লেন আসিতে দেরী হইবে। বিমান ঘাঁটিতে দু'খানা ট্যাক্সি তিনি প্লেনের সম্ভাব্য সময় জানিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

রাত্রির দিকে আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল তাই নাগপুর হইতে প্লেন দিল্লীর পথে পুনরায় যাত্রা করিল। শেষ রাত্রে বিমান আসিয়া পৌঁছিল দিল্লী। ট্যাক্সি ড্রাইভার সকলকে লইয়া 'করলবাগের' বাসায় উপস্থিত হইল।

সকলের দিকেই শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরাধামোহন কহিলেন, আসুন।

এই বলিয়া তিনি সম্মুখের দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিতেই উজ্জ্বল আলোকে দেখা গেল ঘরের মাঝখানে, উচ্চতর বেদীতে অনুরূপার বড় তৈলচিত্র, ফুল সম্ভারে সজ্জিত। চারিদিকে স্নিগ্ধ দীপ-শিখা, চিত্রের নীচের দিকের দুই পার্শ্বে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ বড় অক্ষরে লেখা। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, কেহ কিছু বলিতেও পারিলেন না।

চিত্রের প্রতি নজর পড়িতেই মহিম, 'অ্যাঁ', বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্ফারিত চক্ষে তিনি অনুরূপার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার বেদনা-ব্যথিত কম্পিত-কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া

আসে একটি অস্ফুট আর্তনাদ— মা ! বজ্র-স্তব্ধ-নয়নে একটিবার তিনি শ্রীরাধামোহনের দিকে চাহিয়া দেখেন,—তিনিও দাঁড়াইয়া আছেন পাষাণের মত নিথর-নিঝুম। নিঃশব্দ অশ্রুবেগে মহিমের হিম-শীতল দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে। কে যেন তাঁহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। দুই হাতে তিনি তাঁহার বুকখানা চাপিয়া ধরিলেন। অসহ্য শোকাবেগে তিনি বুঝি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধামোহন তাঁহাকে ধরিলেন। শ্রীরাধামোহনের নিজের গণ্ড বাহিয়াও নিরুদ্ধ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

সোমনাথ কাঁদিয়া বলে, বড়মা, কেন তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে বড়মা, চেয়ে দেখ', আমরা সবাই এসেছি।

সাবিত্রী কোন কথা না বলিয়া সোমনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল অনুরূপার মাতৃ-মূর্তির দিকে। সোমনাথ কাঁদিতেছে, মহামায়া কাঁদিতেছেন, রাজু কাঁদিতেছে, সকলের চোখেই জল, শুধু কাঁদিল না সাবিত্রী, অনন্ত অশ্রু-প্রবাহ বুঝি জমাট বাঁধিয়াছে তাহার চোখে।

চারিদিকে নিঃসীম স্তব্ধতা। অন্তর্গূঢ় অশ্রু-ফল্গু সাবিত্রীকে বিচলিত করিল না। সে পাষাণ-নয়নে একবার চাহিল মেসোমশাইএর দিকে। তারপর-অনুরূপার মূর্তিকে কণ্ঠাঞ্চল টানিয়া প্রণাম করিল পরম-শ্রদ্ধায়। অনুরূপার পবিত্র প্রতিকৃতি বুঝি প্রাণময়ী হইয়া উঠিল।

স্তিমিত প্রদীপ-শিখা যেন নূতন দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। সাবিত্রী যেন শুনিতে পাইল, ধূপ-তরঙ্গে অনন্ত আকাশ মন্দ্রিত করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে অনুরূপার পুণ্যতম বাণী—'বাংলা দেশের মেয়েরা এই 'কন্যাদায়' অপবাদ আর কতকাল সহ্য ক'রবে ? তোরা যে 'কন্যারত্ন' সে কথা তোরা ভুলে যাবি ?'

যমুনার তীর-তীর্থের মন্দিরে মন্দিরে তখন প্রভাত আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে।

